অন্তঃসমুদ্র

স্তব্ধতা, শব্দের এই রৌদ্রময অন্ধকার। দুর্ভেদ্য শব্দ দিয়ে দৃঢ় করে' রেখেছে সে তার জীবনের দুর্গ, অব্যাহত হ'য়ে আছে সে তার বলিষ্ঠ, নিষ্ঠুর নিশ্চিন্ততায়।

একেক সময শব্দের অরণ্য ঠেলে-ঠেলে সে-ও ক্লান্ত হ'য়ে পড়তো, তারো মতো দানবীয় যে দুর্ধর্ষতা। শব্দের এতো ভার যেন আর বওয়া যায় না। মনে হ'তো, কী হ'বে এতো মনে করে' রেখে, কী আছে এদের মানে জেনে? প্রথম-প্রথম, ছেলেবেলায়, শব্দ ও তার অর্থ মিলে তার মনে একাকী আবিষ্কারের একটা নির্জন ঐশ্বর্য এনে দিয়েছিলো, সে-আনন্দ ছিলো আহরণে নয, আস্বাদনে। তারপর যখন সে চলে' এলো কলেজে, কলকাতায, অভ্রংলিহ আকাঙ্ক্ষার আকাশে, তখন সেই শব্দ হ'যে দাড়ালো অর্থহীন; অর্থগুলি নিঃশব্দ। যেন বিচ্ছিন্ন কতোগুলি অস্থিতে বিকৃত একটা কঙ্কাল। আর সেই শোভাযাত্রা নয, একটা শৃঙ্খলায়িত শ্রেণিবদ্ধতা। তবু সেই শৃঙ্খল থেকে সৌম্যর নিস্তার নেই, এই শৃঙ্খলকেই করে' তুলবে সে জয়মাল্য। প্রতি পরীক্ষায সে ফার্স্ট হ'তে লাগলো, দস্যুর মতো দুই হাতে কুড়িয়ে নিতে লাগলো শব্দের ঝিনুক। ফার্স্ট না হ'যে তার উপায় নেই—নিতেই হ'বে কোনোরকমে তাকে একটা চাকরি। তখন তার সমস্ত শব্দ ও অর্থ মনে-মনে এই চাকরি কথাটি উচ্চারণ করছে। তখন, ডুবার দুঃসাহসে ঝাঁপিযে পড়তো আবার সে শব্দের লবণাক্ত সমুদ্রে, লেভ'যাথান্-এর মতো ঘোলা জল ঘেঁটে সে আবার অগ্রসর হ'তো—ঐ বুঝি দেখা যাচ্ছে সোনালী তীর: তার সাফল্যে শ্যামল, উত্তপ্ত আশ্রয।

তারপর একদিন সৌম্যর ছুটি মিলে গেলো, পাশ করবার আর পরীক্ষা নেই। যার জন্যে এতদিন ধরে' সে অক্ষরাকীর্ণ বিদ্যার মরুভূমি পার হ'যে এসেছে, মিলে-ও গেলো সে-চাকরি, কিন্তু, আশ্চর্য, তার

জন্যে এতো দুঃসাধ্য সাধনায় তার ফার্স্ট না হ'লেও হয়তো চলতো। চাকরিটা এক বিলিতি সওদাগরি আপিসের য়ুরোপিয়ান্ অ্যাসিস্টান্ট-সিপ—মিলে গেল বিদ্যের বহরে নয়, মুরুব্বির জোরে। হেসে-খেলে জীবনটাকে বাজিয়ে-যাচিয়ে এমনি গা ছেড়ে দিয়ে সামান্য এম্-এটা পাশ করলেও হয়তো চাকরিটা মিলতে পারতো, তার জন্যে বই দিয়ে এই একটানা বাইশ বছরকে এমন বাক্স-বন্দী করে' রাখবার দরকার ছিলো না। যাই হোক্, পথের অনর্থক দীর্ঘতার দুঃখ ভোলা যায় প্রাপ্তির শিখরে উঠে। শুরুতেই তিনশো টাকা মাইনে।

তারপরের ব্যাপারগুলো এমন তাড়াতাড়ি ঘটতে লাগলো যার জন্যেও এতোদিন ধ'রে তার জীবনে কোনো ধারাবাহিক প্রস্তুতি ছিলো না। সৌম্যরা বাড়ি বদ্‌লালে, চারপাশের দেয়ালগুলোকে, এতোদিন-কার ঘন, চাপা দেয়ালগুলোকে একটু দূরে দিলে ঠেলে, আলো-হাওয়ার জন্য পথ ছেড়ে দিলে অবারিত। আগে-আগে বন্ধুরা কেউ ডাকতে এলে নিচেই তাকে নেমে যেতে হ'তো, রোয়াকে দাঁড়িয়ে বাক্যালাপ; এখন সে তাদের সটান, স্বচ্ছন্দে উপরে নিয়ে আসতে পারছে, উপরেই এখন তার বসবার ঘর। শোবার ঘরের সীমান্তেই এখন তার বাথ্‌রুম। দেখতে দেখতে, এর জন্যেও ছিলো না কোনো আকস্মিক সম্ভাব্যতা, তার জীবন-যাত্রায় এসে গেলো একটা এলো-মেলো সাহেবিয়ানা, সেই গোলগাল ঢিলেমির পর একটা ধারালো ঋজুতা। নতুন করে' সূর্য উঠলো, পৃথিবী পৃষ্ঠা উল্‌টোলে। শুধু তার সেই বইগুলিকে আর কোথাও খুঁজে পাওয়া গেলো না, সেই রাশীভূত অক্ষরের নির্ভুল পারম্পর্য বিস্মৃতির ধুলোয় হঠাৎ ছিন্ন-ভিন্ন হ'য়ে গেলো। সমুদ্রটা পার হ'য়ে আসতেই অনাবশ্যক সেতুটা সৌম্য পা দিয়ে ঠেলে দিলে।

তারপরে আরো আছে।

সৌম্যর বাবা পরমেশবাবু এই সময়ে তার বিয়ে দিলেন, যে-টুকু সামান্য বেসুর ছিলো তা ছন্দে তুললেন নিটোল করে'। ছেলের একটা মত পর্যন্ত জিগ্‌গেস করলেন না। ভাত খাওয়ার পর আঁচাতেই হয়, চাকরি পাবার পর বিয়ে। বলতে কি, এ বিষয়ে সৌম্যর মত কিছু ছিলোও না। কা'কে বা কেমনধারাকে বিয়ে করবে দূরের কথা, এখুনি এই মুহূর্তে, বিয়ে করাটা সম্ভব কিনা সে-সম্বন্ধে পর্যন্ত নয়। এতোকাল সে সযত্নে পরের মত কুড়িয়েই বেড়িয়েছে, নিজের মত বা মন দিয়ে একবিন্দু মাথা ঘামায় নি। যেমন পোকা-মাকড়ে রক্ত নেই, তেমনি তার মধ্যে কোনো মত ছিলো না। যা একান্ত হাতের কাছে এসে পড়ে, তাতেই তার ঘোরতর সম্মতি আছে। যেমন তার চাকরি। বিশেষ এটার জন্যে তারই এমন কোনো লেলিহান চেষ্টা ছিলো না, তেমনি কোনো বিশেষতরর জন্যেই তার অসম্ভব আসক্তি নেই। চাকরি করতে হয় করবে, মাইনেটা মোটা হ'লেই হ'লো, বিয়ে করতে হয় করবে, পাত্রীটি মেয়ে হ'লেই যথেষ্ট। পরমেশবাবু বাছাই করতে লাগলেন, অধিকাংশ পাত্রী মেয়ে হওয়া সত্ত্বেও দাঁড়িয়ে ফেল করলো। তাঁর চুল-চেরা পরীক্ষা। কেউ দিব্যি রূপের পাহাড় ডিঙিয়ে এসে কৌলীন্যের কূলে আছাড় খেয়ে পড়লো, কেউ যদি বা কুল রাখলো তো এদিকে শ্যামত্বও তাদের ভীষণ।

অবশেষে একটি মেয়েকে তিনি চিহ্নিত করলেন। পরমেশবাবুর মুখে তার বর্ণনাটা আমরা বিশ্বাস করতে পারছি না। ডাক পড়লো সৌম্যর। পরমেশবাবু বললেন,—কি, একবার নিজের চোখে দেখে আসবি নাকি?

সৌম্য হাসি-মুখে নির্লিপ্ত গলায় বললে,—না, আমার আবার দেখার কী দরকার।

দুই

পাত্রীকে সভাস্থ করা হ'লো। রক্তের মতো লাল চেলীতে মেয়েটি যেন কাঁপানো খানিকটা লাল মেঘ, তার শাড়িতে শিখার মতো একটা অস্পৃশ অশারীরিকতা। মাথায় নতুন একটি ঘোমটা দুই চোখের উপর অনাদি রাত্রির রহস্য এনে দিয়েছে। পৃথিবীর ওপারে চাঁদের যেই আধখানা অন্ধকার, মেয়েটি যেন সেই আধখানা চাঁদেরই মতো আশ্চর্য অচেনা। পিঁড়ির উপর বসবার শ্রীতে সে তার শরীরের সমস্ত স্নেহ যেন ঢেলে দিয়েছে, তার চিত্তের তরল নম্রতা। কোলের উপর শুভ্র, শিথিল দু'খানি হাতে দুর্বল, আর করুণ : যেন তার নিঃসহায় রিক্ততার ছবি। অলক্তলিপ্ত নরম লাজুক দু'টি পদতল যেন অলিখিত দু'টি কবিতা। পা দু'টি গুটিয়ে বসবার ভঙ্গুর রেখাটি যেন মধ্যরাত্রে ঘুমের মধ্যে শোনা বাঁশির সুরের মতো উদ্‌ভ্রান্ত।

সুখে সৌম্যর সমস্ত শরীরে স্পর্শময় গাঢ় একটি তন্দ্রা নেমে এলো। তার জন্যে আজকের এতো আয়াস-আয়োজন, এতো সাজ-সজ্জা, এতো হৈ-চৈ, সব সে বুঝতে পারে; বুঝতে পারে, তারই জন্যে আজকের রাত্রি ফুলে ও আলোয়, লাস্যে ও লাবণ্যে অসম্বৃতা হ'য়ে উঠেছে, চারদিকে এতো ব্যস্ততা, এতো বাহুল্য, ছেলেদের এতো স্ফূর্তি, মেয়েদের এতো সভঙ্গ তরঙ্গিমা—সব সে বুঝতে পারে, কিন্তু কিছুতেই বুঝতে পারে না, সংসারে এতো মেয়ে থাকতে কী করে' এই বিশেষ অপরিচিত মেয়েটি, এক চিলতে জ্যোৎস্নার মতো মলিন মেয়েটি, কী অসীম দুঃসাহসে তার মাঝে আকাশের অতল আত্মীয়তা নিয়ে তার সামনে চুপি-চুপি এসে বসলো। এতোটুকু ভুল করলো না, এতোটুকু দ্বিধা করলো না। কাতর করুণ দু'খানি অর্ধোচ্চারিত হাতে অসঙ্কোচে

বলতে লাগলো : এতো বড়ো পৃথিবীতে একমাত্র আমিই তোমার একান্ত, আমাকে তুমি নাও, আমাতে তুমি সম্পূর্ণ হ'য়ে ওঠো। আশ্চর্য, সৌম্য যেন প্রাপ্তির প্রচণ্ডতায় স্তব্ধ হ'য়ে গেলো, অগ্নিময় প্রথম পৃথ্বীপিণ্ডে শ্যামল প্রাণসঞ্চারের মধ্যেই যেন এ আদিম, অসম্ভব। ঐ দু'টি হাতে নিয়ে এসেছে সে স্পর্শের সমুদ্র, দু'টি আনমিত ভুরুতে বিস্তাবি[illegible]ময়, বিস্রস্ত আঁচলে আকাশের অজস্রতা—শুধু তারই জন্যে, ভাবতে সৌম্যর সমস্ত রক্তধারা যেন গান গেয়ে উঠলো। একটি শঙ্খের মাঝে যেমন বিশাল সমুদ্রের নিশ্বাস শোনা যায়, তেমনি মেয়েটির মধ্যে নিমীলিত হ'য়ে আছে জীবনের বিচিত্রিত অপরিমেয়তা।)

গোড়াতেই হ'য়ে গেছে শুভদৃষ্টির পালা। সৌম্য ছিলো দাঁড়িয়ে, শিপ্রাকে পিঁড়ি করে'ই তোলা হ'লো, মাথার উপরে কে ছড়িয়ে দিলে একটা সাদা চাদর। ভীষণ গোলমাল : ভালো করে', চোখ বড়ো করে' তাকা, শিপ্রা। লজ্জায় আচ্ছন্ন, পল্লবিত, ভীরু দু'টি চোখ শিপ্রা ধীরে-ধীরে তুলে ধরলো। ভীরুতা, অথচ প্রচ্ছন্ন একটি প্রগাঢ় পরিচিতি; শিপ্রা যেন ঈষৎ স্ফুরিত ঠোঁটে বলছে : মুহূর্তের কতো মরুভূমি পেরিয়ে শেষকালে তোমাকে চিনলুম। কি, আমাকে, সেই আমাকে তুমি চিনতে পাচ্ছো না? সৌম্য কী যে দেখলো ঠিক কিছু বুঝে উঠতে পারলো না। রাত্রের অন্ধকারে সাদা খানিকটা সমুদ্র, না মৃত্যুর পরে অবিনশ্বরতার ধূসর একটা ইশারা, তা তাকে কে বলবে? মালা-বদলের পর আবার তারা যার-যার পিঁড়িতে গিয়ে বসলো। শিপ্রার সমস্ত মুখের মধ্যে সৌম্যর কেবলি মনে পড়তে লাগলো তার চিবুকের সেই ডৌল, নাকের শিশুসুলভ সারল্য, কপালের উপরে চুল ক'টির শীতল বিশ্রান্তি।

বাসর-ঘরে শিপ্রাকে সৌম্য পেলো না, পেলো না তার পরিপূর্ণ নিভৃতির পরিমণ্ডলে। ঘরে-বাইরে তখন অনেক চকিত-চক্ষু চঞ্চলার

ভিড, হাসির কশাঘাতে সমস্ত শূন্য তারা উচ্ছৃঙ্খল করে’ দিয়েছে। কতোক্ষণে শেষ হ’বে না-জানি এ ফেনায়িত মুখরতা! কতোক্ষণে তাদের এই মদের বুদ্বুদের মতো উচ্চ হাসির পরে নামবে শীতল আলস্য, ঘুমের মধুরতা! কতোক্ষণে এরা বাড়ির সমস্ত আলো নিবিয়ে জ্যোৎস্নাকে পথ ছেড়ে দেবে, তাদের শরীরে, তাদের বিছানায়, তাদের প্রথম পরিচয়ের প্রতীক্ষমাণ মৌনে। অসম্ভব। আজই যেন, এখুনো যেন, যতো রাজ্যের গান আর কথা, পিচ্ছল লীলা আর উজ্জ্বল উচ্ছলতা, ঘুমের কুয়াশা যেন উল্লাসের উদগ্র বিদ্যুদ্দন্তে বিদীর্ণ হ’চ্ছে। সৌম্য স্নায়ুতে-স্নায়ুতে ক্লান্ত হ’য়ে উঠলো। সে এখন চায় গম্ভীর স্তব্ধতা, শব্দের অভাব নয়, শব্দহীনতার স্পর্শসহ একটা উপস্থিতি, ফেনহীন সুনীল মধ্য-সমুদ্রের শান্তি, কোনো-কিছুর ভয় নয়, তবু এমনি একটা ভয়ের বিরাজমানতা। সে-স্তব্ধতা চায় সে তার স্বাদে, আঘ্রাণে, তার পরিপার্শ্বে, তার আত্মায়। সৌম্য সমস্ত চেতনায় শুদ্ধ হ’য়ে সেই স্তব্ধতার অপেক্ষা করতে লাগলো। তারপর সত্যি যখন ঘরের দেয়ালগুলি চুপ করে’ গেলো, আলোগুলি যখন অন্ধকারে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো, তখন প্রায় শেষ রাত্রি, চাঁদ প্রায় হলুদে হ’য়ে এসেছে। শিপ্রা বিছানার এককোণে একটুকরো নরম অন্ধকারের মতো ঘুমে রয়েছে অসহায় হ’য়ে—সমস্ত ক্ষীণজীবী চাঞ্চল্যের অন্তরালে নিঃশব্দ একটি উপলব্ধির সুষমা—তার সেই ঘুম, সমর্পিত, সুন্দর সেই ঘুম যেন আকাশের সঙ্গে মিশে গেছে। শরীরে কোথাও এতোটুকু ভয় নেই, বাধা নেই—তার ঘুমটুকু যেন একবিন্দু শিশিরের মতো তার বিছানার উপর ঝরে’ পড়েছে। সৌম্য স্নিগ্ধ, আবিষ্ট চোখে সেই ঘুমটুকু দেখতে লাগলো—যেন অত্যন্ত ভয়ে-ভয়ে, পাছে দৃষ্টির উত্তাপে প্রজাপতির মতো তা উড়ে যায়। শিপ্রার ক্ষীণ, ক্লান্ত মুখে রাত্রির পাণ্ডুর একটি আভা এসে পড়েছে, সে-মুখের কাতর ডৌলটিতে কী পরিপূর্ণ বিশ্বাস,

দুটি অশঙ্কমান ভুরুতে কী অসীম নির্ভর—সৌম্যর ভারি মায়া করতে লাগলো। চিনতো না, শুনতো না, স্বরের একটি রেখা নয়, পায়ের নয় একটি শব্দ, এতোকালের অন্ধকার পেরিয়ে কী অসীম অনায়াসে শরীর-ময় অগাধ স্তব্ধতা নিয়ে তার পাশে আজ সে শুয়ে আছে। নির্ভয়, নিভৃত অনায়াসে। আশ্চর্য, গ্রহ-নক্ষত্রের কী নিগূঢ় ষড়যন্ত্রে আজকের এই স্তিমিত রাত্রি, এই স্তবস্তিত স্তব্ধতা, এই বিন্দুপরিমাণ ঘুম! এই ঘুমের নির্মাণে জ্বলেছে কতো সূর্য, গলেছে কতো জ্যোৎস্না, গড়িয়ে গেছে কতো ঘুমের নিঃসঙ্গতা। একটি বিস্বল ফলের মাঝে যেমন বহু সূর্যের স্বাদ, তেমনি এই ঘুমের আড়ালে যেন বহু রাত্রির অন্ধকার। কতো মুহূর্তের প্রতীক্ষা নিয়ে সে আজ পরিপূর্ণতায় ডুবে গেছে। অথচ সৌম্যর নিজের দিক থেকে এর জন্যে কোনো প্রস্তুতি ছিলো না, এই অপরূপ সমস্থানতার। তার কর্মব্যস্ততার চারদিকে যে এমন একটি স্তব্ধতা ছিলো ঘনিয়ে, কোনো বই-ই তা লেখে নি। আশ্চর্য, এমন কথা কোনো একটা বইয়েও কিনা লেখা নেই।

শিপ্রাকে সৌম্য পেলো ফুলশয্যার রাত্রে, রাত্রের প্রায় শৈশবে। চাঁদ তখন জানালার মুখোমুখি, অন্ধকার বিছানা ফলের ফেনায় ভরে' গেছে। হাওয়ায় দেয়ালে কাঁপছে ধূসর নিঃশব্দতার ছায়া। ঘরের মাঝামাঝি খাটের উপর 'নভাঁজ বিছানায় জ্যোৎস্নার রুপোলি জল— ভেজা রাত্রির সিত শীতলতা। তার তীরে-তীরে ধূসর দেয়ালে রেখাহীন কালো ছায়া দুলছে, আনগ্ন মৃত্যুর শূন্যতার পারে যেন অনির্ণীত, অবিনশ্বর। শিপ্রা খাটের ধার ঘেঁসে চুপ করে' বসে' আছে, নিঃশব্দতার একটা ঢেউ বসে' আছে তার সমস্ত প্রতীক্ষা নিয়ে, প্রত্যক্ষতা নিয়ে। এতোদিন ধরে' তার শরীরের পৃষ্ঠায়-পৃষ্ঠায় লিখে এনেছে সে বঙ্কিম গীতি-কবিতা, অনেক সূর্যোদয়ের ইতিহাস, অনেক বসন্তের উপঢৌকন, তার চুলে এনেছে সে অনেক অরণ্য-আকুলতা, তার

বর্ণে অনেক হৈমন্তিক ঐশ্বর্য—সব তারি জন্যে—সৌম্য সেই চেতনার জ্যোৎস্নায় যেন একটা সাপের মতো ঠাণ্ডা, শিথিল হ'য়ে উঠলো। শিপ্রার চারপাশে এই নীরবতার উদ্বেল প্রশ্রয়টি পর্যন্ত তার অধিকারে।

সৌম্য মমতায় ক্লান্ত গলায় জিগগেস করলে: তোমার ঘুম পাচ্ছে?

সরলতায় করুণ শিপ্রার মুখ। মুখে সস্মিত সম্মতির সলজ্জতা। তার গলার স্বর যেন জ্যোৎস্নার মতো সাদা, ঠাণ্ডা।

শুধু বল্‌লে,—না।

তাই ভালো, তারা এই রাত, সাদা ঠাণ্ডা রাত, তাদের মধ্যে গভীর গোপনে গ'লে যেতে দেবে, এই তরল নীরবতার জলে, স্পর্শ-হীনতার আমর্মমূল স্পর্শে। যতোক্ষণ সম্ভব, যতোক্ষণ তাদের শরীরে মৃত্যুর মতো না ঘুম নেমে আসে। চাঁদ যাবে স'রে, ক্ষীণ হ'য়ে আসবে তার হারিত্র পাণ্ডুরতায়, দেয়ালের ধূসর ছায়, বিছানায় ফেলে ক্লান্ত দীর্ঘশ্বাস। তবু তারা জেগে থাকবে, প্রথম পরিচয়ের রমণীয় প্রচ্ছন্নতায়। তারপর আকাশে আর চাঁদ থাকবে না, না থাক, তাদের আত্মার গহন সমুদ্রের তলা থেকে উঠে দাঁড়াবে আরেক নতুনতর সূর্য। এখন যা অপরিচয়ে সাদা, তাই হবে অন্তরঙ্গতায় রক্তিম।

তিন

সৌম্যর জীবনের হঠাৎ যেন দাম বেড়ে গেলো। চাকরি পেয়ে ততো নয়, যতো বিয়ে করে'। চাকরি পেয়ে সংসারের চোখে মর্যাদা তার বেড়ে গেছে অবিশ্যি, কিন্তু আসল মূল্য তার নিজের কাছে: নিজের সমারোহ, নিজের সম্মাননা। সমতল জায়গা থেকে হঠাৎ সে যেন একটা গিরিচূড়ায় উঠে এসেছে, প্রায় আকাশের উত্তপ্ত সামীপ্যে, তার জীবনে এখন একটা সুবিশাল সম্ভাবনা, একটা জান্তব বলদীপ্তি। অরণ্যে নবীন বসন্ত-বিদারণের মতো তার জীবনের রূঢ়তায় এসেছে লাবণ্যের বন্যতা: সে সুন্দর, রক্তের প্রতি অণুতে সে সুন্দর, দৃষ্টির প্রতি কণায়, কথার অতিরিক্ত সকল অকথিততায়। প্রতিটি মুহূর্ত গুনে'-গুনে' ছুঁয়ে-ছুঁয়ে সে ছেড়ে দিচ্ছে, তার একটি ধূলিকণাও সে অপব্যয় করছে না—দণ্ড, এতো অল্প—রাতগুলি কী ভীষণ ক্ষণস্থায়ী, দিনগুলি কী পিচ্ছিল পলায়মান! আকাশের অপরিমেয় ভাণ্ডার থেকে সে যেন সমস্ত সময় লুট করে' আনতে চায়, সমুদ্রের তলা থেকে অনন্ত কালের তমুদিত সূর্যোদয়। সৌম্য যেন একটু গম্ভীর হ'য়ে পড়েছে, সহসা কোনো বিপদের মুখে এগিয়ে যেতে তার আর সেই সাহসিক স্বাধীনতা নেই; তার সমস্ত চাপল্য, সমস্ত উচ্ছৃঙ্খলতার উপর নেমে এসেছে শিপ্রার অশরীরী স্পর্শিলতা। সবুজ শস্যের তন্তুতে দৃষ্টি-বহির্ভূত, সূক্ষ্ম খাদ্যপ্রাণের মতো তার প্রতিটি নিশ্বাসে, প্রতিটি রোমকূপে মিশে আছে শিপ্রার নেপথ্যস্থিতি। শিপ্রা তার মাঝে মিশে আছে, ডুবে আছে, গলে' আছে। উপসর্গ যেমন ধাতুকে জোর করে' এক অর্থ থেকে অন্য অর্থে নিয়ে যায়, তেমনই শিপ্রা তাকে তার উপস্থিতির প্রবলতায় নিঃস্বতা থেকে বিশ্বময়তায় নিয়ে

এসেছে। একমুহূর্ত তার বিরাম নেই, শরীরের এই অতীন্দ্রিয় অবচেতনা থেকে। সকালবেলা ঘুম ভেঙে সৌম্য দেখতে পায়, বিছানা খালি, শিপ্রা কখন উঠে চলে' গেছে নিচে, মশারিটা তোলা, সমস্ত ঘরটি তার চলে'-যাওয়ার নির্মলতায় ঠাণ্ডা, অস্পষ্ট। দেয়ালে, ঘরের আসবাবে, মেঝের উপর, ভোরের নতুন আভা এসে পড়েছে, তার এই তিরোধানের মত নরম, একটু-বা বিষণ্ণ। আবার আরেকটি সকাল, তার ক্ষণিক অনুপস্থিতির উত্তাপে সব-কিছু কেমন রহস্যময় লাগছে। সৌম্য আরো খানিকক্ষণ চুপ করে' শুয়ে থাকে, আশরীর অনুভব করে এই সকালের শৈথিল্য, আবার আরেকটি সকাল, আবার আরেকটি সকাল সে সৃষ্টি করলো তাদের এই অবকাশের আকাশে।

শিপ্রার সঙ্গে তারপর তার সেই দেখা হয় চায়ের টেবিলে, চৌকো ছোট একটা টিপাইয়ের মুখোমুখি। শিপ্রার বসবার ভঙ্গিটা আলস্যে একটু এলোমেলো, তার চুল ও শাড়ির রুক্ষতাটি রোদ লেগে ঝিকমিক করছে। মসৃণ, একটু-বা মলিন দু'টি চোখে টলমল করছে স্নেহ, ভোরবেলাকার স্নেহ। দু'টি হাত যেন নীরব ঔৎসুক্যে অলস শান্তিতে কোলের উপর থেমে আছে। ভুরু দু'টিতে জিজ্ঞাসার কোনো রেখা নেই, কপালে স্বচ্ছ একটি ঔদাসীন্য। তার সমস্তটি শরীর যেন বৃষ্টির জলের মত বর্ষমাণ।

সৌম্যর ভীষণ ভালো লাগে, ভালো লাগে এই ভোরবেলাকার নতুন আরম্ভটি। ভালো লাগে শিপ্রার বাহু দু'টির ঢেউ, দুটি পায়ের নরম লঘিমা, গতির দ্রুত রশ্মিরেখা। ভালো লাগে আবার তার গা-ময় ঘন এই নীরবতার মেঘ। অথচ এই ভালো-লাগার জন্যে কিছুই সে দাম দেয়নি, এই ভোর-বেলাটির জন্যে কোনোদিন ছিলো না তার রাত্রির তপস্যা। হঠাৎ একদিন তার আকাশ অসম্ভব ঐশ্বর্যে যেন

আনম্র হ'যে দাঁড়ালো, সে যেন জনহীন কোন বিদেশে এসেছে হাওয়া বদলাতে।

শিপ্রার নির্লিপ্ত, নিস্তেজ চিবুকটির দিকে তাকিয়ে সৌম্য জিগ্‌গেস করে: তোমার কেমন লাগছে?

চাযের বাটি থেকে চোখ তুলে শিপ্রা শিশুসুলভ সরলতায় বলে: কী?

—চার-পাশের এই সব, এই সংসার। এই ভোরবেলা, তোমার গায়ের উপর ছোট্ট এই রোদের টুকরোটি।

শিপ্রার নিচের ঠোঁটটি হাসিতে ঈষৎ স্ফুরিত হ'য়ে ওঠে: মন্দ কী!

সৌম্য এবার তার সমস্ত মুখের উপর পরিব্যাপ্ত দৃষ্টি ফেলে; বলে: আর আমাকে?

লজ্জার লৌহিত্যে শিপ্রার মুখ একটা উন্মোচিত ফুলের মতো কাঁপতে থাকে। কথা যেন রক্ত হ'য়ে বাজতে থাকে শরীরের স্নায়ুতে। কিন্তু সহসা ধরের এই অন্তরঙ্গ নির্জনতা, ভোরবেলার এই সজীব শান্তি, মুহূর্ত ক'টির এই উজ্জ্বল ঘনতা, তার মাঝে যেন উচ্চারিত হ'যে উঠতে চায়। আবিষ্ট, দীর্ঘ একটি দৃষ্টি মেলে সে সমস্ত শরীরে সাহস সঞ্চয় করে' বলে: খুব ভালো।

সেই স্বর সমুদ্রের ঢেউয়ের সফেন আদরের মত সৌম্যর শরীরের উপর ভেঙে পড়ে।

তাই ব'লে' এই আদর-কাড়াকাড়ি করবার বেশি সময় নেই শিপ্রার, অন্তত এই ভোরবেলা, চাযের টেবিলে। তার অনেক কাজ, তার লেখাজোখা নেই। সংসার বেশি বড়ো নয়, পরমেশবাবুকে নিযে তিনটি-চারটি মোটে প্রাণী, চাকর আর ঠাকুর, তবু কাজ তার অফুরন্ত। এতো কাজ যে কোথায় এতোদিন লুকিয়ে ছিলো সৌম্য তা ভেবে কুলিয়ে উঠতে পারে না। শিপ্রার হাত লেগে ছোট-ছোট খুঁটিনাটি

কাজগুলি পর্যন্ত গানের টুকরোর মতো বেজে উঠেছে। কাজগুলির দাম একমাত্র তাদের চপল অনাবশ্যকতায়, শিপ্রার সশরীর আত্ম-বিকিরণে। কাজ না করলে তার নয়, কাজগুলিই তার আকাশের দিকে প্রসারিত জীবনের ছোট-ছোট জানলা। তার ছুটি, তার উদ্বৃত্তি।

খবরের কাগজ নিয়ে সৌম্য তারপর একটা কৌচের গহ্বরে ডুবে যায়, মদিরতর আলস্যে। তার সমস্ত বিদ্যাবত্তা এখন মাত্র এই প্রাত্যহিকতায় এসে ঠেকেছে। তারপর কখন আবার শিপ্রা উঠে আসে, তার চলায় এখন একটু কর্ত্রীত্বের মন্থরতা, পরনের রুক্ষ শাড়িটা দিনের ময়লা লেগে এখন একটু সম্বৃত, গম্ভীর হ'য়ে উঠেছে। সৌম্য চম্‌কে ওঠবার ভান করে না, খবরের কাগজের আড়ালে তার সেই গাঢ় উপস্থিতিটি সে সম্ভোগ করে।

শিপ্রা এগিয়ে এসে বলে : বেলা হ'লো যে, এখন উঠবে না ?

—তাই নাকি ? ক'টা বাজলো ? কাগজগুলি মস্‌মসিয়ে দুমড়ে সৌম্য উঠে পড়ে।

—বড়ো ঘড়িতে প্রায় সাড়ে ন'টা।

—বলো কী, সময় যে আজকাল উড়ছে।

অথচ, আগে-আগে নিজেকেই নিজের তার তাড়া দেবার কখনো সময় হ'তো না, নিজেই সে থাকতো এতো উচাটন। ঘড়ির কাঁটাটা সব সময় তার চোখের উপর বিঁধে থাকতো। এখন, শিপ্রার উপর সে তার অনেক ভার, অনেক শ্রান্তি নামিয়ে দিয়েছে, এখন এই তাড়াটুকুর জন্যে সে শরীর পেতে অপেক্ষা করে।

মাত্র খাওয়ার মধ্যে পৃথিবীর যে এতো স্বাদ ছিলো তা কে জানতো ? ঠাকুরের উপর এখন থেকে শিপ্রা খোদগিরি করছে বলে' প্রত্যেকটি খাদ্য যেন তার স্নেহক্ষরণে মধুর হ'য়ে উঠেছে। সপ্তাহান্তে

কবে আবার ছুটির দিন আসবে, তারা দু'জনে বসবে একসঙ্গে খেতে বৈপ্রহরিক নিজনতায়। খাওয়ার সময়টায় শিপ্রা তার আশে-পাশে টুকরো টুকরো হ'য়ে ছিটিয়ে থাকে। খেয়ে উঠতে-না-উঠতেই শিপ্রা আবার তার পোষাকের সম্ভারকে লেগেছে। ছোট বোতামটি থেকে শুরু করে' পেন্টালুনের ক্রিজটি পর্যন্ত তৈরি, নিভাঁজ।

পিছন থেকে কোটটা মেলে ধরে' তাকে হাত ঢোকাবার সুবিধে ক'রে' দিতে-দিতে শিপ্রা হাসিমুখে জিগ্গেস করে: এতোদিন তোমার কী করে' চলতো, যতোদিন আমি ছিলুম না?

—সত্যি, আমিই নিজে অবাক হচ্ছি, শিপ্রা, তুমি এতোদিন না এসে কী করে' থাকতে পারলে? দেখছোই যখন আমার চলছিলো না।

কোটটা পরে' সৌম্য ঘুরে দাঁড়ায়।

—চলছিলোই না তো। শিপ্রার চোখে-মুখে হাসি ভুরভুর করতে থাকে।

—সত্যি চলছিলো না, সত্যি আমি থেমে ছিলুম। এখন একেবারে গন্ধের মতো গড়িয়ে চলেছি।

—ছু'ই। কুঁড়েমির একটি ঢিপি হচ্ছ দিন-দিন।

—তোমার জাদুমন্ত্র। আমার অনেকখানি তোমাকে দিয়ে ফেলেছি যে, ভীষণ হাল্কা হ'য়ে গেছি। দাও, দাও, পান দু'টো দাও দিকি এগিয়ে। বেলা হ'লো।

সৌম্য ছোট্ট একটি হাঁ করে। যাতে ধরতে না পায় দু'টি আঙুলে সেই দুষ্টুমি এনে শিপ্রা তাড়াতাড়ি পানের খিলি দু'টো তার মুখের মধ্যে ছেড়ে দেয়। তার বাইরের এই সম্ভ্রান্ত সাহেবিয়ানার ফাঁকে এই পান-টুকুকেই শুধু সে প্রশ্রয় দিয়েছে—শিপ্রার হাতের সবুজ এই একটি স্নেহ, তার সলজ্জ একটি চুম্বনের মতো নিটোল। শিপ্রা জানলায়

লুকিয়ে একটু-বা দাঁড়ায়, এমন ভাবে দাঁড়ায় যাতে সহজে সৌম্যর না চোখে পড়ে, অথচ যাতে তার এই আধেক দাঁড়ানোটি অনায়াসে সে বুঝতে পায়, পিছনে না তাকিয়েই।

সারাদিন আপিসে নানা কাজের জটিলতায় বসে'-বসে' সৌম্য প্রতীক্ষা করে কখন আবার আসবে সেই তীক্ষ্ণ কালো রাত, অন্ধকারে দীপ্যমান সেই নিঃশব্দতা। আপিস যখন ভাঙে, সন্ধ্যাব সেই ধূসর সূচনাটি শিপ্রার চোখের ক্লান্ত কাতরতার মতো বন্ধুতায় স্নিগ্ধ মনে হয়। আবার সে লুকিয়ে জানলায় এসে দাঁড়িয়েছে, সেই একটি অস্পষ্ট আচ্ছন্ন ভঙ্গিতে, যাতে আবার সৌম্য না তাকে দেখতে পায। সান্ধ্যকৃত্য সেরে সৌম্য আর কোথাও বেরোয় না, কাউকে আর ডাকেও না তার বাড়িতে—কোথায় সে আর যাবে, পৃথিবীতে আর জায়গা কোথায়? বসে'-বসে' অন্ধকার শুধু সে ঘন করতে থাকে, একটা কঠিন অস্তিত্বের মতো তা ধীরে-ধীরে সন্নিহিত, পরিব্যাপ্ত হ'য়ে ওঠে চারপাশে। মানুষের জীবনে রাত যে একটা এতো বড় সৌন্দর্য তা তাব আগে আর কে জেনেছে?

তারপর আবার আরেকটি সকাল, আবার আরেকটি পরিচ্ছন্ন পুনরাবৃত্তি।

এতো সুখ যে, ঈশ্বরে বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে, এতো সুখ যে, মানুষের শরীরে যেন তা বহন করা যায় না। মনে হয় না পৃথিবীতে কোথাও কোনো দুঃখ আছে, কোনো দুঃখ থাকতে পারে পৃথিবীতে। আর থাকলেই বা কী, তার তাতে কী এসে যায়? পৃথিবীব এক-অর্ধ অন্ধকারের জন্যে আরেক-অর্ধ দিবালোক হাহাকার করুক, সে সুখী, সে সম্পূর্ণ, তার অস্তিত্বের শীতল এই ছায়ায়, অন্ধকারের এই ভয়ঙ্কর বিপুল প্রশান্তিতে। সে আর কিছু চায় না, শুধু প্রচুর প্রাণধারণ করতে, তার উত্তপ্ত উচ্ছ্বসিত দেহে, শুধু বিস্তার করতে তার রক্তের

রশ্মিজাল অরণ্যে বিদ্যুৎরোমাঞ্চের মতো। সে আর জানতে চায় না, পুঁথি-পত্রকে নির্জীব আবর্জনার মতো সে দূরে ঠেলে দিয়েছে, সে এখন চায় বুঝতে, প্রতিমুহূর্তে জীবন্ততরো হ'তে। এর চেয়ে কোথায় আর সুখ আছে—বাঁচবার বিস্ময়ে শুধু বাঁচা, মুহূর্ত থেকে মুহূর্তের চূড়ায় ভেঙে ভেঙে পড়া, দেহের প্রতি অণুতে রৌদ্রবঙ্কিম হ'য়ে ওঠা। শিপ্রা—এই শিপ্রাই তার জীবনে নিয়ে এলো প্রথম বাঁচবার অর্থ, বাঁচবার অসামান্য রহস্য। সে-ই নিয়ে এলো জীবনের ঊর্ধ্বে আকাশের অলৌকিকতা, দেহের গহ্বরে গাঢ় নিঃশব্দায়মান একটি স্তুতি, ঈশ্বরের বিশাল ছায়াচ্ছন্নতা। শিপ্রা যেন তার জীবনে বিশালতার একটা ঢেউ, অন্ধকারের মন্দিরে তার একটি খোলা দুয়ার। তার সমস্ত সুখ যেন পৃথিবীতে বাস্তবিক ব্যাপ্তিতে ছড়িয়ে পড়েছে, সমস্ত পৃথিবী যেন সীমা পেয়েছে এসে তার এই ছোট ঘরটুকুর ঘনতায়।

কোনো রাতে, মোমের মতো নরম, ফেনার মতো ফাঁপানো জ্যোৎস্না শিপ্রাকে নিয়ে খেলা। ছাদে উঠে আসে। চারদিকে জ্যোৎস্নার উতল ঝড় বইছে, সাদা শব্দহীন ঝরে পড়ছে সেই জ্যোৎস্নার জলধারা। তারা কেউ কোনো কথা বলে না, কথা এখানে কাবির তার মতোই মিথ্যা, অবাস্তব। সেই চন্দ্রিল নিঃশব্দতায় মনে হয় না শিপ্রার শরীরে শরীরের কোনো রেখা আছে, খানিকটা সে-ও যেন এই জ্যোৎস্নারই মতো বিনিঃশেষ অসীমতা, ভাসমান একটা আভা। তাকে আর চেনা যায় না, চারপাশে নিয়ে আসে সে একটি অনির্বচনীয় দূরত্ব। তারপর একেকদিন বর্ষা নামে, একেকদিন কী বর্ষাই যে নামে। সে-সেদিনও কথা যায় ফুরিয়ে, ঘনিয়ে আসে সেই অশরীরী অপরিচয়ের সুষমা। সার্সির ভিতর দিয়ে পরিত্যক্ত নির্জন শহরটা দেখা যায়, যেন ঘোলাটে চোখে চেয়ে আছে নিরীহ, অসহায় একটা পশু। সেই সব মুহূর্তগুলি বিচ্ছেদের সুরে কেমন ঘন, অস্ফুট হ'য়ে ওঠে। সেদিনো আবার

শিপ্রাকে পাওয়া যায় না সাধারণ প্রাত্যহিকতার নাগালে, বৃষ্টির বিরমমাণতা তার চারপাশে নিয়ে আসে দূরত্বের একটি সুন্দর ঔজ্জ্বল্য। আশ্চর্য, শিপ্রা শুধু এই তার ঘরোয়াপনা দিয়েই তৈরি নয়, তার পরিমিত প্রাঞ্জলতার তলায় যেন আছে আবার একটি দুরূহ দূরের ইশারা। তাই তাকে কতো ভালো লাগে, কতো একান্ত ক'রে অফুরন্ত।

তারপর একদিন শিপ্রা তার বাপের বাড়ি চ'লে গেলো গ্রাম্য কোন মফস্বলের শহরে। নেমে এলো বিচ্ছেদের ছায়া, সমস্ত ঘর রিক্ততায় উঠলো ভ'রে। ছোট-ছোট কাজগুলি শিপ্রার হাতের ছোঁয়ার জন্যে এখানে-ওখানে ব'সে কাঁদছে, দেয়ালের নীরবতায় লিপ্ত হ'য়ে আছে তার বিদায়ের শুভ্রতা। কিছুই ভালো লাগে না—কী ভালো লাগে এই স্মরটি দিয়ে মুহূর্তগুলিকে তপ্ত ক'রে রাখতে। শয্যাময় পুঞ্জীভূত আলস্য, শরীরের এই ক্লান্তির ঘনিমা, ঘরের শূন্যতায় প্রতীক্ষার এই বিশাল নিশ্চিন্ততা—কী ভালো লাগে শিপ্রার এই প্রথম বিদায়। তারপর একদিন তার চিঠি এলো, তার ঠোঁট দু'খানির মতো লাজুক একটি চিঠি। ঘটা ক'রে কোনো কথাই সে লিখতে পারে নি, কথার শান্ত সাবলীলতার সঙ্গে মিশে আছে তার চিকন দ্রবীভূত ঐকান্তিকতা। ছোট চিঠিটি যেন তার গায়ের একটুকরো উষ্ণতা, [illegible] তার একাকী একটি নিশ্বাস। সব তার ভালো লাগছে, নতুন ক'রে তার এই বাপের বাড়ির সবাইকে, কিন্তু আরো ভালো লাগতো যদি আর কেউ তার সঙ্গে থাকতো তার এই হাসি-হল্লোড়ের পরে বলিষ্ঠ একটি নৈশ স্তব্ধতার মতো। সৌম্য যে কী লিখবে কিছু ভেবে পায় না, তার বিদ্যার পাহাড়টা তার মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল ক'রে চেয়ে থাকে। শেষ পর্যন্ত যা সে লিখে ফেলে—পরীক্ষার পর এই তার প্রথম রচনা—ভেবে অবাক হয়, এতো সহজ এতো সাধারণ, এতো অকপট হ'তে তাকে কে শেখালো?

ক্লান্তির মেঘ যায় কেটে, একদিন আবার শিপ্রা ফিরে এলো। মিলনের ঔৎসুক্যে সর্বাঙ্গ সে ঝামর। রাত [illegible] আবার এলো সেই কথাহীন কালো রাত, সেই মুখর মধুর [illegible]। অঙ্গুলি হাতের ছোঁয়া পেয়ে শিপ্রার মৌক্তিক দাঁতের মতো হেসে উঠলো, দোলা এলো আবার সান্নিধ্যের [illegible]। [illegible] মধ্যে [illegible] বয়ে চললো দিনরাত্রি নিস্তরঙ্গ নিঃসরণ। সৌম্যের মনে হতে লাগলো চারদিকে উত্তাল হ'য়ে উঠেছে উদ্দাম জল, শুধু তাদের এই ঘরটি যেন নৌকার সেই আক। নিশ্বাসে উষ্ণ, আলস্যে বিস্তৃত, আশ্রয়ে সীমাবদ্ধ, এই ঘরটিই যেন তার সমস্ত পৃথিবী। শিপ্রা যেন সেই পৃথিবীর উপরে নীল, অসীম একটুকরো আকাশ।

এত ঘর ছেড়ে [illegible] সে আর [illegible] তাকে মানিয়েছে এই রতিবিদ্যুত উত্তপ্ত [illegible]। [illegible] দ্বারা বিচ্ছিন্ন এই পরিমিতি। এই ধূলিলেশহীন, নির্মল নিশ্ছিদ্র অবকাশ।

বন্ধু মহলে রব উঠলো: স্ত্রৈণ।

সৌম্য হেসে বললো: স্ত্রীকে ভালোবাসি এটা কি আমার অপরাধ?

—স্ত্রীকে কি আর আমরা ভালোবাসি না? তাই বলে কি কোনো ভদ্রলোক এতোটা বাড়াবাড়ি করে তোর মতো?

সন্দেহ হয়, সৌম্যর ঘোরতরো সন্দেহ হয়, সত্যি এরা এদের স্ত্রীদের ভালোবাসে কিনা। না, এদের কাছে তারা [illegible] আহার্য, জীবনধারণের একেকটি উদ্ভাবন? এরা সবাই যেন কেমন একটু সকরুণ, অবজ্ঞাশীল, স্ত্রীদের প্রতি তাদের ভালোবাসা যেন তাদের কাছে একটা যান্ত্রিক অভ্যাসের শামিল, যেমন ভালোবাসে তারা চাকরি, আহারের পরিপাক, রাত্রের ঘুম। কিন্তু সৌম্য তাদের চেয়ে আলাদা শিপ্রা শুধু তার বিচ্ছিন্ন স্ত্রীত্বে আবদ্ধ হ'য়ে নেই সে তার সৃষ্টি, সে তার সার্থকতা। রক্তের কোষে-কোষে এতোদিন যে-প্রেম ছিল সুপ্ত

হ'য়ে ছিলো, চমকিত প্রাণময়তায় তাই একদিন পরিণতি পেয়ে উঠলো তার শিপ্রাতে। সে তাদের থেকে আলাদা, অভ্যাসে তারা বিবর্ণ ক্ষীণ তা ঠিক, কিন্তু তার জীবন রেডিয়মএর মতো দ্যুতিমান, অনবরত শক্তি বিকিরণ করে'ও তার ক্ষয় নেই।

বন্ধুদের আর-কেউ বলতো: ছেড়ে দে ওকে, নতুন বিয়ে হয়েছে, দু'দিন গেলেই আবার ঠিক হ'য়ে যাবে। হবে-দরে হাঁটুজল।

সৌম্যও তাদের সঙ্গে বন্ধুতায় সমতল হ'য়ে উঠতো। হেসে বলতো: হ্যাঁ, কতোদিন আছি তার যখন ঠিক নেই, তখন যে দু'দিন পাওয়া যায় তাই লাভ।

সেই জনতা থেকে পালিয়ে আসতো সে শিপ্রার সামীপ্যের উত্তাপে। বাইরে ওরা তাকে খণ্ডিত করে, নিয়ে আসে চারপাশে পুরাতন স্মৃতির স্থবিরতা, শুধু শিপ্রার কাছেই সে পরিপূর্ণ শুধু শিপ্রার কাছেই সে পুরোনো নয়।

চার

বন্দরে জাহাজ এসে দাঁড়িয়েছে। শিপ্রা এতোদিনে পেয়েছে তার সীমার সম্পূর্ণতা, তার অনুকূল পরিবেশ। যে-গাছের যেমন সার, তার এই সংসার ও স্বামী, স্বামীর স্নেহ ও সংসারের সীমা। শিপ্রা নিজের কাছে পর্যাপ্ত যথেষ্ট হ'য়ে উঠলো। এটা তার কাছে অসম্ভব, আকস্মিক বলে' কিছু মনে হ'লো না, যেন এই তার যৌবনের স্বাভাবিক পরিশিষ্ট, তার শরীরের ও মনের পরিপার্শ্বে যেন চিরকাল ধ'রে রয়েছে এরই নির্ভুল সমর্থন। এর মাঝে তার কাছে কিছু বিস্ময়কর নেই, আগাগোড়া শুধু একটা নিশ্চিন্ত, সহজ সজ্ঞানতা।

তেমন বিস্মিত হ'বার কিছু নেই বটে তার পক্ষে, কিন্তু তবু, শিপ্রার দুই হাতে এতো সুখ যেন আর ধরে না। বলতে দোষ কী, এতোটা তার না হ'লেও চলতো, না হ'লে বিশেষ বেমানান হ'তো না। পরমেশবাবু এতো মেয়ে বাছতে শুরু করেছিলেন, কারো আশা ছিলো না শেষকালে শিপ্রাকে তাঁর মনে ধরবে। শুধু তার চেহারার সবল, পরিচ্ছন্ন পারিপাট্যের জোরে সে যে এই দুঃসাধ্যসাধন করে' বসবে এ কথা কেউ বিশ্বাস করতে পারতো না। তার না ছিলো টাকা, না বা আধুনিক বিদ্যাচর্চার কৃত্রিম লালিত্য, সেই স্তিমিত আতাম্রতা। তারপর সৌম্য বিনা স্বচক্ষে তাকে পছন্দ করে' গেলো না। সবাই যাবার সন্দেহ করল। বলাবলি শুরু হ'লো: ছেলের এখন মন উঠলে হয়।

সেইদিক থেকে ঘটলো আবার আশাতীত, সন্দেহের বাষ্পটুকু কোথাও রইলো না। মেয়েটা অসীম ভাগ্য করে' এসেছে, জীবনের পরিভাষায় একেই বলে নিয়তি। শিপ্রাকে পেয়ে সৌম্য একেবারে

মুগ্ধ, বিস্ফারিত, দুই হাতে ধরবে না তার এই নিজেকে ঢেলে দেবার অজস্রতা। তার কাছে কিছুই সে চায় নি, শুধু সে তাকে চেয়েছে। সে একটা কিছুর প্রমাণ নয়, পরিপূর্ণ একটি প্রাপ্তি। কেন যে সৌম্যর এতো ভালো লাগ্‌লো বলা কঠিন। ভালো লাগ্‌লো হয়তো তার এই শ্যামল গ্রাম্যতা, তার এই গা-ময় মৃত্তিকার শান্তি, হয়তো বা তার এই নিরীহ নির্লিপ্ত মুখখানির নরম মমতা। অলস, নিস্তেজ দু'টি ভুরু, বড়ো-বড়ো ভাসমান দু'টি চক্ষুর কিনারে পল্লবের সজল একটু ছায়া। কে জানে হয়তো ভালো লাগলো জীবনের এই তার প্রথম, প্রখর নতুনত্ব, নিজেকে খুঁজে পাবার উদ্দাম, প্রচণ্ড চঞ্চলতা। যার জন্যেই হোক, তার ভালো লাগলো, ভালো লাগলো শিপ্রাকে, শিপ্রাকে ঘিরে তার অশরীরী অসীম পরিমণ্ডলকে।

তাকে যে স্বামীর খুব ভালো লেগেছে তা বলে শিপ্রার বেশি দূর যেতে হয় না, তার জন্যে সে কৃতজ্ঞ সুখী, নিশ্চিন্ত—তবু এটা তার কাছে কিছু একটা আশাতিরিক্ত, অসম্ভব ব'লে মনে হয় না, বরং মনে হয়, এ তো হ'বেই। এখানে আসবার আগে, একটু ভয়ে-ভয়ে হ'লেও সে ভেবে রেখেছিলো, পাবেই সে স্বামীর ভালোবাসা, স্বামী তাকে ভালোবাসবে এতে অবাক আশ্চর্য হবার আছে কী। সব চেয়ে তাকে আশ্চর্য করেছে, তার এই অধিকারের সম্পদ। এতো বড়ো যে স্বামী, এতো গুণী, এতো সুন্দর, এতো টাকা যার মাইনে, সে কেমন অনায়াসে তার আশ্রয়ে এসে বিশ্রাম করছে, তার আনন্দিত করুণায়—তাকে স্পর্শ করে স্বামীর ভালোবাসা নয়, ভালোবাসার বিশাল এই অসীমতা। স্বামীর প্রেমে আবিষ্কার করে সে তার নিজের মূল্য, নিজের অধিকার। স্বামী তার হাতের মুঠোয়, সমস্ত সংসার তার পায়ের নিচে। স্বামী তাকে শুধু একটা স্থিতি দেয়নি, দিয়েছে অবারিত একটা স্থান। এতো জায়গা, এতো মুক্তি সে রাখবে কোথায়।

তার স্বামী, তার সংসার—শিপ্রা ঐশ্বর্যের বন্যতায় একটা ব্যাঘ্রীর মতো মহিমান্বিত হ'য়ে উঠেছে। পেয়েছে সে তার অধিকারের আস্বাদ, আর তাকে পায় কে? আগে করতো পদচারণা, এখন অভিযান। তাকে কারো কিছু আর বলে' দিতে হয় না, বলে' দেবার লোকই বা কোথায়, সে একাই যথেষ্ট। সৌম্য আপিস চলে' গেলে খাওয়া-দাওয়া সেরে আপন খুশি-মতো সে ঘর সাজাতে বসে, তার দশটি আঙুলে ছিটিয়ে দেয় তার মুক্তির আনন্দ, ছোট-ছোট কাজে অকাজে তার অবকাশের নদী কলধ্বনিত হ'তে থাকে। সমস্ত সংসার যেন তার চিত্তের মুকুর, তার চারদিকের দেয়াল যেন তার মুক্তি দিয়ে তৈরি। বেলা গড়িয়ে আসবার সঙ্গে-সঙ্গে শিপ্রাও অন্ধকারের আশায় রক্তিম হ'য়ে ওঠে, নিচে নেমে যায় স্বামীর জলখাবার সাজাতে। সে স্পষ্ট গুনে' বলে' দিতে পারে আজ তার মুখে কী ভালো লাগবে। সে-পাট গুছিয়ে রেখে কলতলায় সে যায় গা ধুতে, উপরে এসে চুল বাঁধে, সিঁথিতে আঁকে সিঁদুরের শিহরিত একটি শিখা—সে ঠিক জানে আজ কোন শাড়িটায় সে বেশি খুলবে। তারপর সৌম্য ফিরে আসে, সঙ্গে নিয়ে আসে অন্ধকারের আবরণ রোমাঞ্চ, অন্ধকারের কোমল বলিষ্ঠতা, ঘরের ঘুমন্ত শূন্যতা হঠাৎ কথা কয়ে ওঠে। সত্যি, শিপ্রা ভরে' আছে, অণুতে-অণুতে ভরে' আছে, তার প্রতিটি পা-ফেলায়, পা-ফেলার প্রতিটি উচ্ছলতায় ঝলসে উঠছে এই তার ভরে'-থাকার সুর। যখন যা তুমি চাও, তখন তা তুমি পাবে। স্বামীর পকেটটা পর্যন্ত তার নাগালের মধ্যে।

—বলো তো, তোমার পকেট থেকে আজ ক' পয়সা নিয়েছি?

—নিয়েছ নাকি? সৌম্য ক্ষিপ্র আঙুলে মানিব্যাগের কোটরটা পর্যবেক্ষণ করে: কতো?

—বলো না দেখি। দেখি তোমার কেমন হিসেব।

—যা ছিলো তাই তো আছে মনে হয়, সৌম্য অবাক হ'য়ে জিগ্‌গেস করে: আরো ছিলো নাকি টাকা?

—টাকা না হাতি। এই দেখ। দু'টি আঙুলের মুখে শিপ্রা ছোট একটি আনি তুলে ধরে।

—চার পয়সা? সৌম্য তো হেসে কুটপাট: চার পয়সা দিয়ে তুমি কী করবে?

—ভুট্টা খাবো। শিপ্রা আবদারের স্বরে খুকিকে পর্যন্ত হার মানায়: তুমি কিন্তু না করতে পারবে না। ভুট্টা খেতে আমার ভারি ভালো লাগে।

স্ত্রীকে নিয়ে আসে সে সহজ প্রাত্যহিকতায়, তার সঙ্গে ধীরে-ধীরে সে একটা বিস্তৃত সমতা খুঁজে নেয়। আজকাল তাদের মধ্যে গুরুতর সব দরকারি কথা এসে পড়েছে, চাল-ডাল, তেল নুনের হিসেব। কী করে' খরচ কমানো যায়, অন্তত তার নিজের খরচ, সেই যেন তার একটা বিলাস হ'য়ে উঠলো। এ-ও যেন তার অধিকারবোধেরই একটা ভঙ্গি। তার ব্যক্তিত্বের একটা স্তর।

সৌম্য বলে: খরচ করবো না তো তবে আছে কী করতে?

শিপ্রার মুখ মলিন একটু স্নিগ্ধতায় ভিজে ওঠে: তার জন্যে শুধু শুধু এমনি উড়োবে নাকি? কী হবে আমার এতো বাক্সের শাড়ির পাহাড়ে? আমার একটাই তো শরীর, ক'টা একসঙ্গে পরা যায়?

—একসঙ্গে না হোক একটার পর একটা তো পরা যায়। প্রতিদিন ভোরবেলার নতুন পৃষ্ঠা বদ্‌লানোর মতো। সৌম্য তাকে তৃপ্ত পরিতৃপ্ত চক্ষু দিয়ে যেন লেহন করতে থাকে: সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো তুমি প্রতি মুহূর্তে যদি না নতুন হ'য়ে ওঠো তবে আকাশে এতো ঐশ্বর্য কেন?

—তাই বলে' শাড়ি পরে' আমাকে নতুন হ'তে হ'বে?

—তোমার শাড়িটা হচ্ছে আমারই আত্মপ্রকাশের প্রতীক। সৌম্য

শিপ্রার কথার নাগালের অনেক বাইরে চলে' যায়: মানুষের সম্পত্তি মাত্রেই তাই। যা কিছু তাদের উদ্বৃত্ত তাই দিয়ে তারা নিজেদের উদ্ঘাটিত করে। আবার সৌম্য সহজ সমতলতায় নেমে আসে: তোমার ঘর সাজিয়ে যেমন সুখ, আমার তেমনি তোমাকে সাজিয়ে। তুমি ছড়িয়ে পড়ছ সংসারে, আমি ছড়িয়ে পড়ছি তোমাতে। আমি তো ভাবছি আর ক'টা মাস পরে একটা মোটর কিনব।

—মোটর? মোটর দিয়ে কী হ'বে?

—রাস্তায় দেখতে পাও না মোটর দিয়ে কী হয়? তোমাকে নিয়ে বেড়াবো, গঙ্গার ধারে, সোজা চলে' যাবো নৈহাটি—সেখানে তোমার ছোট-মাসি আছেন বলছিলে না?

—শেষকালে চাকা কেটে মাঝপথে হাঁ ক'রে ব'সে থাকি আর-কি।

—কেন, চাকা তক্ষুনি বদলে নেবো।

—বাবাঃ, দরকার নেই অতো হাঙ্গামায়। কেন, ট্রেন কী দোষ করলো? ট্রেনে যাওয়া যায় না নাকি?

সৌম্য শিশুর মতো খিলখিল ক'রে হেসে ওঠে: ট্রেনে যে অনেক লোক।

—আহা, তাই ব'লে কি ট্রেনে আর কেউ যায়? তোমার সবতাতেই বাড়াবাড়ি। যাওয়া হয় কি না-হয়, আগে থাকতেই তুমি মোটর কিনে বসো।

—না-ই বা হ'লো যাওয়া। আমরা এখানে-ওখানে বেড়াবো, গঙ্গার ধারে, মাঠে, মাঠের অন্ধকারে—

—অতো ঠাটে আর দরকার নেই। আমি সব কাজ-কর্ম ফেলে মোটরে করে ওঁর সঙ্গে হাওয়া খেতে বেরুই আর-কি। শিপ্রা ভুরু দুটি কুটিল করে গর্বের একটা ঘূর্ণি তুলে চলে যায়। হাসতে-হাসতে সৌম্য তার পিছু ধরে।

আবার কোনদিন বা মুখখানি মালিন্যে মধুর করে সে সৌম্যর পাশ ঘেঁষে এসে দাঁড়ায়। চুলের মধ্যে আঙুলগুলি নিয়ে নাড়া-চাড়া করতে করতে বলে: আমাকে তিন আনা পয়সা দিতে পারো?

প্রার্থনা শুনে সৌম্য চম্‌কে ওঠে: গোনাগুন্‌তি একেবারে তিন আনা-ই? তুমি ঠিক জানো? দশ পয়সা নয়?

শিপ্রা হেসে ওঠে: সত্যি দাও না, আমি একটা জিনিস কিনবো।

—জিনিস কিনবে? বলো কী? আজকাল জিনিস-পত্রগুলি এতো ভীষণ আক্রা হ'য়ে গেছে নাকি?

—হাঁ, দাও না, অনুনয়ে একটু-একটু করে শিপ্রা ঘন হ'তে থাকে: আমি পুঁতি কিনবো।

—পুঁতি? পুঁতি দিয়ে কী হবে?

গালের আধখানায় লজ্জার নরম একটু আভা এসে পড়ে: কানের ঝুম্‌কো করবো।

সৌম্য তাকে কাছে টেনে এনে বলে: বেশ, বিকেলে স্যাকরার বাড়ি লোক পাঠিয়ে দেবো'খন।

—স্যাকরা দিয়ে কী হ'বে? স্যাকরা পারবে নাকি এই পুঁতির ঝুমকো করতে?

—তুমি দেখো পারে কিনা।

—না, না, তুমি আমাকে পয়সা দাও। দেখো না কী সুন্দর তৈরি করি।

—নাও গে, ঐ পকেটে আছে।

শিপ্রা তক্ষনি ছুটে যায় আলনার দিকে, পকেট হাট্‌কে পয়সা বা'র করে' বলে: এই দেখ তিন আনা নিলুম কিন্তু।

—কী আশ্চর্য, খুচরো তিন আনা-ই ছিলো, সৌম্য হেসে ওঠে: আরো কিছু বেশি নিলে না কেন?

—বেশি নিয়ে আমি করবো কী ? শিপ্রা স্তম্ভিতের ম'তো চেয়ে থাকে।

—খরচ করবে ইচ্ছে মতো।

—এই তো করছি। করছি না ?

—ছাই। তুমি আমার কাছে কিছু চাও না কেন, শিপ্রা ?

—বা রে, এই তো চাইলুম। আবার কী চাইতে হ'বে ? শিপ্রা ঘরের চারিদিকে উজ্জ্বল, চঞ্চল চোখে তাকাতে থাকে: বলো না আর কী চাওয়া যায় ?

—তোমার কোনো জিনিস কিনতে ইচ্ছে করে না ?

—এই তো করলো। দেখ'লে তো, অমনি চেয়ে ফেললুম চোখ কান বুজে।

—এ ছাড়া আর কোনো জিনিস ?

—তা তুমিই ভালো জানো। শিপ্রা যেন হাঁপিয়ে ওঠে: আমি তো কিছু ভেবে পাই নে।

—শোনো। সৌম্য উঠে দাঁড়ায়: আমি তোমাকে মাসে-মাসে দশটা ক'রে' টাকা দে'বো।

—দ শ টা কা ? শিপ্রা যেন চারদিকে সাদা অন্ধকার দেখে: অতো টাকা দিয়ে আমি করবো কী ?

—খরচ করবে যা তোমার খুশি।

—বাবাঃ, শেষকালে হিসেব রাখতে ম'রে' যাই।

—না, ও-টাকার তোমার হিসেব রাখ'তে হ'বে না। ও তুমি অমনি ছড়িয়ে দেবে।

—ও! শিপ্রার ঠোঁট দু'টি গোল, গম্ভীর হ'য়ে ওঠে: মাঝে-মাঝে তোমার কাছে এসে চাই ব'লে' তুমি বিরক্ত হও। এতোক্ষণে বুঝেছি। হ্যাঁ, এতোক্ষণে। বাবাঃ, কী ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে কথা !

সৌম্য হেসে ওঠে : না, না, তার পরেও আবার চাইবে বৈকি। যক্ষুনি যা দরকার।

—তার পরেও আবার চাইবো? কী চাইবো? তোমরা আমাকে চাইবার সময় দিলে কোথায়? এতোক্ষণে শিপ্রার মুখে তৃপ্তির একটি লাবণ্য ছড়িয়ে পড়ে : বাবা সংসারের খরচ করেন, সব সময়ে তাড়া দিচ্ছেন—বলো বৌমা, তোমার কী লাগবে? কী খেতে তুমি ভালোবাসো? সেদিন দুঃখের মধ্যে চাইলুম একটু তাল শাঁস খেতে, দেখলে তো কাণ্ডটা, বাঙলা-দেশে তালগাছ আর রইলো না। তোমার কাছে কিছু চাইতে যাওয়াই তো বৃথা। পৃথিবীতে চাইবার যে এতো জিনিস থাকতে পারে তা আমি ভাবতেও পারতুম না।

পুঁতির ঝুমকোটা তখনো শিপ্রা শেষ করে' উঠতে পারে নি, বিকেল বেলা আপিস-ফেরৎ সৌম্য এসে বললে,— এই দেখ কী এনেছি তোমার জন্যে। বলো তো কী?

—দেখি, দেখি। শিপ্রা সমস্ত শরীরে ঝলমল করে' উঠলো : বা, কা'র, কা'র এটা? কা'র জন্যে এনেছ?

—বলো তো কা'র জন্যে এনেছি? আমার আর কে আছে?

লজ্জায় শিপ্রা ছলছলিয়ে উঠলো : বাঃ,—ঝলটা কতো বড়ো। কী সুন্দর কাজ! মুক্তোগুলি কেমন টিকটিক করছে। কতো দাম পড়লো শুনি?

—দাম জেনে আমাদের কী হবে? জলের উপর প্রজাপতির মধুর আলস্যের মতো সৌম্যর দুই চোখ শিপ্রার মুখের উপর ছড়িয়ে পড়লো : লজ্জায় তোমার গাল দু'টি যে এই গ'লে যাচ্ছে—তারই বা কে দাম দিতে পারে?

—আহা! কথাটা শিপ্রা মুখে না বলে' ফুটিয়ে তুললো তার চোখের বিলোল একটি টানে, ভুরুর ভঙ্গিত একটি সূক্ষ্মতায়। আয়নার

কাছে দাঁড়িয়ে গয়না দু'টো কানে পরতে-পরতে সে বললে,—তোমাকে নিয়ে আর পারি না। আমাকে সাজিয়েই যেন তোমার সুখ। দেখ, দেখ, কেমন আমাকে এখন দেখাচ্ছে বলো তো?

সমস্ত শরীর চক্ষুষ্মান করে' সৌম্য তার দিকে, তার শরীরহীন শিহরায়মানতার দিকে চেয়ে থাকে। সত্যি, একেক সময় তার বিশ্বাস হয় না এমন একটা বিস্ময় কী করে' উদ্ভূত হ'লো তাদের এই অপরিচয়ের সমুদ্র থেকে। শিপ্রার নামের একটি নিশ্বাসও সে কোনোদিন শোনে নি, তার রূঢ় রৌদ্রে ছিলো না একটিও তারার কণিকা—তারার কণিকাটির মতোই অস্ফুট, ভঙ্গুর এই শিপ্রা: সম্পূর্ণ সুখ সহ্য করতে পারে না এমনি একটি ছায়ায় ফোটা নরম, নির্মল ফুল, তার লজ্জার সবুজ পাতা দিয়ে ঘেরা: এক চিলতে এই মেয়ে—[illegible] থেকে কী অসীম অধিকারে জুড়ে বসলো তার সমস্ত জায়গা, সমস্ত অন্ধকার। কী এসে যায় তারা স্বামী-স্ত্রী কিনা, পরিচিত কিনা পরস্পর, কী এসে যায় তাদের মিলনের এই অকাল আকস্মিকতায়? কিছু নিয়ে এসেছে তার জীবনে নতুনতরো শরীর, নতুনতরো পৃথিবী, নতুনতরো ঈশ্বর। ভাবতে সে সত্যি অবাক হ'য়ে যায়, এই একটুকরো মেয়ে তার হাতে করে' এনেছে এতো অজস্রতা, চোখে এতো করুণা, সীমন্ত ভরে' এতো অনুরাগ। কে সৌম্য, কোথায় সে বা ছিলো এতদিন, শিপ্রা তারই জন্যে সমর্পিত, সমুচ্ছ্বসিত, যেমন রাত্রি প্রাতস্তন অভ্যুদয়ের জন্যে। তারই জন্যে সিঁথিতে আঁকে সে সিঁদুর, শরীরে আনে প্রতীক্ষা, সংসারে ছড়ায় কল্যাণ। যেখানে সে হাত রাখে, সেখানেই তার দাবি, যেখানে রাখে পা, সেখানেই তার অহঙ্কার। সৌম্য আগে জানতোও না কখন তার খিদে পায়, কী খেতে তার ভালো লাগে, কিসে তার কতোটুকু অসুখ করে। সে আর একলার জন্যে নয়, তার প্রতিটি রক্তধারায় মিশেছে এখন আরেকজনের রক্ত,

তার ঘুমে ডুবে গেছে এখন আরেক জনের ঘুম। স্নেহে মুখখানি মসৃণ ব্যস্ত দিনের বেলার মতো স্বাভাবিক, রুপালী রোদের মতো খুশি—এই এক ফালি শিপ্রা যেন দুই হাতে তাকে, তার সমস্ত ভবিষ্যৎকে একসঙ্গে এক মুহূর্তে লুট করে' নিয়েছে। তার এই দস্যুতার কাছে নিজেকে ছেড়ে দেয়ার মাঝে কী শান্তি কী গভীর শান্তি। সৌম্য শুধু তাকে জায়গা ছেড়ে দেয়, দেয় তার অহঙ্কার, তার আনন্দকে বিস্তৃত বিস্ফারিত হ'বার অবকাশ। শুধু সে তাকে সাজায়, তাকে সাজিয়েই তার সুখ—এর বেশি সে আর কী করতে পারে? সে শুধু তাকে সুখী হ'বার, ক্ষণে-ক্ষণে খুশি বোধ করবার শিহরণ এনে দেয়। তাকে যে সে কী ভালোবাসে, তার প্রমাণ দেবার জন্যে সে যেন স্বর্গ-মর্ত মন্থন করে' বেড়ায়। তারই ভালোবাসা যেন শিপ্রার মুখে বিস্ফুরিত হয়। আর, কী করুণ, কী কঠিন এই ভালোবাসা। সাপের কাছে বাঁশির সুরের মতো, তীব্র একটা যন্ত্রণার মতো এর সুখ। আত্মার গভীর মর্মমূল পর্যন্ত সেই ভালোবাসা নেমে গেছে, বিষের বহ্নিময় একটা শিখার মতো। শিপ্রাকে সে এতো ভালোবাসে যে তাকে ছুঁতে পর্যন্ত তার মায়া করে: এতো ভালোবাসে যে তাকে ছুয়ে যেন সে ঈশ্বরকে ছোঁয়, ছোঁয় যেন পৃথিবীর প্রথম প্রাণের উত্তপ্ত উৎসটিকে।

শিপ্রাও এতোটা কখনো আশা করে নি। তার দিনগুলি যেন কাটছে না, তার মধ্যে গলে'-গলে' যাচ্ছে। ক্রমশই সে ছড়িয়ে পড়ছে তার অধিকারে, তার প্রেমের প্রবল নিঃশব্দতায়। কী প্রচণ্ড তার অধিকার—তার এই স্বামী, এই তার সংসার। স্বামী যেন তার চোখের দুই তারায়, সংসার যেন তার অনায়াস মুঠোর মধ্যে। আর প্রেমে কী বলিষ্ঠ, কী বিগলিত তার স্বামী, কী ছায়া-ঢাকা সমতল তার সংসার। কে জানতো, তার মাঝে এতো সম্ভাবনা ছিলো, এতো যোগ্যতা। স্বামীর স্পর্শময় সান্নিধ্যে বসে' সে আস্বাদ করে রাত্রির

আকাশময় তৃপ্তি, স্বামীর স্পর্শময় দূরত্বে বসে' সে পান করে দিনের উন্মুক্ত প্রাণধারা। এতো সুখ সে রাখবে কোথায়, এতো জায়গা সে কী দিয়ে ভরে' তুলবে? তার স্বামী, তাঁর কাজ, তাঁর উপার্জন, তাঁর পরিশ্রম শুধু তারই জন্যে—তার এতো বড়ো সংসার, শুধু সে-ই উথলে উঠবে বলে'। কোনোদিন কি সে জানতো, তার সেই অপরিস্ফুট কৈশোরে, সেই কলধ্বনিত চঞ্চল দিনগুলিতে, তার জীবনে আছে এই ঐশ্বর্যের সূচনা, এই সমৃদ্ধ মন্থরতা। বন্ধনের মাঝে এতো ধাঁধা, এতো ছুটি। এতো বড়ো আকাশ তার দুই হাতে আর ধরছে না। কী বিশাল আশ্রয়ের মধ্যে সে এসে পড়েছে। খোলার মধ্যে ছোট্ট একটি শামুকের মতো সে নিরাপদ—তার স্বামী ও তার সংসারের এই আবিষ্ট বেষ্টনের মধ্যে, কী ভীষণ সে নিরাপদ, কী ভীষণ সে দুর্ভেদ্য। এতো সুখ, শিপ্রার একেকসময় মৃত্যুর মতো ভারি অসহায় মনে হয়, এতো শান্তি, মনে হয় সে যেন প্রতি মুহূর্তে দগ্ধ হ'য়ে যাচ্ছে।

—এতো ধুলো কোত্থেকে আসে বল্‌তে পারো? কোমরে আঁচল জড়িয়ে শিপ্রা টেবিল ঝাড়ছে: আমি কিছুতেই ভেবে পাইনে, সব ধুলো কি আমার ঘরেই আসবে?

সৌম্য ড্রেসিং-টেব্‌লের সামনে বসে' দাড়ি কামাচ্ছে। বলে: পৃথিবীতে রোদই তো শুধু নয়, [illegible] তোমার হাতের নির্মলতায় মরতে আসে আর-কি।

—আর চড়ুই পাখিগুলো, কী ভীষণ যে জ্বালায়!

—তুমিই তো বলো দুপুরবেলা ওদের ডাক শুনে তোমার নেশা লাগে।

—তুমি কী কুঁড়ে, তোমার বসবার ঘরের ক্যালেণ্ডারের তারিখটা পর্যন্ত বদলাতে পারো না?

—তারিখ কি সত্যিই বদলাচ্ছে নাকি?

—না, তোমার জন্যে বসে' আছে। বলে, কী সুন্দর শীত এসে পড়লো।

—তুমিই আমার শীত। তেমনি ঘন, তেমনি ঠাণ্ডা।

—দেখেছ, কাগজ-পত্রগুলো আবার এমনি এলোমেলো করে' রেখেছ?

—কী করে' গুছিয়ে রাখতে হয়, ভুলে গেছি যে।

—না, তোমাকে নিয়ে আর পারি না।

—পারো না বলে'ই তো তোমাকে এতো ভালোবাসি।

—আর ভালোবাসতে হ'বে না। এখন দয়া করে' ভদ্রলোক সেজে তাড়াতাড়ি স্নান করো গে যাও। ঘড়ির চেহারাটা একবার দেখেছ?

—এসো না, তোমারো গালে সাবান মাখিয়ে একটু অভদ্র করে' দি। ঘড়িটা বন্ধ করে' দাও।

—বয়েস বাড়ছে, না দিন-দিন ছেলেমানুষ হচ্ছ।

—আর তুমি বুঝি হচ্ছ বুড়ি! আমাকে ছুঁয়ো না, সত্যি ছুঁয়ো না, জুজুবুড়িকে আমার ভীষণ ভয় করে।

এমনি দিনের পর দিন। অসংলগ্ন সব কথার প্রজাপতি। ভঙ্গুর সব ভঙ্গির উচ্ছলতা। মুক্তির উদ্দাম হাওয়ায় মুহূর্তগুলি যেন ঢেউয়ের লবণাক্ত ছিটের মতো তাদের জীবনের উপর ঝরে' পড়ছে, তৃষার্ত জীবনের উপর ঝরে' পড়ছে।

পাঁচ

হু-হু ক'রে দু'বছর কেটে গেলো, যেন পাশাপাশি দু'টি মুহূর্ত। প্রেম সময়কে ঘুষ দিয়ে একজায়গায় বসিয়ে রাখতে পারলো না। সমুদ্র-পাখিরা ঢেউয়ের উপর পাখা ঝাপটে একে-একে বিদায় নিলে।

আগে তবু বা শিপ্রার চলা-ফেরা লঘুতায় মন্দায়মান ছিলো, এখন, এই দু' বছর পর, আতীব্র ক্ষিপ্রতায় সে যেন শীর্ণ একটা তলোয়ারের মতো ঝক্‌মকিয়ে উঠেছে। আগে তবু বা তার একটু কুণ্ঠা ছিলো, স্বাভাবিক বয়সের কুণ্ঠা, তার নবীনতার জড়িমা: বাধা যেটুকু ছিলো তা তার পরিচ্ছন্ন অপটুত্বের। এখন আর সে-কথা ওঠে না। এখন দু' বছর সে পার হ'য়ে এসেছে, ঘেঁটেছে অনেক ধুলো, গুছিয়েছে অনেক বিশৃঙ্খলা। সে এখন সমর্পণের সমতলতা থেকে অভিজ্ঞতার চূড়ায় এসে উঠেছে। পরমেশবাবু তার হাতে সংসারের রাজ্যপাট পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছেন। সে আর এখন বধূ হ'য়ে নেই, নিরাবরণ কর্ত্রী। এখন সে চাকর-ঠাকুরকে দস্তুরমতো ধমক দিয়ে কথা কয়, দরকার হ'লে সৌম্যর মুখের উপর সে তর্ক করতে ছাড়ে না। আজকাল তার স্বরে এসেছে ধার, চলায় এসেছে গরিমা। দুই চোখ সব সময় যেন সন্দেহে তীক্ষ্ণ হ'য়ে রয়েছে, কখন কোথায় ঘটছে ত্রুটি, কোথায় বা অনিয়ম, সে ঈগলের মতো তক্ষুনি তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। ধোপা কাপড় ছিঁড়ে দিয়েছে, তক্ষুনি তাকে বরখাস্ত করো, ধাঙড় এসেছে দু'দিন দেরি ক'রে, তার মাইনে গেলো কাটা। কয়লাওলাকে সামনে রেখে কয়লা মাপাবে, ঘি-ওলা তার বোতলের দাগের এক চুল কম দিয়ে সারতে পারবে না। সমস্ত সংসার এখন যেন তার মালিকানা জমিদারি, প্রজা-বৃন্দ, এমন-কি মাছখেকো কালো বেড়ালটা পর্যন্ত তার প্রতাপে তটস্থ।

তার দিকে তাকিয়ে সৌম্য বেশ একটা মজা পায়—কী করে' সেই সেদিনের শিপ্রা আস্তে-আস্তে এমন ভোল বদ্‌লালে। তার সেই ভাঙা-ভাঙা লীলা কেমন স্তব্ধ হ'য়ে উঠলো নিটোল মাংসলতায়। আগে যার কথার আধখানা ছিলো হাসি দিয়ে ঢাকা, এখন সেই কথা কাঁটার মতো মাথা তুলে আছে, নেই আর সেই হাসির আস্তরণ। তার ঠাকুর ডেক্‌চিতে ঘি ঢালবার সময় বাটি বসিয়ে ঘি চুরি করেছে, তার হাসবার সময় কোথায়? সে এখন বড়ো বেশি স্পষ্ট, তার চারপাশে নেই আর সেই অনভিজ্ঞতার ভীরুতা, সে এখন অনেক বেশি জেনে ফেলেছে, নেই আর সেই দুর্বল, দোলায়মান ঔৎসুক্য। এক বোতল কেরোসিন তেলে ক'টা উনুন ধরানো যায় বাজি ধরে' সে তা বলে' দিতে পারে, কোন চা'লে কতোখানি আয় দেয় তা তার মুখস্থ। সমস্ত সংসার সে ছকে' রেখেছে তার নখের উপর। ভাবলে সৌম্য সত্যি অবাক হ'য়ে যায়। সামান্য একটা চায়ের কাপ পর্যন্ত সে আর ভাঙে না, তার আঙুলগুলি আজকাল এতো নিখুঁত চালাক হ'য়ে উঠেছে। জিনিসের উপর তার এতো অসহ্য মায়া, ভাত চেয়ে সে-ভাত পাতে ফেলে রাখলে সৌম্যর আর রক্ষে নেই। এতোটুকু অপব্যয় সে ক্ষমা করবে না, একটা ব্লেড্‌এ মাত্র একবার দাড়ি কামানোটা তার চোখে বর্বর বিলাসিতা। যে-ঘরে সম্প্রতি লোক নেই সে ঘরের আলোটা তার চক্ষুশূল। খবরের কাগজগুলো পর্যন্ত সে বেচবে। সৌম্যর মাঝে-মাঝে হাসি পায়, কিন্তু সম্ভোগও করে শিপ্রার এই আত্মীয়তার অত্যাচার, তার এই আধিপত্যের ঐশ্বর্য। সব-কিছু যেন তার, সব-কিছু মিলে সে যেন নিজে, সে যেন খুঁজে পেয়েছে নিজেকে। ঘরের মেঝে যেন তার পায়ের ভারে কাঁপছে, দেয়ালগুলো তার মুখের দিকে চেয়ে অপরাধী শিশুর মতো পাংশু। সবাই ভয়ে-ভয়ে তার পথ থেকে সরে' দাঁড়ায়, দেয়াল আর মেঝে, তার মুখের দিকে কাঙাল চোখে চেয়ে থাকে

হাওয়া আর রোদ, সেই সব না-ঘুমোবার রাত্রি। সে তার সেই প্রথম, ক্ষণিক চিরন্তনতা থেকে নেমে এসেছে প্রত্যহের প্রয়োজনে।

তার শরীরের উপর দিয়ে গড়িয়ে গেছে দু'টি উষ্ণ, উর্বর বৎসর, এখন, ভাবতে সৌম্যর ভারি মায়া করে, তাকে কেমন ক্লান্ত, একটু-বা ব্যথিত দেখাচ্ছে। তার মাঝে নেই আর সেই অজানার রোমাঞ্চ, সেই আদিম, আরণ্য বিভীষিকা। লজ্জার সেই ঐশ্বর্য নেই, নেই সেই জড়িমার মধুরতা: এখন সে সংজ্ঞায় স্থির, সীমায় আবদ্ধ, স্পষ্টতায় উদ্ঘাটিত। তাকে অতিক্রম করে' নেই যেন আর সেই অশরীরী সুর। চাঁদের মতো সৌন্দর্যে জমে'-জমে' সে যেন পাথর, ঠাণ্ডা হ'য়ে যাচ্ছে। সেই সুরটি বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে সৌম্য কতো আয়োজন করে, তেমন করে' আর যেন তা বাজতে চায় না। আছে অনেক কথা, অনেক নিঃশব্দতা, তবু সে-সুরটি যেন কখন কোন ফাঁকে হারিয়ে গেলো। সেই ক্ষণিক চিরন্তনতা যেন প্রত্যহের আঘাতে গেলো ক্ষয় হ'য়ে।

সৌম্য বল্লে: চলো, ছাদে গিয়ে বসি। এখন অন্ধকার, আমরা বসে' থাকতে-থাকতে অনেকক্ষণ পরে কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ উঠবে দেখো। সেই হল্‌দে চাঁদ।

মৃত একটা ভারের মতো অনড় অবসাদ যেন শিপ্রার সর্বাঙ্গে নেমে এসেছে। ঠাট্টায় ঠোঁট দু'টো একটু ফুলিয়ে শিপ্রা বল্লে,—বাবাঃ, আমার যা ঘুম পাচ্ছে এখন।

শিপ্রা সত্যি-সত্যি মশারি ফেলতে লাগলো।

—বাঃ, আমি এখন তবে কী করি?

—ঘুম না পেয়ে থাকে, একটু বই-টই পড়ো না। আমার তো ঘুমোবার ঐ চমৎকার ওষুধ। মশারির ভিতর থেকে শিপ্রা স্বচ্ছ গলায় হেসে উঠলো: আজকাল তো পড়াশুনো একেবারে গোল্লায় দিয়েছ!

পাশ করবার না থাকলে লোকে কি আর কিছু পড়ে না? কিন্তু যাই পড়ো বাপু, এই ঘরে।

অগত্যা সৌম্য বইই একটা নিয়ে বসলো। আবার কতোদিনে হৃদে চাঁদ উঠবে কে জানে।

পর দিন রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর আবার সৌম্য বই নিয়ে বসেছে। হাসতে-হাসতে শিপ্রা হঠাৎ কাছে এসে হাজির। বল্‌লে,—তোমার পাশে একটু বসতে দেবে?

—বোসো না, কতোই তো চেয়ার।

—বাবাঃ, কী রাগ! শিপ্রা একটা চেয়ার টেনে সৌম্যর কাছে ঘন হ'য়ে বসলো: একটু পড়তে বলেছিলুম বলে' কী প্রতিশোধটাই কাল নিলে। আমাকে একফোঁটা ঘুমুতে দিলে না।

—তুমিই তো বারণ করলে ও-ঘরে যেতে।

—না, বারণ করবে না! একা-একা ভয়ে আমি মরি আর-কি।

—যাতে ভয় না পাও, তারি জন্যে তো আজো এই ঘরেই বই নিয়ে বসেছি।

—আহা, কী আদর! তাই তো কাল সারাক্ষণ আলোটা জ্বালিয়ে রাখলে মাথার ওপর।

—বাঃ, বললেই পারতে, আমি টেব্‌ল্‌-ল্যাম্প জ্বালিয়ে নিতুম।

—কী বুদ্ধি! তা হ'লেই যেন আমার ঘুম আসতো। সব কথা আমাকেই বলতে হ'বে। উনি নিজে কিছু বুঝবেন না বলে' প্রতিজ্ঞা করেছেন। শিপ্রা হঠাৎ তার বইর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো: রাখো।

—না, না, ছাড়ো, সৌম্য তাকে অল্প-অল্প বাধা দিতে লাগলো: একটা চমৎকার জায়গায় এসে পড়েছি।

বইটা ছেড়ে দিয়ে শিপ্রা অভিমানে মুখখানা মেঘলা করে' তুললো: তুমি বই নিয়ে বসে' থাকলে আমি কী করি?

—তুমিও একটা বই নিয়ে বোসো। সৌম্য অল্প করে' হাসলো: তোমার তো বই নিয়ে বসলেই ঘুম পায়। তোমার তো চমৎকার ওষুধই আছে।

—বাবাঃ, একটুখানি কাছে বসলে যদি এমনি করে' তাড়িয়ে দিতে হয়, শিপ্রা রাগ করে' উঠে পড়লো।

শিপ্রারই হ'লো জিত। আর এক পা-ও তাকে তাড়িয়ে দেয়া হ'লো না।

—না, না, এই বই রাখছি বন্ধ করে'। সৌম্য তাকে তার চেয়ারের কাছে টেনে আনলো: তোমার কাছে কিসের এই সব শুকনো পৃষ্ঠা। চলো, ছাদে যাবে? আজকের চাঁদ আরো হলদে হয়েছে।

—না, ছাদে নয়, তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে।

—তাই বলো। কতোদিন তোমার কথা শুনিনি। সৌম্য আলস্যে যেন আরো ঘন হ'য়ে এলো: তোমার রাত্রের কথা।

—শোনো, শিপ্রার বসবার ভঙ্গিটা ঋজুতায় ধারালো হ'য়ে উঠলো: গিরবালাকে তোমার তাড়াতেই হ'বে।

—ও! এই কথা? সৌম্য উঠলো হেসে: বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আর তুমি কথা খুঁজে পেলে না?

—না, গম্ভীর মুখ করে' শিপ্রা বললে: ঠাট্টা নয়। ও ভীষণ চুরি করছে, ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে ওর সাহস। আমার সেফ্‌টিপিন্‌টা ও-ই নিশ্চয় কুড়িয়ে পেয়েছিলো, আর দিলে না।

—আমি দেবো। সৌম্য আবার হেসে উঠলো: এই তো হ'লো একের নম্বর। আর?

—যাও, শিপ্রা আবার একটা ওঠবার ঢেউ তুললে: তুমি আমার কোনো কথায় গা পাতবে না, কে তোমার সঙ্গে কথা কইবে?

—না, না, নিশ্চয় তাড়াবো, সৌম্য সেই ঢেউটাকে আবার ভেঙে দিলে : তুমি দেখো কাল ভোরে ও আর নেই। তারপর ?

—আর এই যে মাসিক পত্রিকাগুলো রাখছ, শিপ্রার খোঁপাটা খসে' গিয়েছিলো, দু'হাত তুলে আনমিত ঘাড়ের উপর সেটা স্তূপীকৃত করতে-করতে কথাটা সে শেষ করলে : সেগুলি দপ্তরি ডাকিয়ে বাঁধিয়ে ফেলতে হ'বে।

সৌম্যর গলা যেন শুকিয়ে গেলো : সব ? ওগুলো বেচে ফেললে হয় না ?

—আহা, বেচবার জন্যেই যেন পয়সা দিয়ে রাখা হয়েছে।

—বেচলে তবু কিছুটা উঠে আসতো। একে এতো বেরিয়ে গেছে—তার আবার ?

—হ্যাঁ, আমি ওগুলো বাঁধিয়ে আলমারিতে সাজিয়ে রাখবো।

—জঞ্জালগুলোর জন্যে আবার একটা আলমারিও কিনতে হ'বে ? এ বেলা তোমার টাকা আর টাইট থাকছে না, না ?

—আহা, আমার বেলাই টাকার খোঁটা। কে চায় তোমার মাসিক-পত্র রাখতে ?

—কী মুস্কিল, কালই আমি আলমারির অর্ডার দিয়ে আসবো। তারপর ?

শিপ্রা এবার হঠাৎ গভীরতায় নেমে এলো। চোখের প্রান্ত দু'টি রহস্যে কালো করে' সে বললে,—মাকে চিঠি একটা লিখে দিয়েছি।

—লিখে দিয়েছ কী লিখে দিয়েছ ? সৌম্য যেন চমকে উঠলো।

—যে, তুমি আমাকে আর একটুও ভালোবাসো না, শিপ্রা হাসতে-হাসতে নিজের কোলের উপর নুয়ে এলো, মুখখানাকে নরম আলস্যে তেমনি কাৎ করে' রেখে বিহ্বল চোখে বললে : না গো, ভীষণ

ভালোবাসো। নইলে, শিপ্রা সোজা হ'য়ে বসলো তার চেয়ারে হেলান দিয়ে: নইলে কি একথায় আলমারি কিনতে ছোটো?

—এই কথা?

লিখে দিয়েছি, শিপ্রার গলা যেন শোনা গেলো অন্ধকারের স্তব্ধতা থেকে: শরীর আমার ভালো নেই, আমি তোমারি কাছে যাবো।

সৌম্য অন্যমনস্কের মতো বল্‌লে,—তার তো অনেক দেরি আছে।

তারপরে, আশ্চর্য, আর কোনো কথা নেই। দু'জনের মাঝে নেমে এলো রাত্রির নিঃশব্দ উষ্ণতা, স্পর্শহীনতার বৈদ্যুতিক ঔজ্জ্বল্য। আস্তে-আস্তে উঠে সৌম্য আলোটা নিবিয়ে ঘর অন্ধকার করে' দিলে। তারপর আবার আস্তে-আস্তে ফিরে এলো তার চেয়ারে।

পরদিন সকালে শোবার ঘরেই সৌম্য খবরের কাগজ বাজার দরের ওঠা পড়ার হিসেব নিচ্ছে, নিচে শুনতে পেলো একটা গোলমাল। শিপ্রার শাণানো গলায় ছিটকে পড়ছে আগুনের ফলকি। সমস্তটা সকালবেলা সৌম্যর চোখে কেমন বেসুরো, ম্রিয়মাণ হ'য়ে এলো।

—এই তুমি গিরবালীকে ছাড়িয়ে দিচ্ছ? শিপ্রা তার টেবিলের উপর ফেটে পড়লো।

তার চার পাশে নেই আর গতরাত্রির সেই নীরবতার স্নেহ। শরীরের প্রতিটি রেখা যেন জাগরণে রুক্ষ হ'য়ে এসেছে। বদ্‌লে ফেলেছে সেই রাতের শাড়িটা, ঘুম দিয়ে যা স্নিগ্ধ ছিলো, পরেছে তার আধ-ময়লা আটপৌরেখানা, গায়ে যার লেগে আছে অভ্যাসের গ্লানি। স্পষ্ট দিবালোকে তাকে যেন তাতে চেনা যায় না।

সৌম্য অসহিষ্ণু গলায় জিগ্‌গেস করলে: কেন, কী হয়েছে?

—এই দেখ না, বেগুনের সের ছ' পয়সা করে'—পাশের সারদাদি'দের বাড়িতে ছ' পয়সা করে আনছে—আর ও বলছে কিনা দশ পয়সা?

—সেই জন্যে এমন একটা লড়াই শুরু ক'রে দিয়েছ ?

না, করবে না ? জলজ্যান্ত এমন ডাকাতি, প্রতি সেরে চার পয়সা ক'রে চুরি। তুমি বলো কী ?

—চাকর-বাকররা এমনি ক'রেই থাকে। সৌম্যর গলা ক্লান্ত হয়ে এলো।

—ক'রেই থাকে ? আর তুমি তার একটা বিহিত করবে না ? শিপ্রা ঝাঁজিয়ে উঠলো : আমি দিয়েছি ওকে তাড়িয়ে। ওর মাইনেটা হিসেব ক'রে এবার ফেলে দাও।

—এতোটা বিহিত যখন করলে, তখন এটুকুও পারবে। দেরাজের চাবি তোমারই আঁচলে বাঁধা।

—হ্যাঁ, এলো আচলে শিপ্রা দেরাজ খুলতে গেলো। আমিই দিয়ে দিচ্ছি। আট টাকা ক'রে মাইনে হ'লে আঠারো দিনে কতো পাওনা হয় ?

সৌম্য মুখে হাসি চেপে রাখলো। কঠিন হ'য়ে বললে,—আমি তার কিছু জানি না।

—আহা, এটুকু যেন আমি বার করতে পারবো না। মুখ গম্ভীর ক'রে শিপ্রা মনে মনে কী খানিকক্ষণ হিসেব করলে : যাক, পুরো পাঁচ টাকা দিয়ে দিলেই চলবে।

—বলো কী, সৌম্য আঁৎকে উঠলো : এতোগুলি পয়সা বেশি দিয়ে দেবে ?

—তা, নিক গে। অসীম ঔদাস্যে শিপ্রার মুখ স্নিগ্ধ হ'য়ে এলো : এতোদিন চাকরি করছে, নিলোই না-হয় কিছু বেশি।

—বাজারেও তো ও এমনি কিছু বেশি নিচ্ছিলো। সৌম্য হাসবে, না গম্ভীর থাকবে কিছু ভেবে পেলো না।

—তবু রোজ-রোজ খুঁটে খুঁটে বেশি নেয়ার চাইতে ও অনেক

ভালো। মুখ দিয়ে আমার কথা যখন একবার বেরিয়ে গেছে, তখন আর কিছুতেই ফেরানো যাবে না। শিপ্রা আবার একটা ঝাম্‌টা দিয়ে উঠলো : বসে' আছো কী চুপ ক'রে? যাও, চাকর খুঁজে নিয়ে এসো আরেকটা।

খবরের কাগজের অতলতরো গহ্বরে ডুবে গিয়ে সৌম্য বিরক্ত গলায় ব'লে—তা আমার দ্বারা হ'বে না। তোমার খেয়াল মতো চাকর জোগাবার ব্যবসা আমি খুলে বসিনি।

শিপ্রা দরজার সামনে রাগে স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়ালো এক মুহূর্ত, তারপর তার জিভ উঠলো লকলক ক'রে : যা'চ্ছি আমার ঘরের তোলা পাট সামলাতে। আমি সব এখুনি ফেলে ছড়িয়ে ছত্রখান ক'রে দেবো। আমার কী! তোমাকে তো আর আপিস যেতে হ'বে না।

শিপ্রা ত্বরিত একটা বিদ্যুৎরেখার মতো নিচে গেলো মিলিয়ে।

আশ্চর্য, সিঁড়িতে আবার তার হাসির শব্দ শোনা যাচ্ছে। সে হাসি লাফাতে-লাফাতে একেবারে সৌম্যর সামনে এসে গড়িয়ে পড়লো। সৌম্য তো অবাক। শিপ্রার সেই ক্রোধান্বিত স্তব্ধতা যেন হঠাৎ হাসির বন্যায় খণ্ড খণ্ড হ'য়ে যাচ্ছে। শিপ্রা একটা চেয়ারে বসে' পড়ে' আরো খানিকক্ষণ হেসে নিলো, পরে এক ঝাঁকে একটু দম নিয়ে বল্লে,—যাক তোমাকে আর চাকর খুঁজতে যেতে হ'বে না।

—কেন, হ'লো কী?

—যা হ'বার। টাকাটা মুখের ওপর ছুঁড়ে দিতেই গিরিধারীর সে কী ভেউ-ভেউ কান্না। যদি একবার দেখতে। শিপ্রার শরীরে আবার একটা হাসির ঢেউ এলো, সেটাকে হাত দিয়ে চোখ-মুখের উপর থেকে সরিয়ে দিয়ে সে বল্লে,—বলে কি না আর কোনোদিন চুরি করবে না, আমার পা ছুঁয়ে বলে কি না এই বাড়ি ছেড়ে

গেলে এমন মা-জী আর সে কোথাও পাবে? ঠিক এবার সে ছ' পয়সায় বেগুন আনবে: এক সেরে তিনটে ওঠে এমন বড়ো বেগুন।

হাসির চাপে আরো অনেক কথা যেন সে পিষে ফেল্‌লে।

কিন্তু সৌম্যর মুখ এতোটুকু ভিজলো না। সে কঠিন হ'য়ে বল্‌লে,—তুমি বুঝি পাশের বাড়ির ঐ বৌর সঙ্গে বসে' মুলো-বেগুনের দর কষো? তোমাকে বলেছি না—

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে শিপ্রা বল্‌লে,—কেন, কী দোষ হয়েছে তাতে? ভদ্রমহিলা বাড়িতে এলে তাঁকে তাড়িয়ে দেবো নাকি?

—এ ছাড়া আর তোমাদের কোনো কথা নেই?

—উনি যদি সে কথা তোলেন, আমি কী করতে পারি? শিপ্রা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো: তাঁর সামনে তো আর তোমার খবরের কাগজটা পেতে দিতে পারি না? আর কী এমন মন্দ কথা জিগ্‌গেস করি? মুলো-বেগুন না হ'লে দিন-দিন এমন নধর হ'তে কী করে'?

—তুমিও বুঝি যাও ওদের বাড়ি?

—মাঝে-মাঝে যাই বই কি। একজন এতো এলে তার বাড়ি তুমি কী ক'রে না গিয়ে পারো শুনি। সমস্ত দুপুরবেলাটা একা-একা কাটাই কী নিয়ে?

—কেন, বই, এত রাজ্যের বই, বই পড়তে পারো না?

—বই, বই পড়ে' আমার কী হবে? তোমাকে দিয়েই তো আমার বই পড়া শেষ হ'য়ে গেছে। কী আছে বইয়ে? শিপ্রা হেসে উঠলো: মানুষে কী ওতে পায়? এর চেয়ে বেশি?

—বুঝলে তো পাবে। কিন্তু, সৌম্যের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠলো: আস্তে-আস্তে চেষ্টাও তো একটু করতে পারো।

—যা বলেছ, শিপ্রার এখন হাসবার মেজাজ এসেছে: বুঝতে

হ'বে বলে'ই আর পড়তে ইচ্ছে করে না। চেষ্টা করবার বয়স গেছে পেরিয়ে।

—বটে আর কি! তাই যাও মূলো-বেগুনের গল্প করতে। এদিকে আমি আজকাল আর তেমন বই নিয়ে বসি না বলে' তো কতো আফসোস করো শুনতে পাই।

—সত্যি বলছি, খুশিতে শিপ্রা ছলছল করে' উঠলো: বই নিয়ে বসলে তোমাকে ভারি সুন্দর দেখায়। তুমি যখন আলোয় বসে' পড়ো না, আমি অনেকক্ষণ তোমার মুখের দিকে লুকিয়ে চেয়ে থাকি। ঘুম কী করে' আসবে বলো?

—আর তোমাকে সুন্দর দেখায় বুঝি তোমার রান্নাঘরে, তোমার মূলো-বেগুনের হাটে?

দেখায় না? নিচে নেমে যাবার মুখে শিপ্রা আবার আরেক পশ্‌লা হাসলে: আমি যখন বসে' তরকারি কুটি, স্টোভ জেলে তোমার জলখাবার তৈরি করি, তখন আমার মুখের দিকে কোনোদিন চেয়ে থাকো নি? হয়েছে, আর চাইতে হ'বে না। এখন চান করতে চলো।

আজকাল একেই সৌম্যর আপিস থেকে ফিরতে দেরি হ'য়ে যায়, তায় জলখাবার খেয়ে একটু বিশ্রাম করতে না-করতেই আবার ছোটে আড্ডার সন্ধানে।

শিপ্রা হয়তো কোনো-কোনোদিন বলে: আবার এখুনি বেরুচ্ছ?

—হ্যা, দিনভোর এই খাটুনির পর এমন একটু অসাংসারিক কথায় নিজেকে না ভোলাতে পারলে মারা যাবো। তোমার মতো দুপুরে তো আর ঘুমাতে পারি না।

শিপ্রার মনে পড়ে আগে-আগে সৌম্য আপিস থেকে শ্রান্ত হ'য়ে এসে কোণের ঐ ইজিচেয়ারটার উপর ভেঙে পড়তো, এমন তার

উদ্‌বৃত্ত শক্তি থাকতো না যা অপচয় করবার জন্যে তার একটা জনতার দরকার হ'বে। তখন উষ্ণ এই গৃহকোণ, দেয়ালের উপর সন্ধ্যার ম্লানায়মান বিশ্রাম, মাঝে-মাঝে মনে-ভেসে-ওঠা গানের কথার মতো শিপ্রার ভাঙা-ভাঙা যাওয়া-আসা—সব নিয়ে সে কেমন যথেষ্ট ছিলো। এখন এই ঘর, এই ঘরের শান্তি তার কাছে যেন বড়ো পুরোনো, বড়ো সেকেলে হ'য়ে উঠেছে। তাই আজকাল সে এখান থেকে পালাবার জন্যেই যেন পা বাড়িয়ে আছে। শিপ্রার মনে হয়, এ-ই হয়তো স্বাভাবিক, এ-ই হয়তো অভ্যাসের ধর্ম, তবু বাইরে থেকে সহজ ব'লে স্বীকার করলেও মন যেন পুরো সায় দেয় না।

শিপ্রা প্রচ্ছন্ন ভর্ৎসনার স্বরে বলে: শিগ্‌গির-শিগ্‌গির ফিরো কিন্তু। খাবার নিয়ে আমি কতোক্ষণ বসে' থাকবো?

—খিদে পেলে তুমি তো আগেই খেয়ে নিতে পারো।

—থাক্, আর আদরে দরকার নেই। হাতের কব্জিতে ঘড়ি তো একটা খুব ফ্যাসান করে' বেঁধে রেখেছ দেখছি, দয়া করে' মাঝে মাঝে নিজের চোখ দু'টোকেও একটু দেখিয়ো।

সৌম্য শিগ্‌গির-শিগ্‌গিরই ফেরে, রাত তখন প্রায় দশটার কাছাকাছি, এর আগে নাকি ভদ্রলোক বাড়ি ফিরতে পারে না। বিয়ে করেছে সে প্রায় দু'বছরের উপর—সামাজিক ভদ্রতাটা অন্তত বাঁচিয়ে চলতে হ'বে তো। অথচ শিপ্রাই আগে-আগে সৌম্যর সেই অবাধ্য, অবিচ্ছিন্ন আসক্তিকে শাসন করেছে: কি কেবল কুনোর মতো অন্ধকারে বসে' থাকো, একটু বেড়িয়ে আসতে পারো না? লোকে বলে কী? হায়, এখনো নাকি লোকে বলাবলি করে, তাই সৌম্যকে ভালো করে'ই বেড়িয়ে ফিরতে হয়। সৌম্য ঘরের সঙ্গে তার সময়ের সম্পর্কটা অনেক ভদ্র, অনেক সংক্ষিপ্ত করে' এনেছে। শিপ্রা যেন তার এই ভদ্রতারই একটা নমুনা। তার হাতের একটা বই,

যে-বইর গল্পটা সে আগে জেনে নিয়ে পরে পড়ছে, পড়তে-পড়তে গল্পটা জানছে না।

আশ্চর্য, ঘড়ির ছোট্ট কাঁটাটা দশের ঘর-ও পেরোতে চললো।

সৌম্য ঘরে ঢুকে দেখলো শিপ্রা প্রতীক্ষায় জ্বলতে-জ্বলতে এতোক্ষণে বিছানায় নিবে গেছে। সারা মুখে চুল এলোমেলো করে' দিয়ে সে তার ঘুম ভাঙালো: বড্ড দেরি হ'য়ে গেলো। গিয়েছিলুম সেই বরানগর।

শিপ্রা এক গা চমকিত ঘুম নিয়ে উঠে বসলো: আমাকে তো একদিন নিয়ে যেতে পারো না।

—আমার সেখানে নেমন্তন্ন ছিলো যে। না, না, খাওয়ার নয়, গান শোনার। গীতি সোম-এর নাম শুনেছ? তার গান। কতোদিন পর ভালো গান শুনলুম। চলো, চলো, খেতে দেবে চলো, তার হাত ধরে' সৌম্য টানাটানি করতে লাগলো: ভীষণ খিদে পেয়েছে। এতো পরিশ্রম করে' গেলুম, অথচ ভদ্রলোকরা এক পেয়ালা চা ছোঁয়ালো না।

হাত ছাড়িয়ে নিয়ে শিপ্রা নিজেই নেমে পড়লো। ঈষৎ অভিমানের সুরে বললে—সারা রাত তবে গান শুনে কাটিয়ে দিলেই পারতে। এ লোকের আবার খিদে পায় নাকি?

—একেবারে ভ-য়ে দীর্ঘ ঈ, মূর্ধণ্য ষ, মূর্ধণ্য ণ। সৌম্য হেসে উঠলো।

—ছাই। শিপ্রা মুখ ফিরিয়ে নিলো: যে লোক গান জানে না তার আবার কিছু দাম আছে নাকি? তবে মিছিমিছি এসেছ কেন ফিরে?

—যে-লোক গান জানে না তার ডাক যে গানের চেয়েও মর্মভেদী। সৌম্যর মেজাজ এখন গানেরই মতো হাল্কা: গান জানো না, কিন্তু কে পারে তোমার মতো খাবার সাজিয়ে রাখতে, ঘর গুছিয়ে রাখতে, রাখতে পেতে এই বিছানা—হায়, বলো কিনা, ফিরে কেন এসেছি!

—তবে একদিন আমাকে কেন বেড়িয়ে আনতে পারো না? শিপ্রা মুখ ফেরালো, তার চোখে জল দাঁড়িয়ে গেছে: বাবা কখন ঘুমিয়ে পড়েছেন, চাকর-ঠাকুর কেউ নেই, সমস্ত বাড়িটা কেমন ভূতে-পাওয়া বাড়ির মতো থম্‌থম্‌ করছে, আমার একা-একা কী ভীষণ ভয় করে।

—সত্যি, আজ বড্ড দেরি হয়ে গেছে। সৌম্য কী বলবে কিছু ভেবে পায় না।

—মনে হয় সমস্ত বাড়িটা যেন আমার বুকের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে, চাপা পাথুরে হাওয়ায় নিশ্বাস নিতে পাচ্ছি না। তুমি আমার কথা একটুও ভাবো না। শিপ্রার দাঁড়ানো জল চোখের পাতা বেয়ে গালের উপর নেমে এলো: একেক সময় ভয়ানক একা মনে হয়। মা'র জন্যে ভারি মন কেমন করে। ক'দিন আগেই তো আমাকে পাঠিয়ে দিলে পারো।

—সত্যি, এতো দেরি করা আমার কিছুতেই উচিত হচ্ছে না। এখন চলো, সৌম্য তাকে আবার আকর্ষণ করলো: আর ক'টা দিন, তার পরে যাবেই তো মা'র কাছে। আর একা তোমাকে কে রাখে?

সিঁড়ি দিয়ে নামতে-নামতে দেয়ালের একটা ফোকরে সৌম্য সুন্দর খানিকটা অন্ধকার দেখতে পেলো, সেই ছোট্ট ফাঁকটুকু দিয়ে কোথাকার সমুদ্রের একটুখানি হাওয়া ছুঁয়ে গেলো তার মুখ—এই দেয়ালটুকুর বাইরে কী আতঙ্কিত নির্জনতা তার জন্যে প্রতীক্ষমাণ, শান্ত একটা পশুর মতো ওৎ পেতে আছে।

ছয়

আরো দুটো মাস কাটলো। শিপ্রার বাপের বাড়ি যাবার দিন ঘনিয়ে আসছে।

এর মধ্যে একদিন, সৌম্য আপিস থেকে ফিরেছে, শিপ্রা সরাসরি হঠাৎ তার মুখের উপর বলে' বসলো: আজ এক্ষুনি যেন আড্ডা দিতে ছুটো না।

ঘরে পা দিতে-না-দিতেই এই সম্বর্ধনা। কথার ধাক্কায় সৌম্য যেন টলে' পড়লো, থতিয়ে বললে,—কেন, কী হয়েছে?

—তোমাকে একবার শেয়ালদা যেতে হ'বে।

শেয়ালদা? সেখানে কী?

—স্টেশান্ গো স্টেশান্। শিপ্রা দুই হাতে ঘর-দোর গুছিয়ে যেন সারতে পারছে না: চিটাগং-মেইল অ্যাটেণ্ড করতে হ'বে।

—কেন, কে আসছেন? সৌম্য এতোক্ষণে যেন কোটের বোতাম দুটো খুলতে পারলো।

কথাটা যেন গুলির মতো সৌম্যর কান ঘেঁষে বেরিয়ে গেলো: বনানী-দি আসছেন।

—কে আসছেন?

—বনানী-দি। শিপ্রা ঘরময় ছোট-ছোট লঘুতায় ছুটোছুটি করে' বেড়াতে লাগলো: ঘর-দোরের কী যে চেহারা হ'য়ে আছে! উনি এসে এমনি অবস্থায় দেখলে কী যে ভাববেন আমাদের, তার ঠিক নেই। ধোপাটার আবার এ ক'দিন দেখা নেই, জমে' আছে ময়লা কাপড়ের একটা পাহাড়। সব এর মধ্যে গুছিয়ে ফেলতে পারি তবে হয়। কখন ট্রেন আসে? আর দেখ, শিপ্রা এতোক্ষণে যেন একটা নিশ্বাস ফেললো:

সিঁড়ির পাশে ঐ ছোট ঘরটা ওকে দিলুম, বেশ নিরিবিলি দক্ষিণ-খোলা ঘর, একজনের পক্ষে যথেষ্ট, কী বলো? বাবাও তাই বললেন। সমস্তটা দিন জিনিস-পত্রের টানা-হেঁচড়া করতে কী মেহনৎটাই না আমার হয়েছে। তোমার ছোট সেক্রেটারিএট্ টেব্‌লটা কিন্তু ওঁর ঘরে সরিয়েছি টেব্‌ল-ল্যাম্পটাও, কে জানে যদি রাত্রে লেখাপড়া করতে বসেন, বলা যায় না তো। আর আমাদের আছে যখন জিনিসটা—শিপ্রা চোখের কোণে চকিত একটু হাসলো।

ততোক্ষণে অসহায় হ'য়ে সৌম্য একটা চেয়ারের মধ্যে ভেঙে পড়েছে। মুখে অনুনয়ের কাতরতা এনে সে বল্‌লে,—তার আগে যদি বলো তোমার বনানী-দিটি কি?

—বা, বনানী-দিকে চেনো না? শিপ্রা ফোঁস করে' উঠলো: আমাদের বিয়ের সময় দেখেছ তো তাকে।

—তখন তো কতো জনকেই দেখেছি। সব মেয়ে তো তখন তোমার মাঝেই ডুবে ছিলো।

—বনানী-দি, কী বলবো, ভীষণ ভালো মেয়ে। শিপ্রা যেন সমস্ত শরীরে আপ্লুত হ'য়ে উঠলো: তাঁকে কী বলে' তোমাকে বোঝাবো? অসম্ভব। শিপ্রা আবার তার গৃহকর্মে মন দিলে: এলেই দেখতে পাবে।

—থাক্, অসম্ভবকে আর তোমার বর্ণনা করতে হ'বে না। আমার কথাগুলোর শুধু উত্তর দিয়ে যাও। সৌম্য নিজেকে খুব খানিকটা গুরুতরো মনে করে' আরাম বোধ করলে: তিনি তোমার কে হ'ন? তোমার চেয়ে বয়েসে বড়ো?

দু'টি আঙুল তুলে শিপ্রা বল্‌লে,—পুরো দু'টি বছর। বনানী-দি যে-বার ম্যাট্রিক দেয়, আমার তখন ক্লাস নাইন। আমার তো পড়াশুনো আর হ'লো না, বিয়ের জন্যে বাড়িতে বসে' ফুলতে লাগলুম,

বিয়েটা হ'লোও কোনো-রকম,ড বনানী-দি গগড়িয়ে দিব্যি বি-এটা পাশ ক'রে' ফেললে।

সৌম্য তাকে বাধা দিলো : আমার প্রথম প্রশ্নটা ?

—আমার কে হ'ন ? খুঁজলে সম্পর্ক একটা বা'র করতে পারো, আমার মা'র কি-রকম মামাতো না মাসতুতো বোনের মেয়ে। সে-সম্পর্ক আমরা ধরি না। ইস্কুলে তিনি আমার বনানী-দি হ'বার পরে তবে এই সম্পর্কটা বেরিয়েছে।

—তা, তিনি এখানে কেন আসছেন ?

—বা, সুভদ্রা-বালিকা-বিদ্যালয়ে তিনি চাকরি পেয়েছেন যে। ও হরি। শিপ্রা খুশিতে ছটফট করে' উঠলো : তুমি তাঁর চিঠিটা এখনো দেখ নি যে। তাই। আমার সে-কথা মনেই ছিলো না।

—থাক, পরে দেখা যাবে। পোশাকের ভারমুক্ত হ'য়ে সৌম্য চেয়ারে আবার গা ঢেলে দিলে : বুঝলুম। তার কলকাতায় আসা হচ্ছে। কিন্তু এই গরিবের বাড়িতে কেন ?

—কারণ, কলকাতায় আমিই তার নিকটতমো আত্মীয়। শিপ্রা গর্বে আবার একটা ঝিলিক দিলে : এ-বাড়ি গরিব হ'তো, যদি আমি না থাকতুম। তা তোমার ভয় নেই, এখানে তিনি বেশি দিন থাকছেন না, ছোট দেখে একখানা বাড়ি খুঁজে দিলেই সেখানে তিনি উঠে যাবেন।

—তা আমি কাল ভোরেই যা হোক করে' খুঁজে বা'র করে' দেবো। সৌম্য হেসে উঠলো : তিনি একাই আসছেন নাকি ?

হ্যাঁ, সম্প্রতি তো একাই।

—আর বাড়ি খুঁজে দিলে বুঝি তাঁর সঙ্গী-মশাইটি এসে চড়াও হ'বেন ? নিজেদের জন্যে সামান্য একখানা বাড়ি খুঁজে নেবার পর্যন্ত তাঁর সামর্থ্য নেই। দেখলে, সৌম্য তাকে চোখের একটা চিমটি কাটলে : স্ত্রী রোজগার করতে পারলে, দেখলে, পুরুষের কতো সুবিধে।

—তুমি বলছ কী এ-সব? শাড়ির ভাঁজে-ভাঁজে শিপ্রা হাসিতে উথ্‌লে উঠলো: বনানী-দি বিয়ে করলেন কবে?

—বিয়ে করেন নি? তবু ভালো, দূরে হঠাৎ ছায়া দেখলে মাথা ঘোমটা দিয়ে পালাবেন না। সৌম্য গলা নামিয়ে আলগোছে জিগ্‌গেস করলে: তা হ'লে বলো, 'সম্প্রতি একা'-কথাটার মানে কী? পেছনে কে আসছেন?

—কে আবার। তাঁর ঠাকুমা। থুনথুনে আশি-বচ্ছরের এক বুড়ি সংসারে বনানী-দির ঐ একমাত্র বন্ধন।

সৌম্য ভীষণ নিরাশ হ'য়ে গেলো। বল্‌লে,—তিনি পরে আসছেন কেন?

—এখন এই নতুন জায়গায়, বাড়ি-টাড়ি ঠিক হয় নি, কী করে আসেন বলো? কী ভারিক্কি চালেই শিপ্রা কথা কইছে: এখানে এ-বাড়িতে নিরিমিষ্যি পাট নেই, পরেই আসবেন—তুমি চিঠিটা ছাই পড়েই দেখ না একবার।

—আরেকটা প্রশ্ন আছে। সৌম্য ভয়ে-ভয়ে জিগগেস করলে: তোমার বনানী-দির এখনও বিয়ে হয়নি কেন?

—বিয়ে হয় নি মানে? শিপ্রা একেক সময় এমন আচম্‌কা কথা ক'য়ে ওঠে যে সৌম্যর দস্তুরমতো মাথা ঘুরে যায়: বিয়ে উনি করেন নি।

ভঙ্গির কাঠিন্যটা আল্‌গা ক'রে দিয়ে সৌম্য হেসে বল্‌লে,—তাই তো জানতে চাই, কেন করেন নি?

—উনি বিয়ে কোনোদিন করবেনো না। কথাটা বলতে গিয়ে শিপ্রারো শরীরে একটা তেজস্বী দৃপ্তি এলো: তার চেয়ে আরো অনেক বড়ো কাজ আছে মানুষের। অন্তত কোনো-কোনো মানুষের। হঠাৎ শিপ্রা কি-একটা খুশিতে নিচু হ'য়ে সৌম্যের গলা জড়িয়ে ধরলে:

জানো না বুঝি একটা মজার কথা? হাসিতে শিপ্রা ছিঁড়ে-ছিঁড়ে পড়ছে: সে-কথাটাই তোমাকে জানানো হয় নি। কিছুই আমার মনে থাকেনা দেখছি।

সৌম্য শূন্য চোখে চেয়ে রইলো: কী?

শিপ্রার আবার সেই পরিচ্ছন্ন হাসি: তার সঙ্গে তোমার বিয়ের একটা কথা উঠেছিলো যে।

—বলো কী? তারপর?

—বাবা তাঁকে পছন্দ করলেন না।

—তবে এই যে বললে বিয়ে তিনি কোনোকালে করবেন না, সৌম্য কথাটা একটু চিবিয়ে-চিবিয়ে বললে: অথচ বাবার সামনে তিনি রূপের পরীক্ষা দিতে দাড়িয়েছিলেন?

—কক্‌খনো না। শিপ্রা যেন নিজেই একটা অপমান বোধ করলে, এমনি আহত তেজে দূরে ছিট্‌কে দাঁড়ালো: বনানী-দিকে তুমি সে-জাতের মেয়ে পাওনি। বাবাই তাকে দেখবার জন্যে অস্থির—মেয়ে তো আর তিনি কম দেখেন নি। বনানী-দিকে তো কিছুতেই রাজি করানো গেলো না, পরে, বাবা এমনি আলাপ করতে চান বলায় বনানী-দি এলেন তার পরনের ময়লা শাড়িটি পর্যন্ত না বদ্‌লে। ইস্‌, শিপ্রার ঠোঁটে শাণিত একটা ঠাট্টা খেলে গেলো: তাঁকে একবার বলা হোক্‌ না, অমুকে তোমাকে দেখতে এসেছে, অমনি উনি সাপের মতো ছুবলে উঠবেন, বলবেন, আমি যাবো ছেলে দেখতে। তিনি কিনা দাড়াবেন শো-কেস্‌এর বিজ্ঞাপন হ'য়ে! বলে' দেখ না একবার।

সৌম্য হেসে বল্‌লে,—তুমি এতো কথা জানলে কী করে'?

—বাঃ, আমাদের পাড়ায় থাকতেন, আর আমরা জানবো না? বাবা তো সে-যাত্রা আর চাটগাঁয়ে কম মেয়ে দেখেন নি।

—থাক্, পছন্দ যে করেন নি বেঁচে গেছি।

শিপ্রার চোখ দু'টি ঠাণ্ডা, একটু-বা ধোঁয়াটে হয়ে এলো: না, তুমি জানো না, বনানী দি ভারি ভালো মেয়ে। রং একটু ময়লা হ'লেই কি আর সুন্দর হওয়া যায় না? সত্যি, বাবা তাঁর ওপর ভারি অবিচার করেছেন।

হাসির ধাক্কায় সৌম্য উঠে পড়লো চেয়ার ছেড়ে: তা নিয়ে তুমি কিনা এখন আফসোস করছ! উদারতার কী মহান উদাহরণ!

এতোক্ষণে যেন শিপ্রা চোখে ফর্সা দেখলে। সৌম্যর হাসির শুভ্রতায় তার মুখের ব্যথিত আভাটুকু এক ফুঁয়ে নিবে গেলো। অনর্গল হাসিতে সে সৌম্যর দুই হাতের উপর গলে' পড়লো, লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যেতে-যেতে বল্‌লে,—আমি কী বোকা, সত্যি কী ভয়ঙ্কর বোকা!

তাকে তার পায়ের উপর তুলে দিতে-দিতে সৌম্য বল্‌লে,—তাই হলো। বাবার পছন্দটা শেষ পর্যন্ত ভালোই।

—যাও, কী সব বাজে কথা কইছিনুম এতোক্ষণ। শিপ্রা আবার তার গর্বিত আতিথেয়তায় বিস্ফারিত হ'লো: তাড়াতাড়ি তৈরি হ'য়ে নাও, একবার স্টেশনে যেতে হ'বে তো?

বাথরুমের দিকে যেতে-যেতে সৌম্য ঈষৎ বিরক্ত গলায় বল্‌লে,—কেন, সে-কথাও চিঠিতে লিখেছেন নাকি?

—না, তা অবিশ্যি লেখেন নি। তবু আমাদের বাড়িতে আসছেন, আমাদের তো একটা কর্তব্য আছে

—কিন্তু আজ সন্ধ্যেয় আমার একটা জরুরী কাজ ছিলো।

—যাও, আমাকে আর বকিয়ো না। কাজের মধ্যে তো আড্ডায় গিয়ে আধুনিক সাহিত্যিকদের মুণ্ডপাত করা। একদিন না হয় আমারই একটা কথা শুনলে।

সৌম্যকে শিপ্রা যখন ঠেলতে-ঠেলতে স্টেশনের দিকে পাঠিয়ে দিলে তখন সাতটা প্রায় বাজে। শিপ্রার আজ নতুন রকমের স্ফূর্তি, শত চুপ করে' থেকেও তা সে কিছুতেই চেপে রাখতে পারছে না। বনানী-দিকে সে চিরকাল ভয়ঙ্কর সম্মান করে' এসেছে, তিনি তার মুঠোর মধ্যে থেকেও নাগালের বাইরে, তার কাছে তাঁর সমস্তটা অস্তিত্ব তারার দূর ধূসরতা দিয়ে তৈরি ছিলো, তার ভালোবাসার মধ্যে বিস্মিত ভয়ের ভাবটাই ছিলো বেশি—সেই বনানী-দি আজ আসছেন, অথচ শিপ্রা তার ধারে পাশে কোথাও একটু কুণ্ঠা, একটু লঘুতরতা, একটুখানি কৃতার্থ হ'য়ে থাকবার দুর্বলতা অনুভব করছে না। বরং, সত্য কথা বলতে গেলে, কারো আজ সম্পৎশালিতা কিছু কম নয়: এই তার সংসারের উপর প্রবল প্রভুত্ব, এই তার গর্বিত আত্মসর্বস্বতা। দেখতে গেলে এক হিসেবে বনানী-দির চাইতে তার আজ বেশি মর্যাদা, বেশি প্রতিপত্তি। তার আজ আর আপ্যায়িত হ'বার নমনীয় ভঙ্গি নয়, বরং সে তার ঐশ্বর্যে যেন একটু বিচ্ছিন্ন, সমারূঢ়। সে যে কতো সুখী, কতো পূর্ণ, কতো স্বপ্রধান, এই কথাটা সবিস্তারে বনানী-দিকে জানানো যাবে ব'লে শিপ্রা সারা শরীরে ঝঙ্কার দিয়ে উঠছে। এতো বড়ো সংসারের সে যে একচ্ছত্র কর্ত্রী, তার মুখের কথায় যে ঘরের দেয়ালগুলো পর্যন্ত টলমল করে' ওঠে, ইচ্ছে করলেই সে যে হাত খুলে অনেক টাকা খরচ করে' ফেলতে পারে, এবং ইচ্ছে করলেই পারে হাতের মুঠোটা লোহার মত আঁট, শক্ত করে' তুলতে—তার একটা প্রচ্ছন্ন আভাস দিতে পারবে ভেবে মনে-মনে সে বিভোর হ'য়ে উঠলো। তাই, বনানী-দির ঘর সে ভারাক্রান্ত করে' তুলেছে বিলাসের রমণীয়তায়, জমিয়ে রেখেছে উপকরণের পাহাড়। অতিথির আরামের কথা সে ততো ভাবছে না, যতো তার নিজের অহঙ্কারের। অতিথির সম্বর্ধনার চাইতে নিজের সমৃদ্ধিটাই তার বড়ো জিনিস।

সৌম্য ফিরে এলো, নিঃসঙ্গ। নিচেটা খালি, রান্নাঘরে আলো জ্বলছে। ভারি পায়ে সিঁড়ি ভাঙতে-ভাঙতে সে ক্লান্ত, বিতৃষ্ণ গলায় বলতে লাগলো : কে কোত্থেকে এক উড়ো চিঠি দিয়েছে, ছোটো অমনি ইস্টিশানে। নাকাল আর কা'কে বলে। বাবা:, এ কী রসিকতা! পয়লা এপ্রিলের তো এখনো অনেক দেরি, সেই আসছে বছর।

আদ্ধেক উঠে সিঁড়িতে বাঁক নিতেই শিপ্রার তরল এক ঝলক হাসির শব্দ তার কানে এলো। সৌম্য বিপদের একটা গন্ধ শুঁকলে। নিঃশব্দে পার হ'য়ে গেলো আরো দু'টো ধাপ। যা আঁচ করেছিলো— সৌম্য যেন বসে' পড়লো মাটির উপর। দরজাটা খোলা—বনানী-দির ঘরের দরজা। ঘরে কেবল শিপ্রা উপস্থিত নয়, আরেকটি মেয়ে মেঝের উপর নিচু হ'য়ে বসে' এলোমেলো আঁচলে তার স্যুটকেশ ঘেঁটে স্নানের কাপড় খুলছে। সৌম্যর নির্বাপিত মুখের উপর ছিটিয়ে পড়লো শিপ্রার আরেক ঝলক হাসির ঝাপ্টা।

—এ কী, উনি আমার আগেই বাড়ি পৌঁছে গেছেন দেখছি।

—হ্যাঁ, আপনি গিয়েছিলেন বুঝি স্টেশনে? বনানী বিস্ফুরিত একটা অন্ধকারের শিখার মতো দাঁড়িয়ে পড়লো। দুই অঞ্জলি মুদ্রিত একটি পদ্মের মতো জোড় করে' স্মিতমুখে বললে : নমস্কার। আপনি যে স্টেশনে যাবেন তা ভাবিনি, তাই নেমে পড়েই একটা ট্যাক্সি নিয়ে সোজা চলে' এসেছি।

সৌম্য অপ্রস্তুতের মতো [illegible] দিয়ে বললে,—আমার খবিরি পৌঁছুতে মিনিট খানেক দেরি হ'য়ে গিয়েছিলো। তখনো লোকজন নামছে। ভেবেছিলুম আপনি একটু দাঁড়াবেন হয়তো।

—কী করে' জানবো বলুন। বনানী ম্লান একটু হাসলে।

—তাতে কী হয়েছে? শিপ্রা স্বামীকে প্রচ্ছন্ন একটু খোঁচা দিলে : কারু সাহায্য না নিয়ে একাই চলে' আসতে পেরেছেন। মিছিমিছি

তুমি ব্যস্ত হচ্ছিলে, মেয়েদের অবলা ভাবতে পারলেই তো তোমরা খুশি হও। তারপর স্নিগ্ধ একটু হেসে: বনানী-দিকে তুমি মনে করতে পারছো না? আমাদের বিয়ের সময় তো উনি এসেছিলেন।

ভয়ে-ভয়ে সৌম্য বনানীর দিকে, বিশেষ করে' বনানীরই দিকে তাকালো। কিন্তু মনে হ'লো না এর আগে কোথাও সে তাকে দেখেছে। এই যেন দেখলো প্রথম, রাত্রে, রাতের অন্ধকারে অপরিচয়ের অসীমায়। দেখলো, তখন উঠে দাঁড়াতেই দেখলে, বয়স তার বুড়ি-একুশের বেশি হ'বে না, পরনের শাড়িটা ট্রেনের ধুলায় ময়লা, অগোছালো, স্নান করতে যাবার আগে মাথার উপর চুলগুলি ভেঙে ফেলা হয়েছে—এর বেশি আর কিছু তার দেখবার ছিলো না। আর সমস্ত কিছু তার অজ্ঞেয়, তার চার-পাশে, তার সন্নিহিততায়। সে যেন নির্মম একটা অস্পষ্টতা দিয়ে তৈরি, ভয়নীয় অস্পষ্টতা। জানলা দিয়ে [illegible] একটা গাছ দেখা গেলো, অন্ধকারে নিস্পন্দমান ঋজুতায় মুগ্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে. বনানী যেন সেই গাছের মতো রহস্যময় [illegible] তার এই স্তব্ধ শরীর ও তাকে বহন করবার যে মহিমা, [illegible] উপর [illegible] উদ্ধত [illegible] তাকে মনে করিয়ে দিলো—কী যে মনে [illegible]—যেন কোনো প্রাগৈতিহাসিক [illegible] তার [illegible] করছে, দ্রুত, তীব্র, গম্ভীর। কেন যে তা [illegible] মনে [illegible] কঠিন, কিন্তু তার এই স্থূল, বন্য নির্লিপ্ততা [illegible] স্পষ্ট স্পর্শ [illegible] গাছ দেখেছে [illegible]।

গাছ কোথায় [illegible] আত্মা [illegible]? নিজেকে [illegible] জিগগেস করলে সৌম্য। [illegible] অনধারিতের মতো, অনিচ্ছেদের মতো। [illegible] নিঃশব্দতা! কবিত্ব নয়, নিষ্করুণ উদ্ঘাটন। [illegible] প্রচেষ্ট সারল্য, অকপট অনাবৃতি। মাটির নিচে যে জল আর সেই জলের

নিচে যে মাটি সেখান থেকে উঠে এসেছে। উঠে এসেছে কোন দূর মূল থেকে, সৃষ্টির আদিপ্রান্ত থেকে। অস্পষ্ট হয়েও অভিব্যক্ত, রহস্যময় হয়েও অছায়াচ্ছন্ন। মৃত্যুর মতো। অবশ্যম্ভাবীর মতো। শুধু বললে— দুটি মাত্র কথা—আমি এসেছি। বসে'-বসে' অসার কথার জাল বোনেনা, দূর থেকে ডাক দেয়, নাম ধরে ডাক দেয়। বলে না, আমাকে দেখ, আমাকে চেন, আমাকে ধরো, বলে, কে জানে তুমি বে, তৈরি হয়ে নাও, চলো, আমার সময় নেই। ডাক এসেছে।

শিপ্রা বললে,—তোমাকে আর সাবান-টাবান নিয়ে যেতে হবে না, আমি বাথরুমে সব রেখে এসেছি সাজিয়ে। তেল, তোয়ালে, সাবান, বাথ্-গ্লাভ, স্পঞ্জ, সল্ট—সব তোমার জন্যে মজুত। কী বলো, গরম জল লাগবে নাকি? তা-ও তৈরি।

খোলা-চুলে বাথরুমের দিকে যেতে যেতে বনানী বললে,—আমি এখন এক-পুকুর ঠাণ্ডা জল পেলে বাঁচতুম। ইচ্ছে করছে হাত-পা ছুঁড়ে অনেকক্ষণ সাঁতার কাটি। গায়ে যা ধুলো জমেছে।

—বলো কি, এই রাত্রে?

—রাত্রেই তো চমৎকার। বনানী যেন নিঃশব্দে হেসে উঠলো।

সৌম্য ফিরে এলো তার বসবার ঘরে।

বনানীকে শিপ্রা তার প্রভুত্বের অপ্রতিহততা দিয়ে পিষে ধরেছে তার নির্বাধ বন্ধুতার বেষ্টনে। সৌম্য আজ অবান্তর, তার ঘরের জাজ্বল্যমান আলোটা যেন আজ আর জ্বলছে না।

বনানীর ক্ষণিক এই উপস্থিতি তাদের, তাদের স্বামী স্ত্রীর জীবনে এনে দিয়েছে নতুন একটা সুর। ভৈরবীর মতো উদাস, গাঢ়। তাদের অভ্যাসের পাণ্ডুরতায় এনে দিয়েছে অল্প একটু ঘন, উষ্ণ অন্ধকার। তাদের প্রাত্যহিকতার বর্ণহীন পারম্পর্যের মধ্যে নতুন একটি আরম্ভের গাম্ভীর্য। শিপ্রাকে আজ তার কতো সুন্দর লাগছে, চারপারের অনর্গল

বৃষ্টির মাঝে নাম-না-জানা, কোথাথেকে-ভেসে-আসা ছোট ফুলের দুর্বল একটি গন্ধের মতো। লাল সূর্যাস্তের পাশে সাদা, অস্পষ্ট একটুকরো চাঁদ।

সাত

শিপ্রা রান্নাঘরে বসে' একহাতে জলখাবার তৈরি করছিলো। শীতের বেলা হঠাৎ এক নিশ্বাসে চারদিক থেকে যেন উবে গেলো, মরা একটা ভাবের মতো খসে' পড়লো একটা অন্ধকার, অনড় অন্ধকার, তার গায়ের উপর নিশ্বাস ফেলে বেড়াতে লাগলো বিশীর্ণ, অথচ দেহবান কতোগুলি প্রেতচ্ছায়া। শিপ্রা হাত বাড়িয়ে তাড়াতাড়ি আলোটা জ্বেলে দিলো।

আজ আর সৌম্যর চা-এর কোনো তাড়া নেই। তার জানাই আছে যে সময় হলে শিপ্রাই প্লেট সাজিয়ে নিয়ে আসবে, শান্ত শ্রী। আজকাল খাবার তার [illegible] জন্যে মন পড়ে না। [illegible] সব তর্কের মাথায় জটিল ঘোরালো আড্ডা। ছাদের সে সময়ের ঠান্ডা, আস্তে-আস্তে-ঘন-হ'য়ে ওঠা, অলস, অসংখ্য অন্ধকারে কানায় কানায় ভরে' উঠেছে। অবশ [illegible] দিয়েছে তার সমস্ত [illegible]।

শিপ্রার যে হঠাৎ কী করে' উঠলো বলা কঠিন। [illegible] শাড়ির আঁচলটা গুটিয়ে নিয়ে [illegible] জলদি [illegible] উপরে উঠতে লাগলো। সিঁড়িটা অন্ধকার। পায়ে-পায়ে [illegible] শুধু বেড়েই যাচ্ছে। অন্ধকারের সেই কালো, কঠিন [illegible] কসবার ঘরের দরজার কাছে [illegible] না। অন্ধকার [illegible] কম হয়নি। তরঙ্গায়িত হয়ে উঠছে [illegible]। অন্ধকারকে অনুসরণ করে শিপ্রা একেবারে [illegible] চলে' এলো।

ছাদের দক্ষিণের দিকের [illegible] ওই কার্নিশের পাশে [illegible] নিচু, হেলানো চেয়ারে সৌম্য আর [illegible] থামুখি বসে' আছে। কী-জানি তারা এতোক্ষণ কী কথা কইছিলো, হঠাৎ শিপ্রার আবির্ভাবে তারা চুপ করে' গেছে, যেন মিশে গেছে অন্ধকারে। এই চমকে চুপ-করে'-

যাওয়ার ভঙ্গিটা ঘরের অন্ধকারে যেন দুলছে, ধারালো, দীর্ঘ একটা অন্ধকার। দানবিক, দৃঢ় দুই হাতে সেই অন্ধকার যেন হঠাৎ শিপ্রার মুখ চেপে ধরলো।

—কখন সন্ধ্যা হ'য়ে গেছে, চোখে কিছু দেখতে পাও না নাকি? হাতের কাছে বোর্ড পেয়ে শিপ্রা তাড়াতাড়ি সুইচ টেনে দিলো: ভূতের মতন বসে' আছো কী অন্ধকারে? চা খেতে হ'বে না।

—হ্যাঁ, হ'যে থাকলে নিয়ে এসো না। শরীর থেকে অন্ধকারটা ঝেড়ে ফেলে সৌম্য উঠে বসলো।

—হ'যে থাকলে নিয়ে এসো না! মৃদু অথচ ধারালো গলায় শিপ্রা একটা তিরস্কার করলে: সে-কথা আমাকে বলতে হয়। ডেকে বলতে হয়, আমাদের চা নিয়ে এসো।

শিপ্রা তক্ষুনি, তাড়াতাড়ি নেমে গেলো। [illegible] আলোটা তাকে তাড়া করেছে।

কখন যে দেখতে-দেখতে সন্ধ্যা হ'য়ে গেলো সৌম্য কিছু খেয়াল করেনি। কখন চারদিক অন্ধকার হ'য়ে উঠেছে। সৌম্যর মনে হ'লো এ-অন্ধকার যেন আকাশের অন্ধকার নয়, এ অন্ধকার তার নিজের রচনা। এ এসেছে তার মনের দুর্গম গুহা থেকে, শরীরের পরিতৃপ্ত অবসন্নতা থেকে তৈরি। সৌম্য জানলা দিয়ে বাইরে শহরের দিকে তাকালো। এর আগে জানলার ধারে পাশে সে কোনোদিন যেন বসে নি, সন্ধ্যার ম্লান ঘনায়মানতায় কলকাতাকে কী অনির্বচনীয়, অপরূপ সুন্দর দেখায়, তা যেন তার জানতে কি ছিলো। রাস্তায় আলো জ্বলেনি, [illegible] জ্বলো জ্বলো করছে, [illegible] একটা দোদুল্যমান সময়। কলকাতার শরীরের উপরে শ্রান্তির একটা বিশাল ছায়া পড়েছে—ভয়ঙ্কর একটা অবসাদের ভার। যতোদূর দেখা যায় সব যেন অস্পষ্ট, অনির্দেশ, কোথাও যেন কারো অবলম্বন নেই।

তার সমস্ত খণ্ড-খণ্ড অস্পষ্ট গতি-চাঞ্চল্য মিলে যেন একটি সম্পূর্ণ স্থির, নিরুদ্দেশ স্তব্ধতা। দীর্ঘীকৃত আলস্যে মোটরগুলি যেন কোন বিস্তৃত শূন্যে ভেসে চলেছে, এখানে ওখানে লোকজন যাওয়া-আসা করছে বটে, কিন্তু কেউ যেন কোথাও নেই। টুকরো-টুকরো করে' শোনা যাচ্ছে অনেক কোলাহল, কিন্তু খানিকক্ষণ কান পেতে থাকলে মনে হয়, বিশাল স্তব্ধতারই ভাঙা-ভাঙা ক'টি ঢেউ। দোকান-পাট, বাড়ি ঘর, গাছ-পালা, সব মিলে যেন একটা বিস্তৃত, ধূসর ঔদাসীন্য। সৌম্য সহজে চোখ ফেরাতে পারলো না। কলকাতার ভয়ঙ্কর বিপুলতা যেন সন্ধ্যায় এই তার ম্লানায়মান মৌন প্রথম তার কাছে ধরা পড়লো। তার স্তূপীভূত স্তব্ধতায় যেন সে একটা বন্য পাশবিকতার স্বাদ পেলো। তার মনে হ'লো, যেন একটা অতিকায় পশু সারা দিনের ব্যর্থ অন্বেষণের পরে তার শরীরের ক্লান্ত শ্লথ মন্থর পায়ে তার গুহায় ফিরে চলেছে।

জানলা থেকে চোখ ফিরিয়ে এনে সৌম্য বনানীর দিকে তাকালো। এতোক্ষণ কথা বলবার চমকিত, নরম আভাগুলি তার শরীর থেকে এখনো মিলিয়ে যায় নি। বাঁ হাঁটুর উপর ডান পা'টি বিসর্পিল শিথিলতায় তুলে দিয়ে তার উপর দু'টি হাত আঙুলে-আঙুলে আবদ্ধ করে' বনানীও এই সন্ধ্যার দিকে চেয়ে বসে' ছিলো। তাদের মাঝে এতোক্ষণ ধরে' যে এতো নীরবতা, এতো অতৃপ্তি, জমে' উঠেছিলো, এতো কথা বলে'ও যেন তারা তা বুঝতে পারে নি। তাদের মাঝে এতোক্ষণ ধরে' ছিলো যে এতো গাম্ভীর্য অন্ধকার, তা শিপ্রা আলো জ্বালিয়ে দিলে পর যেন তারা টের পেলো। সৌম্য আবার আরো কাছ থেকে যেন এবার বনানীকে দেখলো। জলের নিচে পদ্মের দীর্ঘ বৃন্তের মতো তার শরীর মদির আলস্যে যেন ভিজে আছে, দু'টি টান-করে-ধরা কঠিন বাহুতে একটা নিষ্ঠুর নির্লিপ্ততা, শুধু আঙুলগুলি তাদের

ক্ষীণায়মান নখের দিকে একটু চঞ্চল। তার বসবার এই বঙ্কিমা যেন ধূসর একটি শ্রান্তির সুর, বেশি জানে বলে'ই কেমন যেন তাকে একটু ক্লান্ত দেখায়। কিংবা কিছুই সে জানেনা, তারই জন্যে কষ্টক্লিষ্ট। এই ক্লান্তি, এই অলস উদাস্য, এই বন্য নির্লিপ্ততাই তাকে একটা ব্যক্তিত্বের বিচ্ছিন্নতা এনে দিয়েছে। তার শরীরের এই বিশাল বিস্তৃত শীতল নিস্তব্ধতাটা সৌম্য যেন স্পষ্ট স্পর্শ করতে পারলো, তাকে মনে হ'লো একটা শক্তি, একটা উপস্থিতি।

আলো জ্বলে' উঠতেই সৌম্য উঠলো ছট্‌ফট্ করে': হ্যাঁ, দিব্যি রাত হ'য়ে এলো দেখছি।

বনানী তা লক্ষ্য করলে না। তার আগের কথায় ফিরে গেলো।

বল্‌লে,—আমি কিন্তু কিছুতেই মানতে পারবো না এভল্যুশান্‌এর পেছনে কোনো একটা সূক্ষ্ম বা গূঢ় উদ্দেশ্য আছে।

কথা বলতে পেয়ে সৌম্য যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো, ঘরের আলো নিয়ে এলো তার নিরাপদ, নিরাবেশ স্বাভাবিকতা। চেয়ারটা সে জানলা থেকে একটু ভিতরের দিকে টেনে আনলো, বল্‌লে,—তবে আপনি কি বলতে চান আগাগোড়া কতোগুলি জার্ম-প্ল্যাজ্‌ম্‌এর অকারণ খেয়ালপনা? ইচ্ছে মতো তারা নিজেদের অদল-বদল করে' চলেছে?

—ইচ্ছে মতো কেন হ'বে? সেই ক্লান্ত, ধূসর গলায় বনানী বল্‌লে, —তাদের পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে সমতা রেখে তারাও যাচ্ছে বদলে। যাকে আমরা এভল্যুশান বলি, সেটা এই পারিপার্শ্বিকতার বিরুদ্ধে জীবনের একটা সবল প্রতিক্রিয়া ছাড়া আর কী? যেমন ধরুন—

সৌম্য তার চোখের দিকে তাকালো, চোখের সেই দীর্ঘ, বিহ্বল আলস্যের দিকে।

—যেমন ধরুন ঘোড়া। ঘোড়া কেন এতো ছুটতে পাবে, কারণ তার প্রতিবেশী শত্রুরা তাকে ভীষণ তাড়া করেছে। ঘোড়ার বেগ তার

শরুদের পশ্চাপ্রসারণেরই একটা প্রতিক্রিয়া। শুনেছি যে-ঘাস সে খায় তা অত্যন্ত শক্ত বলে' তার দাঁতের গঠন পর্যন্ত তাকে বদলে নিতে হয়েছে। একটা বিশেষ পরিবেশ ছাড়া তো কোনো প্রাণ বাঁচতে পারে না। পরিবেশের সঙ্গে-সঙ্গে সেই প্রাণও যে নতুন সুর ধরবে।

—তা তো বললুম। সৌম্য অল্প একটু হেসে বললে,—এই পৃথিবী যদি আয়তনে আরো অনেক বড়ো হ'তো, তবে তার প্রাণীদের চেহারাও অন্য রকম দেখতে পেতুম।

—হ্যাঁ, পেতুমই তো। বনানী শুকনো, শুভ্র গলায় বললে,—তখন তার গ্র্যাভিটেশানও অনেক বেড়ে যেতো যে। ধরুন প্রাণীদের চোখ, তাদের দৃষ্টিশক্তি। দৃষ্টিশক্তিতে রঙের বোধটা অনেক পরে এসেছে, এবং তার আগে পর্যন্ত পৃথিবীতে কোনো ক্যামিলিয়ান ছিলো না যে তার চারপাশের রঙের সঙ্গে মিল রেখে নিজের রঙ বদলাতে পারে আত্মরক্ষার জন্যে।

বনানীর ভঙ্গিতে যেন একটা নিরাবেগ, নিষ্ঠুর নির্লিপ্ততা, দু'টি ভুরুতে যেন কোনো জিজ্ঞাসা নেই, সন্দেহ নেই, তার দুই চোখে যেন অতল অকৌতূহল।

সৌম্য চঞ্চল হ'য়ে উঠলো: তবু এই পরিবেশ বদলানোর মধ্যেই যে কোনো ঐশ্বরিক অভিসন্ধি নেই তা আপনি কী করে' বলতে পারেন?

—যদি-ই বা থাকে, তাকে আপনি ঐশ্বরিক বলতে পারেন না। কেননা, বনানী ঠোঁট দু'টি পাৎলা করে' একটু হাসলো: তার মধ্যে দেখতে পাই না কোনো একটা রীতি, একটা স্থূল বিধিবদ্ধতা। তবে আপনার ঈশ্বরের কে মাপজোক করবে, বিজ্ঞান সেখানে বুদ্ধিমান।

—কেনই বা আপনি তা দেখতে পাচ্ছেন না? সৌম্য সোজা হ'য়ে উঠে বসলো: এ তো আপনি দেখছেন যে পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রামে

ও সঙ্ঘর্ষে যারা বাঁচছে, পৃথিবীতে কেবল তাদেরই বাঁচবার অধিকার। ক্রমশ এই বাঁচবার উপযোগিতা বাড়ানোটাই কি আপনার কাছে এভল্যুশানএর মূল উদ্দেশ্য বলে' মনে হয় না ?

বনানীর স্বরে একটুও চাঞ্চল্য এলো না : কিন্তু যারা বাঁচছে, তারা দৈবাৎ বাঁচছে, তাদের বাঁচার পেছনে রয়েছে একটা ঘটনার আকস্মিকতা। পরিবেশটা বদ্‌লে নিন, দেখবেন তার আর চিহ্নটি কোথাও পড়ে' নেই।

—তাই তো হ'লো। সৌম্য উৎসাহিত হ'য়ে উঠ্‌লো : তখন আবার দেখা দেবে নতুনতরো জীব, আরো বেড়ে যাবে তার বাঁচবার উপযোগিতা। মানুষ থেকে দেখা দেবে মানুষেতরো বিস্ময়।

বনানী আবার হাসলো। বল্‌লে,—তা হয়তো দেবে, কিন্তু তার পেছনে কোনো উদ্দেশ্যের প্ররোচনা থাকবে না। আমরা মানুষরা সেদিনে বৃহত্তরো না হ'যে আজকের শামুকের মতো গতিহীন, মস্তিষ্কহীনও হ'য়ে যেতে পারি। হয়তো বা যেতে পারি নিশ্চিহ্ন মুছে। আমরা সমর্পিত হ'য়ে আছি আমাদের পরিপার্শ্বের উপর। কমিয়ে আনুন সূর্যের আলো, দেখুন কী হয়।

—তার অনেক দেরি আছে। কিন্তু তার মধ্যে মানুষ কতো কী হ'য়ে যেতে পারে, তার ক্রমান্বিত বিপুলতরতার সম্ভাবনাকে আপনি অস্বীকার করতে পারেন না।

—করতে চাইও না। সে-ও হ'বে পরিপার্শ্বেরই একটা প্রসারণের কারণ। কিন্তু তাই বলে' কিছুতেই এ-কথা মানবো না তার সেই বিপুলতরতার পিছনে আছে- কোনো ঐশ্বরিক উদ্দেশ্য। তাই যদি হ'তো, তবে সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার জন্যে থাকতো না মশা আর মাছি, জোঁক আর বিছে, থাকতো না এই সব রোগের ব্যাক্‌টিরিয়া। আমরা তা হ'লে অনায়াসে সুন্দর থেকে সুন্দরতরোতে চলে' যেতুম, সুস্থ থেকে সুস্থতরোতে।

শিপ্রা এই সময় পট্এ করে' চা নিয়ে এলো। পিছনে গিরধারীর হাতে জলখাবারের রেকাবি।

টেবিলের উপর কাপ্ সাজিয়ে তাতে চা ঢালতে-ঢালতে শিপ্রা তাদের কথাগুলিকে ছুঁতে চেষ্টা করলো। এখন উনুনের কাছ থেকে উঠে আসছে বলে' তার গায়ে ঝলসানো একটা ঝাঁজ পাওয়া যাচ্ছে, সমস্ত ভঙ্গিটা তার গাম্ভীর্যে আছে ভার হ'য়ে। একটিও সে কথা বললো না, অথচ তার এই চুপ-করে'-কাজ-করে'-যাওয়ায় যেন সেই আতিথেয়তার পুরোনো প্রশ্রয় নেই।

সৌম্য শিশুর মতো উচ্ছ্বসিত হেসে উঠলো: কিন্তু ঈশ্বরের লীলা আমরা কী বুঝবো?

—কিন্তু যাই বলুন, এ-কথা ভাবতে আমি কিছুতেই তৃপ্তি পাই না যে আমি কা'রো কোনো একটা অজ্ঞান দুরভিসন্ধি সিদ্ধ করতে পৃথিবীতে এসেছি; আমার কোনো একটা গোপন বা গভীর উদ্দেশ্য আছে। বনানীর স্বর যেন সন্ধ্যার অশরীরী একটা রেখা: আমি এ-রকম ভাবে সীমাবদ্ধ হ'য়ে থাকতে চাই না। আমার জীবনে কোনো উদ্দেশ্য নেই, উপলব্ধি নেই, আমি আমার পরিপার্শ্বের একটা সৃষ্টি, আমি নিজেকে সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়েছি আমার সেই অন্ধ পরিবেশের হাতে, তাতেই আমি বেশি তৃপ্তি পাই। আমরা যা করি, তা আমার ভালো লাগে না, যা হ'য়ে উঠি, তাই আমাদের পূর্ণতা। কী আছে আমাদের প্রবৃত্তি বা প্রচেষ্টার মূল্য, আমার সব চেয়ে ভালো লাগে অলস অজ্ঞানতার অন্ধকারে ডুবে যেতে।

শিপ্রা হঠাৎ টেবিলটা অমনি অগোছাল ফেলে রেখে চলে' যাবার একটা দ্রুত ভঙ্গি করলে: এই রইলো তোমাদের চা।

বনানীর যেন এতোক্ষণে হুঁস হ'লো। দাঁড়িয়ে উঠে বললে,—সে কী, তোমার চা কোথায়, শিপ্রা? তুমি চললে কোথায়?

শিপ্রা ফিরেও দাঁড়ালো না। যেতে-যেতে যেন নিজেকেই শুনিয়ে সে বল্‌লে,—আমার তো আর কিছু কাজ নেই। বসে'-বসে' গল্প করতে-করতে চা খাই।

সৌম্য চেঁচিয়ে উঠলো: বলো তোমার কী কাজ? আমি করে' দেবো।

শিপ্রা তখন দরজাটা পেরিয়ে গেছে। তরল এক পরদা হাসি দিয়েও কথাটাকে সে ঢাকবার চেষ্টা করলো না; বল্‌লে,—আহা, উনি কতো কাজ করে' একেবারে ঢেলে দিচ্ছেন। আমার এখন সন্ধ্যে দিতে হ'বে, আজ লক্ষ্মীবার, পাঁচালি পড়া বাকি—আমি এখন ঠাট করে' পা ছড়িয়ে বসে' চা খাই!

অগত্যা সৌম্যকেই সশব্দে হেসে উঠতে হ'লো। হেসে উঠতে হ'লো শিপ্রার সেই নির্লজ্জ রূঢ়তাটা ঢেকে দেবার জন্যে। প্রমাণ করবার জন্যে, তার এই উচ্ছৃঙ্খল ছেলেমানুসি সে কতো উপভোগ করে।

হাসির সেই শব্দটা যেন শিপ্রার গায়ের উপর শতখান হ'য়ে ভেঙে পড়লো। তার উলঙ্গ তীব্রতায় তার চোখ গেলো ধাঁধিয়ে, সিঁড়িটা যেন টলছে।

শিপ্রা নিচে নেমে এলো। মাটির বাতিতে বসে' সন্ধ্যা দিলে। নিচে কলতলাতেই সে গা ধুলো, গেলো না উপরের বাথরুমে। তারপর ভিজা চুলে সন্ধ্যার প্রথম ধূসর তারাটির মতো বসলো তার পূজার ঘরে, লক্ষ্মীর প্রতিমার কাছে। আজ যেন সে পাঁচালিটা মুখস্ত বলতে পাচ্ছে না, বারে-বারে বইটা খুলে ধরতে হচ্ছে। আর-আর দিন সে কেমন উঁচু, সুরেলা গলায় সমস্ত ঘর মাৎ করে' পাঁচালি পড়তো, আজ যেন তার গলা কেবল ধরে' আসছে, পূজায় কেমন সে একটা বিশ্বাসের জোর পাচ্ছে না। তার এই পূজার পিছনে রয়েছে যেন কাদের অভিজাত নির্লিপ্ততা—সৌম্যর সেই হাসির শব্দগুলি তার চার পাশে অশুচি

কতোগুলি পোকার মতো যেন কিলবিল করছে। সেই হাসিতে মিশে আছে যেন বনানী-দির উদ্ধত উপহাস। শিপ্রা সমস্ত শরীরে কেমন নিস্তেজ হ'য়ে পড়লো। আজ কিছুতেই সে ছোট্ট টাটে করে' শশার দু'টি কুচি ও দু'টি বাতাসা, লক্ষ্মীর প্রসাদ বলে' স্বামীর কাছে নিয়ে যেতে পারবে না। শিপ্রা অসহায়ের মতো চারদিকে চেয়ে দেখলো, অন্ধকারে নীল হ'য়ে আসছে আকাশ, লক্ষ্মীর পটের উপর প্রদীপের ছায়াটা কাঁপছে, তার আশে-পাশে জমে' উঠছে একটি বিরল একাকীত্ব। কেন যে সে পুজো করছে, কিসের জন্যে, সব যেন একাকার হ'য়ে তার কাছে হঠাৎ অর্থহীন, অবাস্তব হ'য়ে উঠলো। মনে হলো সে নিতান্ত অযোগ্য, অধম। তার কোনো দাম নেই, জৌলুস নেই, সে শুধু উনুন ধরাবার আগুন, দীপায়নের বহ্নিকণা নয়। এই যেন সহসা ঘোষণা হয়ে গেছে সংসারে, তার নিজের সংসারে।

ঠাকুর এসে বল্‌লে,—এ-বেলা কী রাঁধতে দেবে, মা?

শিপ্রা উঠলো খেঁকিয়ে: তা আমি কী জানি।

—বাবু বলেছিলেন মাংস হ'বে।

—সে তোমার বাবুই জানে। এখানে বলতে এসেছ কেন? উপরে গিয়ে জিগ্‌গেস করো না।

ঠাকুর হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে রইলো।

শিপ্রা যেন হঠাৎ নিজের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হ'লো। উঠলো ফণা বিস্তার করে'। বল্‌লে,—না, রোজ-রোজ মাংস কী। এ কী একটা হোটেলখানা হ'য়ে উঠেছে নাকি? যা ভদ্রলোকে খায়, সেই সোজা ডাল-ভাতই হ'বে।

ঠাকুর আমতা-আমতা করে' বল্‌লে,—কিন্তু বাবু বলেছিলেন কিনা।

—বাবু বললেই তো আর হ'বে না। শিপ্রা ধমক দিয়ে উঠলো: আমি যা বলবো তাই। তুমি চা'ল-ডাল ধুয়ে দু' উনুনে বসিয়ে দাও

বলছি। আর মাছ যা আছে তাই দিয়ে একটু সাদা ঝোল তৈরি করবে। আর না-হয় দুটো ভাজা। আমি দিচ্ছি কুটে। বাবাঃ, শিপ্রা ঘৃণায় চোখ দু'টো ঘোলাটে করে' তুললো : ক'দিন ধরে' রোজ-রোজ পেঁয়াজ-রসুন খেয়ে মুখটা একেবারে ভারি হ'য়ে আছে। বলে কিনা, আজো মাংস! পয়সা যেন গাছে ধরছে আজকাল!

কাটলো রাতের অনেকটা। শোয়ার ঘরে সৌম্যর সঙ্গে শিপ্রার সান্নিধ্যটা এলো এবার নির্জনতায় ঘনতরো হ'য়ে।

শিপ্রা যেন ঘনিয়ে আছে খানিকটা মেঘ, জোরে একটু হাওয়া দিলেই তা ঝরে' পড়বে।

তার রাগে ভার-ভার ফুলো-ফুলো মুখখানার দিকে তাকিয়ে সৌম্য ভারি মজা পাচ্ছিলো। তার দিকে এগিয়ে এসে সে বল্‌লে,—তোমার আজ কী হয়েছে বলো তো?

শিপ্রা বালিশে একটা ওড় পরাচ্ছিলো, নিলো মুখ ফিরিয়ে। চোখের তার সে কী ছটা!

সৌম্য গেলো হাত বাড়িয়ে তাকে ধরতে, শিপ্রা একটা মাছের মতো ঝাপ্‌টা মেরে জাল কেটে বেরিয়ে গেলো।

সৌম্য বল্‌লে,—আমায় কিছু না বললে আমি কী করে' বুঝতে পারবো?

শিপ্রা বসলো এসে সামনা-সামনি একটা চেয়ারে। বল্‌লে,—বনানী-দির জন্যে কালকেই তুমি বাড়ি দেখে দেবে কিনা বলো।

সৌম্য যেন একমুহূর্তে শুকিয়ে গেলো। ধরা গলায়, অপরাধীর মতো বল্‌লে,—কেন, কী হয়েছে?

· উনি কি এখানেই বসবাস করবেন ঠিক করেছেন নাকি?

সৌম্য ঝাপ্সা চোখে শিপ্রার দিকে চেয়ে দেখলে। মুখের সব ক'টি রেখা রক্তিমায় রুক্ষ হ'য়ে উঠেছে, ভঙ্গিতে একটা কর্কশ তীক্ষ্ণতা, তার

বসবার ঘনতার মাঝেও তার সমস্ত শরীর যেন কেমন অসহিষ্ণু। শিপ্রার এমন একটা চেহারা সে কোনোদিন দেখে নি।

তবু সে মুখে হাসি আনবার চেষ্টা করলো। বললে,—উনি তো আমাকে সে-কথা আজো বলছিলেন।

—আর তুমি বুঝি অমনি গদ্গদ হ'য়ে বলে' বসলে, তা কি হয়? আরো ক'দিন থাকুন।

সৌম্য জোরে হেসে উঠলো, জোর করে' হেসে উঠলো। বললে,—না ব'লে উপায় কী? তোমার জন্যেই তো তা বলতে হ'লো।

—আমার জন্যে? শিপ্রা দুই চোখে যেন আগুনের একটা হল্কা দিলে।

—তা ছাড়া আবার কী। সৌম্য ভিতরে-ভিতরে ক্লান্ত হ'য়ে উঠলো: তুমিই তো তোমার দিদিটিকে এতোদিন আঁচলে করে' বেঁধে রেখেছ, বাঁধন এতোটুকুও আলগা করতে চাও নি। তোমার সে-কাতরতা দেখে আমাকেও বাধ্য হ'য়ে নরম হ'তে হয়েছে। বাড়ি থেকে তো কাউকে আর চলে' যান বলতে পারি না।

—তা পারবে কেন?

—তা পারবে কেন মানে? তুমি পারো? সৌম্য কথাটা তার মুখের উপর ছুঁড়ে মারলো: আমার কী, তোমারই সাধের বনানী-দি, তুমি বলো না তাঁকে চলে' যেতে।

—বলা না-বলা সে আমি বুঝবো। তুমি বাড়ি ঠিক করে' দেবে কিনা বলো।

সৌম্য বললে,—আমি এখন আমার কাজকর্ম ফেলে রাস্তায়-রাস্তায় বাড়ি খুঁজে বেড়াই! বিশুবাবুকে বলে' দেবো'খন।

বিশুবাবু পরমেশবাবুর আশ্রিত এক কর্মচারী।

—বুঝি না? যদ্দিন দেরি হয়।

—যদ্দিন দেরি হয় মানে? সৌম্য আবার রুখে উঠলো: যাতে উনি আরো ক'টা দিন, এই ভাড়া মাসটা এখানেই থেকে যান, তার জন্যে তুমিই তো গোড়ায় ব্যস্ত হয়েছিলে। কী, তাঁকে তুমি বলো নি সে-কথা? বলো নি?

শিপ্রা চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লো: কে ব্যস্ত তা আর কাউকে বলে' দিতে হ'বে না।

সৌম্যের হঠাৎ সব কথা যেন ফুরিয়ে গেলো। খানিকক্ষণ নিঃশব্দে সে পাইচারি করলে। পরে হঠাৎ শিপ্রার কাছে সরে' এসে—শিপ্রা তখন পাখা চালিয়ে-চালিয়ে মশারি ফেলছে—তার কাঁধটা চেপে ধরে' মুখটা তেরছা ঘুরিয়ে এনে তিক্ত গলায় বল্‌লে,—তুমি কী বলতে চাও?

শিপ্রা এতোক্ষণে একটু হাসলো। স্বামীর এই রাগটুকু তার ভারি মিঠে লাগলো। হাসিতে ঠোঁট দু'টি পিছল করে' সে বল্‌লে,—কিছুই বলতে চাই না। তুমি এখন শুতে যাবে কিনা বলো।

তাকে ছেড়ে দিয়ে সৌম্য আবার দু' পা নিঃশব্দে হাঁটলো। কাছাকাছি সরে' এসে আবার বল্‌লে,—আমি ভেবে অবাক হচ্ছি, শিপ্রা, যাকে ধরে' রাখবার জন্যে তুমি এতো প্রাণপণ করছিলে, তার ওপর তুমি বিরূপ হ'লে কী করে'? সত্যি, তোমার সেই বনানী-দি, যার জোড়া মেয়ে নেই আর পৃথিবীতে, যাকে তুমি কিনা দেবতার মতো ভক্তি করো।

—থাক্, দয়া করে' আর অতো অবাক হ'তে হ'বে না। শিপ্রা আলোটা টুক করে' নিবিয়ে ততোক্ষণে মশারির মধ্যে চলে' গেছে। বালিশে মুখ ডুবিয়ে সে অস্পষ্ট একটু হেসে উঠলো: অতিভক্তিটা সব সময়ে ভালো নয়।

সৌম্য তখুনি শুতে যেতে পারলো না। অন্ধকারে শূন্য একটা ছায়ার মতো আরো খানিকক্ষণ ঘুরতে লাগলো।

শিপ্রা আলগোছে কখন মশারির বাইরে মুখখানা বাড়িয়ে দিয়েছে। ঘুমো-ঘুমো চোখে বললে,—কষ্ট করে' অন্ধকারে আর তোমাকে বাড়ি খুঁজতে হ'বে না। সকাল হ'লে আমিই বিশুবাবুকে বলতে পারবো।

সৌম্য পিছন ফিরতে-না-ফিরতেই সে-মুখ আবার মশারির মেঘে ডুবে গেছে।

তাদের দু'জনের মধ্যে রাতের মুহূর্তগুলি যেন ফুলের পাপড়ির মতো আবার নরম হ'য়ে এলো। বনানীর অদৃশ্য উপস্থিতিটি যেন সেই পাপড়িগুলিতে একটি মৃদুল সৌরভ এনে দিয়েছে। সৌম্য ভাবতে চেষ্টা করল এই স্পর্শ, এই স্পন্দ, এই আনন্দের কি নতুন কোনো নাম নেই, নতুন কোনো সংজ্ঞা? না, সবই পুরোনো, অভ্যাসপ্রেরিত?

আট

বিশুবাবুকে দিয়ে বাড়ি ঠিক করিয়ে তবে শিপ্রা নিশ্চিন্ত। বনানী তো এক পা বাইরের দিকে বাড়িয়েই আছে কবে থেকে। যাই হোক, এ-বাড়িতে সুখ, সুবিধে বা সান্নিধ্য যতোই সে রাশি রাশি পাচ্ছিলো না কেন, পাচ্ছিলো না সে নিজেকে, নিজেকে নিয়ে নিজের তার সেই উচ্ছ্বসিত নির্জনতাকে, শরীরের নিরবরোধ উন্মুক্ততায়, পরিবেশের পরিতৃপ্ত বিশ্রান্তিতে। তাই সে যেন এতোদিনে একটা হাঁপ ছাড়লো।

সৌম্য জিগ্‌গেস করলে: কোথায় ঠিক করলেন, বিশুবাবু?

বিশুবাবু বললেন,—এই তো কাছেই। বেলতলায়। চলুন না দেখে-শুনে পছন্দ করে' আসবেন। ভাড়া তিরিশ টাকা বলছে। মেরে-কেটে আটাশ টাকায় নামিয়ে এনেছি। আরো কিছু কমবে হয়তো।

বনানী বল্‌লে,—একেবারে আলাদা বাড়ি তো?

—একেবারে। একতলা, তিনখানা ঘর, রান্নাঘর নিয়ে। বিশুবাবু ছোট একটি ছবি এঁকে গেলেন: ভিতরের দিকে এক ফালি উঠোন। ছাতে ওঠবার ঢাকা সিঁড়ি আছে।

—ছাতে রেলিঙ নেই তো?

—না, খোলা ছাত। চলুন, পাকাপাকি কথা দেবার আগে—

—চমৎকার, খোলা ছাতই ভালো। বনানী উছ্‌লে উঠলো: না, না, এর আবার দেখবার কী আছে? কাছাকাছি বাড়ি, এমন সুন্দর আলাদা বাড়ি, এঁরা সব সময় দেখা-শোনা করতে পারবেন—না, না, আপনি এখুনি গিয়ে কথা দিয়ে আসুন। কাল ছুটি আছে, কালকেই আমি রিমুভ্‌ করবো। টাকা চায়, টাকাও আপনাকে দিয়ে দিচ্ছি। এমন বাড়ি হাতছাড়া করতে পারবো না।

শিপ্রা চোখ দু'টো একটু ঘোলাটে করে' বল্লে,—ইস্কুলের কাছাকাছি হ'লেই তো ভালো হ'তো।

—না, না, স্কুলে তো আমি স্কুলের বাসএ করে'ই যেতে পারবো, এখন যেমন যাচ্ছি। সে একটা কোনো [illegible] নয়। বনানী হেসে ফেললো: ভাড়া যে কম, সেটাও তো দেখতে হবে।

শিপ্রা তব যেন খুশি হ'তে পারলো না। বল্লে,—ইস্কুলের পাড়ায়ো কি তার শ' ভাড়ায় বাড়ি পাওয়া যেতো না?

—কিন্তু তা হ'লে তোমাদের কাছে থাকতুম কী করে'? বনানী স্নিগ্ধগলায় বল্লে,—কাউকে চিনি না শুনি না, তোমাদের হাতের কাছে যে থাকতে পারবো সেইটেই তো আমার মস্ত লাভ।

এবার সৌম্য না বলে' পারলো না, তার সহজ কর্তব্যবোধ তাকে অনবরত ঠেলা মারতে লাগলো: কিন্তু কাল, একেবারে কালকেই আপনার যাওয়া হয় কী করে'?

শিপ্রা ঝাম্‌টা মেরে উঠলো: কেন, বনানী-দি আবার পাজি-পুঁথি দিন-ক্ষণ মানতে শিখেছেন নাকি?

—তা নয়, সৌম্য গলাটা একটু খাঁখরে নিলে: উনি একা-একা ওখানে থাকবেন কী করে'?

—কেন, কে আবার তাঁর সঙ্গে যাবে? শিপ্রা যেন একটা ঘাই মারলে: একা মানুষ, সঙ্গে লোক পাবেন কোথায়?

বনানী হেসে উঠলো, হাসিতে তার সমস্ত শরীর ভিজে গেলো, যেন ভরে' গেলো ছোট ছোট অগণন সাদা ফুলে।

সৌম্য ঢোক গিলে বল্লে, তা নয়। ওঁর ঠাকুমা না আসবেন শুনেছিলুম।

—তা আসবেন না হয় ক'দিন বাদে। বনানী বল্লে,—আমি আজই চিঠি লিখে দেবো।

—উনি এলেই না-হয় যাবেন। সৌম্য তবু আপত্তি করলে: নইলে একা-একা থাকবেন কী করে'?

—কেন, ভয়টা কিসের? বনানী উজ্জ্বল দুই চোখ তুলে বল্‌লে,—ঠাকুমা এলেই বা আমি এমন কী নিরাপদ হ'বো? তিনি তো কলকাতায় আসছেন শুধু গঙ্গার প'ড়ে মরবেন বলে'।

—হ্যাঁ, চিরকাল একা থেকে এলেন, শিপ্রা চোখের কোণটা একটু বাঁকা করে' বল্‌লে,—আজ যতো ওঁর জন্যে ভাবনা।

তবু সৌম্য আশ্বস্ত হ'লো না। বল্‌লে,—অন্তত একটা জানা-শোনা ঝি সঙ্গে আনা উচিত ছিলো।

—কেন, ঝি তো কবেই ঠিক করেছি একটা। তপ্ত লোহার উপর এক বিন্দু জলের মতো শিপ্রা ছ্যাঁৎ করে' উঠলো: সে তো কাজে যাবে বলে' কবে থেকে বসে' আছে। দিন-রাতের ঝি! রাঁধতে পর্যন্ত পারে। ন' টাকা মোটে মাইনে।

—না, না, আমার জন্যে কিছু ভাবতে হবে না আপনাকে। বনানী যেন একটু ঠাট্টার সুরেই বল্‌লে,—আমিই আমার নিজের যথেষ্ট সঙ্গী, যথেষ্ট অভিভাবক। তারপর শিপ্রাকে একটু কাছে টেনে এনে: আজই চলো শিপ্রা, আমরা ঘর-দোর সব গুছিয়ে ফেলি। মাঝখানে একবার শহরে বেরিয়ে কিছু জিনিস-পত্র কিনে ফেলতে হ'বে।

শিপ্রা ভারিক্কি চালে বল্‌লে,—সে জন্যে তোমার কিছু ভাবতে হ'বে না, তুমি শুধু একটা ফর্দ করে' ফেল, বিশুবাবুকে আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি। ছোটখাটো জিনিস আমি চালিয়ে দিতে পারবো এখান থেকে।

বনানী এবার সৌম্যকে লক্ষ্য করলে: কিন্তু কিছু ফার্নিচারো যে লাগবে।

সৌম্যর কিছু বলবার আগে শিপ্রা তাড়াতাড়ি তার হাত ধরে' একটা হেঁচকা টান মারলে: সব জিনিস তোমাকে আর এক দিনেই

ফিরতে হ'বে না। এখন যা তোমার টেব্‌ল্‌-চেয়ার লাগে এখান থেকে নিয়ে যাও। পরে দরকার বুঝে আস্তে আস্তে কিনে নিয়ো। একসঙ্গে অনেকগুলি টাকা ঝপাস্‌ করে' বা'র ক'রে ফেলো না।

বনানী তার গিন্নিপনাতে সুড়সুড়ি দিয়েছে, আর শিপ্রাকে কে পায়? ঘর-দোর সাজিয়ে, রান্নাঘরে উনুন পেতে, টুকি-টাকিটি পর্যন্ত গুছিয়ে সে দুই হাতে সব ফিটফাট করে' দিয়ে এলো। ঝাঁটার কাঠিটি থেকে শুরু করে' শিল-নোড়া, ঘুঁটে রাখবার ধামাটা পর্যন্ত। নিজ হাতে সে উনুন পাতলে, নিজ হাতে ইট পেতে তৈরি করে' দিলে তক্তপোষ। ঝিকে শিখিয়ে-পড়িয়ে আগেই সে মজুত করে' রেখেছে। বল্‌লে,—রান্নাটা কি ওকে দিয়েই করাবে নাকি?

—পাগল! বনানী হেসে বল্‌লে,—সবই যদি ও করবে, তবে আমার জন্যে কী রইলো?

শিপ্রা চোখ-মুখ ঘোরালো করে' বল্‌লে,—ইস্কুলে যাবার সময় তোমার এই ঘরটায় অন্তত তালা দিয়ে যেয়ো। শত বিশ্বাসী লোককেও শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস করা যায় না। এই নাও, এটা খুব মজবুত তালা, চাবির আবার নানারকম কায়দা আছে। দেখে রাখো।

বনানী দেখতে-দেখতে বল্‌লে,—বা, তা বন্ধ করে' যাবো বৈ কি। আমার কোনো কিছুতেই কিছু ভয় নেই, শিপ্রা। তোমরা এতো কাছে আছো—

—বা, আমি তো দু' তিনদিনের মধ্যেই বাপের বাড়ি চলে' যাবো। শিপ্রার দুই চোখ ভয়ে ও খুশিতে ছলছল করে' উঠলো: কাকাবাবু নিতে আসছেন চিঠি পেলুম।

—তবু, আবার তো ফিরবে।

—হ্যাঁ, কয়েকমাস দেরি হ'বে বৈ কি: মা আবার কতোদিনে ছেড়ে দেন—

শিপ্রার ইচ্ছা ছিলো এ নিয়ে আরো খানিকক্ষণ কথা হয়। তার শরীরের উপর এ কথাগুলির আর্দ্র, গাঢ় উষ্ণতা সে অনুভব করে। এই সব কথা বলতে-বলতে সে গভীর, বিহ্বল, সুরভিত হ'য়ে ওঠে। এই কথার জল ঠেলে সে চলে' আসে তার স্বামীর ভালোবাসার প্রাস্তরে, তার ঐশ্বর্যের প্রচুরতায়। কিংবা, বনানী তাকে দুয়েকটা খোলা, মেয়েলী ঠাট্টা করুক, তাতে চিহ্নিত হ'য়ে উঠুক তার এই বিস্ময়কর অভূতপূর্বতা, তার শরীরময় প্রেমের এই প্রবল সমারোহ। কিন্তু বনানী তার ধার দিয়েও ঘেঁষলো না। শিপ্রা থাকলেও তার কিছু আসে না, চলে' গেলেও যায় না তার এক তিল। আর, কেন যে যাবে, কেন যে অনেকদিন আসতে পারবে না, সব যেন বনানীর কাছে পড়া একটা বইয়ের মতো জানা, তাতে তার একবিন্দু রোমাঞ্চ নেই, কৌতূহল নেই। পরের সুখে সুখী হওয়ার মধ্যে মানুষের মনে প্রচ্ছন্ন যে একটু ঈর্ষা থাকে, ততোটুকু ঈর্ষা পর্যন্ত তার নেই। শিপ্রা যেন কঠিন একটা অপমান বোধ করলো।

ঘরের বাইরে চ'লে' এসে বনানী বল্‌লে,—হ'লো তো এখানকার গাছগাছ, এবার বাড়ি চলো।

শিপ্রা শুকনো, যেন অসহায় মুখে হাসলো: বা, এই তো তোমার বাড়ি।

—কাল থেকে। আজ রাত পর্যন্ত আমি তোমাদের অতিথি।

পুইয়ে গেলো সে-রাত। এলো এবার বিদায়ের লগ্ন।

সৌম্য শিপ্রাকে বল্‌লে,—এ কী, তুমিও যাচ্ছো নাকি?

সদ্য-ঘুম-ভাঙা ছোট একটা ভোরবেলার পাখির মতো শিপ্রা তরল গলায় হেসে উঠলো: বা, আমি যাবো কোথায়? আমি শুধু ওঁকে রেখে দিয়ে আসবো। দুয়েকটা খুচরো কাজ যদি কোথাও বাকি থাকে—

বনানীর পরনের শাড়িটা সাদা, আগুনের মতো সাদা। এত সুন্দর, যেন জ্বলছে। খানিক আগে মুখ ধুয়েছে বলে' কপালের কাছের আঁকাবাঁকা চুল কটি ভেজা, দু'টি চোখে নতুন ভোরের আর্দ্র একটু আলস্য। দাঁড়াবার সমস্তটা ভঙ্গি স্তব্ধতায় কঠিন, সংহত—তার এই ক্ষণিক থেমে-থাকাটি যেন দীর্ঘ একটা সুর।

এক মুহূর্ত সৌম্যর মনে হলো বনানীকে যেন সে ছুঁতে পারে। ছুঁতে পারে সেই আগুনের শুভ্রতাকে। আর যদি একবার ছুঁতে পারে তার নবজন্ম হয়ে যায়। মুহূর্তে সে হয়ে ওঠে দুর্যোধ দুর্দম। বীর বিজয়ী।

বনানী সৌম্যর দিকে এ. প. এগিয়ে এলো. বল্লে,—আপনি তো একদিনো আমার বাড়িটা দেখতে গেলেন না।

শিপ্রা ছোঁ মেরে কথা কেড়ে নিয়ে বল্লে,—পুরুষমানুষ ঘরকন্নার বিলি-ব্যবস্থা কী বুঝবে?

বনানী বল্লে,—এবার থেকে যাবেন মাঝে-মাঝে। আমি কিন্তু ভারি একা থাকবো।

শিপ্রার সমস্ত শরীর জ্বালা করে' উঠলো: আর একা কোথায়? তোমার ঠাকুমাকে তো টেলিই করে' দিলে কাল। টেলি পেয়ে আর তিনি দেরি করবেন ভেবেছ নাকি?

সৌম্য কথাটার পাশ কাটিয়ে গেলো। বনানীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বল্লে,—আমার বাড়ি দেখছেন তো, আপিস থেকে আসতেই রাত হয়ে যায়। যদি সময় পাই—

—হ্যাঁ, যাবেন সময় পেলে। বনানী সৌজন্যে অবারিত হয়ে উঠলো: এখান থেকে কতোটুকুন বা রাস্তা, হেঁটে গেলে বড়ো জোর দশ-বারো মিনিট। যাবেন। এবার আমার বাড়ি, নেমন্তন্ন করে রাখছি আগে থেকে।

শিপ্রা অস্থির হয়ে উঠলো : এবার চলো, বনানী-দি, বিশুবাবু সেই কখন থেকে গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

বনানী হেসে উঠলো : এইটুকুর জন্যে আবার গাড়ি কেন? তোমার সবতাতেই বাড়াবাড়ি, শিপ্রা।

—বাড়াবাড়ি আমার না আরো কিছু। গাড়ির মাথায় টেবিল-চেয়ারগুলো যাবে না? শিপ্রা অতি কষ্টে একটু হাসলো : নইলে ভদ্রলোকেরা গেলে তাদের বসাবে কোথায়? চলো, চলো, আমার আবার নিজের কাজকর্ম সব পড়ে' আছে।

বনানীকে তার বাড়িতে বন্ধ করে' রেখে তবে শিপ্রা নিশ্বাসের হাওয়া পেলো। চুপি চুপি উঠে এলো উপরে, উঁকি মেরে একবার দেখতে সৌম্য এখন কী করছে। আয়নাটা কাৎ করে' ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে' সৌম্য তার দৈনিক দাড়ি কামাচ্ছিলো, আয়নাতে পলায়মান একটা ছায়া পড়লো। সে কোনো কথা বললো না, কখন, কোন সময় কথা বলতে হয়, স্ত্রীর সঙ্গে ব্যবহারের ছোট-ছোট কৌশলগুলি সে এর মধ্যে বেশ শিখে নিয়েছে।

শিপ্রাই কথা বললো। আয়নায় স্বামীর এই নির্লিপ্ততায় নিষ্ঠুর মুখ কেন যেন হঠাৎ তার ভারি ভালো লেগে গেলো, কেমন পুরুষের মতো মুখ। চুপি-চুপি শিপ্রার ছায়াটা আয়নায় দীর্ঘতরো হ'য়ে এলো। সৌম্যর গা ঘেঁষে অথচ তার ছোঁয়াচ থেকে আত্মরক্ষা করে' অদ্ভুত একটা ভঙ্গিতে তার কানের কাছে মুখ এনে আস্তে বললে,—বনবাসে রেখে এলুম।

—তা বেশ করেছ। সৌম্য সেই নির্লিপ্ত মুখে ঘুরে দাঁড়ালো : আমার কিন্তু আজ আপিস আছে।

—জানি গো জানি। তা আর আমাকে বলে' দিতে হ'বে না। তাই আমি থাক্-থাক্ করে' ছুটে এসেছি। আমি তো ভেবেছিলুম,

শিপ্রা ঠোঁট টিপে একটু হাসলো: আপিস বুঝি তুমি আজ আর যাবে না।

—আপিস যাবো না মানে?

—মানে, মানে এই আর কী! শিপ্রা দরজার কাছে পালিয়ে গেলো: সব দিন কি আর মানুষের মন ভালো থাকে?

সৌম্য তেমনি খোদাই-করা নির্বিকার মুখে দাঁড়িয়ে রইলো। সোজাসুজি প্রতিবাদ করতে পর্যন্ত সে সাহস পেলো না, শাসন তো দূরের কথা। সৌম্য এ-সব গেরস্থালিতে পুরোদস্তুর রপ্ত হ'য়ে উঠেছে। ও-সব নিয়ে কথা বলতে যাওয়া মানেই ঘুমন্ত আগুনে কাঠির খোঁচা মারা। সে-আগুন ধুঁইয়ে-ধুঁইয়ে আপনিই আবার নিবে যাবে। শিপ্রা হাতের কাছে সস্তা একটা খেলনা পেয়েছে, আপনিই সে এক সময় ক্লান্ত হ'য়ে ছুঁড়ে ফেলে দেবে, তাতে মুচড়ে মুচড়ে আবার দম দিতে গেলে ফল দাঁড়াবে উলটো। যা আপনিই থামতো, তাকেই মিছিমিছি খোঁচিয়ে দেখা ছাড়া আর কিছু লাভ হতো না। নীরবতাটা একটা খুব দুর্ধর্ষ অস্ত্র, বিশেষতো স্বামী-স্ত্রীর দ্বৈত দ্বন্দ্বে, যার যতো বেশি কথা, তার ততো বেশি হার। লাগুক এসে যতো খুশি বাণ, গুরুতার ঢালে লেগে তা আপনিই যাবে ভোঁতা হ'য়ে। সৌম্য এ-সব ফাঁক-ফন্দি বুঝে নিয়েছে, শক্ত একটা নিঃশব্দতার খোলে সে তাই আঁট হ'য়ে বসে' রইলো। কতোক্ষণ পর শিপ্রা তার স্বাভাবিকতার স্রোতে নেমে এলেই সৌম্য আস্তে-আস্তে আত্মোন্মোচন করবে। তার আগে নয়। তাদের সময় কিছু আর আজকেই ফুরিয়ে যাচ্ছে না।

সমস্ত দিন কেটে গেলো আপিসে, বিস্মৃতির নিস্তরঙ্গতায়। সৌম্য যখন বাড়ি ফিরলো তখন ঘর-দোরের আনাচে-কানাচে একটু একটু করে' অন্ধকার জমে' উঠেছে। নিচেটা খালি, কোথাও এতোটুকু

শব্দের দাগ নেই। আবহাওয়াটা কেমন ভার, স্যাঁতসেঁতে। সৌম্যর লুকিয়ে-লুকিয়ে ভয় করতে লাগলো।

শোবার ঘরে সৌম্য আপিসের কাপড় ছাড়ছে, শিপ্রা হঠাৎ কোত্থেকে টলতে-টলতে ছুটে এলো। তার এমন একটা অদ্ভুত চেহারা সৌম্য যেন কোনোদিন লক্ষ্য করে নি, তার মুখে-চোখে, এই তার আবির্ভাবের প্রবলতায় একটা চমকিত, ধারালো বিশীর্ণতা। সে যেন এতোক্ষণ প্রতীক্ষা করে' ছিলো না, উদ্যত থাবায় ওৎ পেতে ছিলো।

—ফিরতে আজ এতো দেরি হ'লো কেন? একদিনো বুঝি তর সইলো না। আজই একেবারে নেমন্তন্ন রাখতে গিয়েছিলে বুঝি?

সৌম্য একেবারে আকাশ থেকে পড়লো: কোথায় আবার নেমন্তন্ন?

—ও! সে-কথাও আমাকে মনে করিয়ে দিতে হ'বে।

মনে-মনে বিরক্ত হ'লেও সৌম্য মুখে হো-হো করে' হেসে উঠলো। বল্লে,—তুমি কি দিন-দিন পাগল হচ্ছ নাকি, শিপ্রা? কী ছেলেমানুষি যে করো তার ঠিক নেই। তোমার এখন দস্তরমতো বয়েস বাড়ছে।

স্বরের প্রচ্ছন্ন আন্তরিকতায় শিপ্রা যেন মুহূর্তে আবার গলে' গেলো। বল্লে,—সত্যি যাও নি?

পেণ্টালুনের ক্রিজ্‌টা ঠিক করে' রাখতে-রাখতে সৌম্য বল্লে,—কোথায় যাবো? দেখছ সারাদিন খেটে-খুটে আপিস থেকে ফিরছি।

—কিন্তু একবার গেলেও তো পারতে। শিপ্রা চোখ দু'টো একটু নাচালে: যাওয়া তো তোমার উচিতও। এতো কাছে আছো—বলতে গেলে আমরাই তো ওঁর ভরসা।

—কিন্তু আমার যাবার কী হয়েছে? সৌম্য ইজিচেয়ারে বসে' পড়লো।

—বা, অতো করে' নেমন্তন্ন করে' গেলেন যে।

—তোমাকেও তো করেছে।

—ককখনো না। শিপ্রা কল্পিত শত্রুর বিরুদ্ধে মুখিয়ে উঠলো: আমাকে ককখনো নেমন্তন্ন করেন নি। আমি কে, আমাকে কেন নেমন্তন্ন করতে যাবেন?

—সত্যিই তো, তোমাকে নেমন্তন্ন করবার কী দরকার? তুমি তার এতকালের বন্ধু, তোমার বেলায় এ-সব লৌকিকতার কোনো দাম নেই।

—নিশ্চয়। তা তো আমিও বলছি। শিপ্রার দুই চোখ দুষ্টুমিতে টলমল করে' উঠলো: নতুন বন্ধুকেই তো লোকে বেশি খাতির করে।

—যাও, আর বাজে বোকো না। সৌম্য কিছুতেই আর নিজেকে মুছে ফেলতে পারলো না: বড্ড ফাজিল হচ্ছ দিন-দিন। যাও, শিগগির চা নিয়ে এসো। খিদেয় বলে আমি মরে' যাচ্ছি।

শিপ্রা হাসতে-হাসতে বেরিয়ে গেলো। চা আর জলখাবারের প্লেটটা নামিয়ে রেখে দু' দণ্ড যে সে সৌম্যর কাছে বসবে তার জো নেই। আবার তক্ষুনি পাউরুটিওলা এসেছে গেলো হপ্তার দাম নিতে।

এবার শিপ্রা যখন উঠে এলো, একেবারে গা ধুয়ে, গা থেকে ধুয়ে ফেলে রান্নাঘরের সেই ধোঁয়াটে আবহাওয়া। ফর্সা শাড়িটিতে যেন মেখে নিয়ে এলো নিভৃত অন্ধকারের নরম উষ্ণতা, পর্দা সরিয়ে তার ঘরে ঢোকাটি একটি অস্ফুট তারার ধূসর উদয়ের মতো।

শিপ্রা এসে দেখলে সৌম্য তেমনি ইজিচেয়ারে শুয়ে সকাল-বেলাকার মিউনো খবরের কাগজ পড়ছে, তার এলানো ভঙ্গিতে ঘনিয়ে আছে একটি কিছু-না-করার করুণ অলসতা।

শিপ্রার জিভটা আবার একটু চুল্‌কে উঠলো। শূন্য বাসনগুলি টেব্‌লের নিচে নামিয়ে রাখতে-রাখতে চোখটা ইশারায় একটু ধারালো করে' বললে,—কী, গেলে না এখনো?

সব-কিছুরই একটা সীমা আছে। সৌম্য এবার আর নিজেকে বশে রাখতে পারলো না। তেতে উঠলো: কোথায় যাবো? দেখ শিপ্রা, এ ভালো হচ্ছে না কিন্তু। তুমি-ডিসেন্সির সীমা পেরিয়ে যাচ্ছ। এ কী অন্যায় কথা!

—বা রে, শিপ্রা ঝিরঝির-করে' বওয়া ঝর্ণার জলের মতো হেসে উঠলো: তুমি তোমার আড্ডায় যাবে না? রোজই তো তুমি সেখানে যাও, অবিশ্যি মাঝের এ ক'টা দিন ছাড়া। আমার জন্যে বাড়িতে আবার বসে বসে' থাকো?

—না, আজ আমি বাড়িতেই বসে' থাকবো। বলতে-বলতে সৌম্য হাত বাড়িয়ে শিপ্রাকে কাছে টেনে এনে ইজিচেয়ারে তার পাশে বসিয়ে দিলো, পাশ বলতে যতোটুকু বোঝায়।

সৌম্য অন্ধকারের সেই ক'টি নতুন, রঙিন মুহূর্তকে হাতের মুঠো ভরে'-ভরে' কুড়িয়ে নিতে লাগলো। টেনে দিলো তার আনন্দের বৃষ্টি, উড়িয়ে দিলো তার এলোমেলো কথার ব্যাকুলতা। শিপ্রার কোনো কথারই সে আজ পাশ কাটাতে পারলো না, বরং ইচ্ছে করে' গায়ে মাখতে লাগলো, তার সাংসারিক সব ছোট-খাটো কথা, মুদির দোকানের পাওনাটা এ-মাসে কিছু ভারি হয়েছে, কেন ভারি হয়েছে তা আর বলতে হবে না, যে-ছোকরাটা তাদের তেল দেয় সে অনায়াসে গেলো দু' মাস ধরে' চেপে গেছে তেলের দর নেমে যাবার খবর, ওটাকে দিতে হ'বে ছাড়িয়ে; আর কয়লাওলা যখন কয়লা মেপে দিয়ে যায়, তখন, এমন পাজি, বোরাগুলির ওজন বাবদ কিছু বেশি দিতে যায় ভুলে, এবার থেকে মাপার সময় ওর সামনে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হ'বে। ওদের দু'জনের মধ্যে ছোট সংসারটি আবার উত্তপ্ত হ'য়ে উঠলো, ঘরের দেয়ালগুলো কাছে সরে' আসতে-আসতে তাদের পরস্পরের পরিপূর্ণ লুপ্ততার মধ্যে দু'জনকে ঘিরে এলো। তারপর কাকাবাবু শিগগিরই

আসছেন তাকে নিতে যেতে—শিপ্রার অবিশ্যি তাতে ভয় নেই, সে মা'র কাছে যাচ্ছে। হ্যাঁ, তার ভয়েরই বা কী, সৌম্য তার জন্যে গরম কাপড়-চোপড়ের দানবিক একটা অর্ডার ছাড়িয়ে এনেছে, তার হাত-বাক্সের খোপগুলি ভ'রে দিয়েছে টাকার ঢিবিতে। দরকার হ'লে আরো পাঠাবে টাকা, ছুটি পেলেই সে ছুটে গিয়ে দেখে আসবে তাকে। না, কোথাও কিছু তার ভয় নেই, স্বামীর আঙুলগুলি মাখন দিয়ে তৈরি, গ'লে-গ'লে পড়ছে আদরের অনর্গলতা। তবে মাঝে-মাঝে তার এ-বাড়ির জন্যে মন পুড়বে, উনুনের কোণটুকুর জন্যে। সে না থাকলে সৌম্যের না-জানি কতো অসুবিধে হ'বে, কে-বা রান্নাবান্নার তদারক করবে, কে বা মুখের পাতা পড়া মাত্র তৈরি ক'রে আনবে চায়ের ঘটি। তা, অসুবিধে তো একটু হ'বেই, প্রতিটি অতৃপ্তিতে স্বাদময় হ'য়ে উঠবে তার শিপ্রার বিরহ, প্রতিটি ফাঁকে ভ'রে থাকবে তা। শিপ্রার উত্তাপ। শিপ্রাকে সে অখণ্ডিত একটি উপস্থিতির মতো তার সমস্ত সত্তার উপর উৎসারিত ক'রে দেবে। তা তো দেবে, কিন্তু ফিরে এসে ঘরদোরের কী না-জানি সে হাল দেখে, কোথায় চেয়ার-টেবলগুলো ছড়ানো-ছিটোনো, কাপড়-চোপড়গুলো টাল্ ক'রে ফেলা, কড়িকাঠে ঝুল'ছে ঝুল, চড়ুই পাখিগুলো খড়কুটো বিছিয়ে কিছু আর রাখে নি। আর শোনো, মাসিক-পত্রগুলি এলেই যেন তার ঠিকানা কেটে পাঠিয়ে দেয়া হয়, আর যদি সে কিছু নতুন বই কেনে বাঙলা। হ্যাঁ, সত্যি-সত্যি যেন কেনে, হপ্তায় অন্তত একখানা ক'রে বই, একটা বই শেষ করতে বড়ো জোর তার দু'টো দুপুর। আর, দিব্যি এখন রাতগুলো হিমে ধারালো হ'য়ে এসেছে, বাইরে যেন বেশিক্ষণ আড্ডা না দেয়া হয়, ছাদে উঠে শহরের আকাশ নিয়ে কবিত্ব করাটা অন্তত শীতকালের জন্যে বন্ধ থাক্। হয়েছে, তার জন্যে সৌম্যকে ভাবতে হ'বে না, সে তার শরীরের অবস্থা ও কাজ দায়িত্ব

সম্বন্ধে অনেক অধ্যাপিত হয়েছে। আর, আসল কথাই এখনো বলা হয় নি, বই হোক্ না-হোক্, হপ্তায় অন্তত, খুব কম করে', নিদেন পক্ষে, দু'খানা ক'রে চিঠি—খুব বড়ো চিঠি, খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে সমস্ত কিছু খবর, যা ঘটেনি—ঠিক দীর্ঘ, মধুর একটা উপন্যাসের মতো চিঠি। গিরিধারীকে সব সময় যেন দাবিয়ে রাখা হয়—চুরি করে' এই ফাঁকে ওর মেদিনীপুরী মেটে ঘর না পাকা দালানে ফাঁপিয়ে তোলে তো কী বলেছি। চাকর-বাকরের উপর একটু কড়া চোখ রাখতে হয়, তা যা-ই হোক্, উপায়ান্তর যখন কিছু নেই, অন্তত তিনবার যেন সে উপরে-নিচে ঝাঁট দেয়, জিনিসপত্রগুলোকে একটু ভদ্রলোকের মতো ফিটফাট করে' রাখে। তা, থাক্ না সব জিনিসপত্র এলোমেলো, ছত্রখান হ'য়ে, সব ধুলোয় পড়ে' থেকে শিপ্রার দু'টি হাতের সস্নেহ নির্মমতার জন্যে ধ্যান করবে, ঘরের দেয়ালগুলো কান পেতে থাকবে শিপ্রার পায়ের শব্দ শুনবে বলে', হাওয়ায় বাজবে শিপ্রার ফিরে-আসার প্রতীক্ষা। আর সত্যি সে যখন একদিন ফিরে আসবে, গুনে দেখলে ক'টি বা আর দিন, শিপ্রা আর একা ফিরে আসবে না,—ভাবতে দু'জনের শরীর সেই মহান ভবিতব্যতার রোমাঞ্চে শিহরিত হ'তে লাগলো।

কিন্তু শিপ্রা কি নতুন হয়ে আসবে? না, হবে আরো অপচিত, আরো বিগতস্বাদ? সে কি আসবে নববসন্তের সঞ্জীবনী নিয়ে না সেই স্বয়ংক্রিয় প্রাত্যহিকতা?

দু'দিন পরেই কাকাবাবু এসে হাজির হ'লেন, জমাট পেশাতে ছোট্ট মানুষটি। শিপ্রা পরদিন সকালেই যাবার জন্যে বায়না ধরলো, বাঁধা-ছাঁদা তার কতোদিন আগে থাকতেই তৈরি। সৌম্য অবিশ্যি রাজি হ'লো না, তাকে আরো একটা রাত্রির বেশি ধরে' রাখা। শহরে কাকাবাবুর কিঞ্চিৎ দরকার।

শেষের রাত্রে,—রাত থাকতে-থাকতেই শিপ্রাকে উঠে মুখ-হাত

ঘুমে খেলে ঝোঁৰ হ'তে হ'বে—শিপ্রা সৌম্যর বুকের কাছে মুখ এনে ভয়ে-ভয়ে অথচ গাঢ়, জড়ানো গলায় বল্‌লে,—একটা কথা আমাকে তুমি সত্যি বলবে? সত্যি?

সৌম্য তার ঘুমহারা করুণ দু'টি চোখের দিকে চেয়ে বল্‌লে,—কি?

—সত্যি আমাকে তুমি ভালোবাসো?

সৌম্য জোরে হেসে উঠলো। বল্‌লে,—তুমি দেখি তার মতো করলে, শিপ্রা। সাতকাণ্ড রামায়ণ পড়ে' সীতা কে জিগগেস করছ।

—না, সত্যি বলো।

—তোমার কী মনে হয়?

—আমার মনে হওয়া দিয়ে কোনো কথা নয়, তুমি বলো।

—বা রে, তুমি নিজে যদি কিছু বুঝতে না পারলে, তবে আমার মুখের কথা শুনে কী হ'বে?

—না, আমি মুখের কথাই চাই। বলো, ভালোবাসো?

সৌম্য তাকে আরো কাছে টেনে আনলো। দীর্ঘ একটা সুর করে' বললে,—হ্যাঁ।

শিপ্রা খিলখিল করে' হেসে উঠলো: কী হ্যাঁ?

—ভালোবাসি। বাবাঃ, তুমি উকিল হ'লে না কেন, শিপ্রা?

—খুব?

—ভীষণ। মুখের কথা দিয়ে তা শেষ করা যায় না। মুখের কথায় তা বড়ো বিচ্ছিরি, খেলো শোনায়।

—আচ্ছা, তাই যদি হয়, শিপ্রার গলা এবার গম্ভীর হ'য়ে এলো: আমার একটা কথা রাখবে?

—তোমার কোন কথাটা রাখিনি বলো? সেই সেদিন চাইলে একটা ক্যাশমিয়ারের শাড়ি, তক্ষুনি—

—অতোশতো বুঝি না। বলো, রাখবে কিনা।

—চেষ্টা করে' দেখবো।

—সেটা এমন কিছু তোমার চেষ্টা করে' করবার নয়। ভীষণ সোজা কাজ। তোমার এক পা কোথাও যেতে হ'বে না, এক পয়সা খরচ হ'বে না, যেমনি আছো তেমনি থাকবে।

সৌম্য বল্'লে,—রাখবো।

—তবে আমার গা ছুঁয়ে বলো।

সৌম্য হেসে উঠ্'লো: আবার গা ধ'রে ছুঁতে হ'বে?

শিপ্রার মুখে কথাটা আর কিছুতেই ফুটতে চায় না।

সৌম্য বল্'লে,—বলো, কী কথা? চুপ করে' গেলে কেন?

শিপ্রা যেন হঠাৎ অন্ধকারে মুছে গেলো। এবার যে কথা কইলো সে যেন এ হাসিতে-কথায় উজ্জ্বল, কাপালি শিপ্রা নয়, তার অন্তরের গুহাশায়ী কঙ্কালাবৃত একটা প্রেত। সেই বিষাক্ত বিভীষিকা যেন শিপ্রা নিজেও সহ্য করতে পারছে না। লজ্জায় বাহুর মধ্যে মুখ লুকিয়ে সে যেন বহু দূর থেকে বললে,—বলো, তা হ'লে তুমি ও-বাড়ি কোনোদিন যাবে না।

—কোন বাড়ি?

—আ[illegible] যেন কোন বাড়ি। শিপ্রা এর মধ্যেও হাসলো, মৃত, বিবর্ণ হাসি: বনানী-দির বাড়ি। যার সঙ্গে তোমার একদিন বিয়ের সম্বন্ধ এসেছিলো।

সৌম্য তার পায়ের নখ পর্যন্ত বিমর্ষ হ'য়ে উঠ্'লো। নিশ্বাসের জন্যে [illegible] নিয়ে সে বল্'লে, না, ও-বাড়ি যাবার আমার কী দরকার?

—তুমি তো সব জিনিস আর দরকার মনেই করো না।

—তা, সৌম্য অতি কষ্টে যেন একটা ঢোঁক গিল্'লে: তা, ও-বাড়িতে গেলেই বা দোষ কী?

সেই প্রেতায়িত বিশীর্ণ হাসিতে শিপ্রা সমস্ত শূন্য টুকরো-টুকরো করে' দিলো: দোষ-টোষ আমি কিছু বুঝি না। তুমি আমার গা ছুঁয়ে একবার কথা দিয়েছ, জানো তো সেই কথা না রাখলে কী হয়? কেমন মজা, ফাঁকতালে কেমন একটা প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলুম।

সৌম্য কোনো কথা বললো না। চোখ বুজে ভোরের জন্যে প্রতীক্ষা করতে লাগলো।

প্রতীক্ষা করতে লাগল পুরাতন প্রভাতের পর কোন এক অপরিচিত রাত্রির।

নয়

বনানী খুব ভোরে ঘুম থেকে জেগে উঠলো, খুব ভোরে, গ্যাসগুলি সবে নিবেছে, রাস্তায় দিচ্ছে জল। কী সুন্দর, নিটোল পুষ্ট হয়েছে তার বাল রাতে, তার নিঃসঙ্গতায় উত্তপ্ত, অব্যাহত আলস্যে, এই ভোর ঘরের নিবিড়, নতুন ঘনতায়। তার শরীরের বৃন্তে একটানা ঘুম যেন অন্ধকারের একটা আরক্ত, বন্য, উগ্র ফুল হ'য়ে ছিলো ফুটে, তার গন্ধ এখনো গায়ে লেগে আছে। বনানী খটাখট্ জানলাগুলো খুলতে লাগলো, আঃ, কী চমৎকার ঠাণ্ডা পড়ছে। কিন্তু সে এখনো ভালো বন্দোবস্ত করে' উঠতে পারে নি, নইলে এখন স্নানের জল ভারি ঠাণ্ডা, অসহ্য জলে। মুখ ধুয়ে গায়ে নিজের হাতে বোনা একটা বড়ো স্কার্ফ জড়িয়ে সে জানলায় এসে বসলো। বাতাসে হাওয়া দিচ্ছে উত্তুরে, লিকলিকে চাবুকের মতো মুখের উপর বাড়ি খেয়ে পড়ছে, এতো তীব্র যে সমস্ত গা পেতে তার আদর নিতে ইচ্ছে হয়। মোটা বুনোটের শক্ত একটা চাদরের মতো কুয়াশা তাকে, তার সমস্ত পরিবেশকে, ঘিরে রেখেছে এক অনির্ণীত অপরিচয়ের শুভ্রতায়। কোথাও কিছু চেনা যাচ্ছে না, ছোঁয়া যাচ্ছে না, নেই কোথাও একটি শব্দ, একটি আভাস, সে আর তার এই পৃথিবীকে নিয়ে বিরাজ করছে একটি অখণ্ড সম্পূর্ণতা। তার বাইরে, তার মনোহীন শরীরের এই একমাত্র কাঠিন্য চেতনার বাইরে, যেন কোথাও আর কিছু নেই। মানুষ যেন অতি দূরের, আর তার যতো সব কর্মচাঞ্চল্য, অতৃপ্ত, অসুস্থ, অর্থহীন। বনানী কুয়াশা বুক ভরে' নিতে লাগলো, তার অস্পষ্টতায়, মনে হ'তে লাগলো, সে-ও যেন শরীর থেকে আস্তে-আস্তে মুছে যাচ্ছে। কুয়াশার সঙ্গে-সঙ্গে সে-ও যেন

কোথাও নেই, না থাকলেও কিছু ক্ষতি নেই পৃথিবীর, তার তখনো থাকবে এই আচ্ছন্ন, অস্পষ্ট ভোরবেলাটি।

পরদাটা পাংলা হ'য়ে আসছে, দেখা যাচ্ছে গাছের ঝিমানো মাথাগুলি, বন্ধ বাড়ির রহস্যময় ধূসরতা। অস্পষ্ট স্মৃতির মতো বিষণ্ণ এই ভোরবেলা, যেন বহু মানুষের শিশুকাল দিয়ে তৈরি। বনানী সেই ভোরবেলার নির্মলতায় ভিজে উঠতে লাগলো। দূরে-দূরে শোনা যাচ্ছে মোটরের ধাবমান শব্দ, দু'একটা বন্ধ দোকানের উঠছে ঝাঁপ, কাগজ-বিলিওয়ালাদের সাইকেলের বাজছে ঘণ্টা। কলকাতা চোখ চেয়েছে, আলস্য ভাঙছে। ধামায় ক'রে বেপারিরা আনাজ নিয়ে চলেছে বাজারের দিকে, কলে নতুন জল এসে গেছে, গয়লারা বেরিয়েছে দুধের টিন নিয়ে। জাগছে কলকাতা, বিশাল একটা কুণ্ডলীকৃত অজগর। বাড়ির এক-একটা গহ্বর থেকে বেরিয়ে আসছে কয়লার ধোঁয়া, ঠেলা-গাড়ি ক'রে চ'লছে ছাপ-মারা ছোলা মাংস, ট্যাক্সি ক'রে এই যেন কারা নতুন কলকাতায় এলো। টুকরো-টাকরো বাক্য ছিটিয়ে পড়ছে কাটা-কাটা শব্দ, বিরাট একটা ঐকতানের আগে যেন সুর ভাঁজা হচ্ছে। এই সব শব্দ ও শান্তি, বিস্মৃতি ও প্রতীক্ষা, সমস্ত কিছু উপেক্ষা ক'রে উঠে আসছে সূর্য, কলকাতার পক্ষেও সেই সমান সূর্য, বহ্নিময় উদ্ভাসিত, নতুন জন্মলাভে বীর্যবান, নিজের সত্তার নিষ্ঠুরতায় আনম্র-আগ্নেয়। কোন একটা উদ্ধত বাড়ির আড়ালে সে এতোক্ষণ অপেক্ষা ক'রে ছিলো, পৃথিবীটা আর একটু সরে' যেতেই, হঠাৎ সে অনাবরণ অজস্রতায় বনানীর শরীরের উপর উৎসারিত হ'য়ে পড়লো, চোখে মুখে চুলে আঁচলে। বনানী উঠলো জলের মতো কল্লোলিত হ'য়ে। নতুন রোদের গন্ধে তার সমস্ত শরীরে নেশা ধরে' গেলো। ভীষণ ইচ্ছা হ'লো এই রোদ সে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে, আঙুলে ক'রে এর বীণা বাজায়। ভীষণভাবে লোভ হ'লো পাউডারের মত এ-রোদ সে গায়ে

মাথে, সভ্যতার সমস্ত খোলস খুলে ফেলে এই রোদের বৃষ্টিতে সে স্নান করে।

জানলা গলিয়ে খবরের কাগজ ফেলে দিয়ে গেছে; যন্ত্রচালিত, সভ্য মানুষের মতো বনানী সেটা কোলের উপর কুড়িয়ে নিলো। মনে-মনে হাসলো, কী খবর সে আজ পাবে, পেতে পারে, এই সূর্যোদয়ের চেয়ে যা বেশি সত্য? তার সমস্ত শরীরে এই সুকঠিন সুস্থ থাকার চেয়ে কী খবর তার আজ থাকতে পারে পৃথিবীতে? এই তার ঠাণ্ডা, ঘন নির্জনতা, এই তার নিঃশব্দ, পবিত্র আপনাকে নিয়ে থাকা, আপনাতে আপনি ভরে' ওঠা। জীবনকে, সভ্যতার শাসনে জর্জর জীবনকে, সে বিদীর্ণ করে' দিতে না পারে, সে ধীরে-ধীরে তলিয়ে যাবে তার গূঢ় দীপ্ত অন্ধকারে, এই শরীরময় শান্তিতে, এই কিছু-না-করার অলস বিরমমাণতায়। এই তার কাছে যথেষ্ট খবর।

ঝি উঠেছে, উনুন ধরিয়ে কেৎলিতে জল চাপিয়ে দিয়েছে। উঠতে হয়; সাতসঙ্গে চা-টা নিজ হাতেই তৈরি করে' নিতে হবে। ছোটো-খাটো জঞ্জাল গতদিনের কাজ এখনো মাথা উঁচিয়ে আছে, ফেলতে হবে উপড়ে। ঝি-কে পাঠাতে হবে বাজারে, ততক্ষণে স্নান করে' মোটা দু'টো রান্না নামিয়ে নিতে হবে, সাড়ে-ন'টায় বাস্-এ বাজবে হর্ন। আজ আর সে পরাশ্রিত নয়, আজ থেকে সে সম্পূর্ণ আলাদা, আজ থেকে সে নিজে। বনানী ছোট-ছোট কাজের ঘূর্ণিতে ছিটকে-ছিটকে বয়ে যেতে লাগলো। চারদিকের এই লোকজন, তাদের সংসারজীবনের ব্যস্ত সমারোহ, তাকে যেন সেই চেতনার নিগূঢ় অন্ধকার থেকে এতক্ষণে মুক্তি দিয়েছে, শরীরে এনে দিয়েছে একটি লঘুতার সুর। এতক্ষণে তাদের এই সহযাত্রার সান্নিধ্য তাকে যেন স্বচ্ছন্দ করে' তুলেছে: তাকেও তাদের সঙ্গে কাজ করে' যেতে হবে—এই একটা কর্তব্যের স্বস্তি। সে আর একা নয়, দিনের বেলা লক্ষ-লক্ষ মুখে

সে এই কথা শুনতে পায়, দিনের বেলা সে-ও তাই জীবন নিয়ে দুঃসাহসী হ'য়ে ওঠে।

সমস্ত দিন তার কাটে স্কুলে, একটানা একটা ক্লান্তির মধ্যে দিয়ে। কাজ করতে হ'বে বলে'ই তার কাজ, নইলে নিজেকে সে টিকিয়ে রাখবে কী করে'; এই নিঃসঙ্গতা তার ভরে' তুলবে সে কিসের ক্লান্তিতায়? ওটা হচ্ছে শীত-তাপ-নিবারণের একটা সৌখিন অস্ত্র, ওটার তলায়ই হচ্ছে তার আসল জীবন, যেমন পোশাকের তলায়ই হচ্ছে দেহের আসল স্বাস্থ্য। নইলে, তার যদি কোনো কাজ করতে না হ'তো, না থাকতো এই মাত্র শারীরিক গ্রাসাচ্ছাদনের চেষ্টা, সে থাকতো কোনো নির্মানব সমুদ্রের পাড়ে শুয়ে, জলের সেই বিশাল শরীরেরই মতো অতলান্ত প্রশান্তিতে, তার উপর ভেঙে-ভেঙে পড়তো সময়ের শিশিরবিন্দু, রোদ আর বৃষ্টি, ধারালো রোদ আর গলানো বৃষ্টি। নেমে আসতো অন্ধকার মৃত্যুর মহান বিশ্বব্যাপ্ততার মতো, শরীরের উপর শতখান হ'য়ে ভেঙে পড়তো চাঁদের চূর্ণ, রক্তের অগণন বুদ্বুদের খেলায়। সে ফুটে উঠতো মাটির একটি আত্মজ ফুলের মতো, তার আদিমতমো আরণ্য স্বাভাবিকতায়। সমস্ত কিছু আগাগোড়া অন্ধকার, সেই অন্ধকার জলে খানিকটা রঙিন তেলের মতো সমস্ত সভ্যতা ভাসছে: বনানীর ইচ্ছা করে তেলের সেই পুরু পর্দাটা সরিয়ে সেই অন্ধকার জলে ধীরে ধীরে নেমে যায়, তার নিজের দেহের, নিজের আত্মার, নিজের রহস্যের অন্ধকারে। সে শান্তি পায় তার স্কুলের কাজে নয়, বাড়ি ফিরে এসে এই তার অটল স্তব্ধতায়। আর কোনো-কিছু-কাজ-না-থাকার নিরাপদ সম্পদে। ঝি-টি চৌকস, সব এর মধ্যে গুছিয়ে-গাছিয়ে রেখেছে, বনানীর আর কুটোটি কেটেও দু'খান করতে হয় না। শাড়ি বদলে চা খেয়ে ঘরের আবছায়ায় বসে' বনানী এখন, এতোক্ষণে খবরের কাগজটা নাড়ে-চাড়ে, দেখে এর চেয়েও আর কোথায় কোনো ভালো

কাজ পাওয়া যায় কিনা। সেটা তার একটা বহু-অনুসৃত দৈনিক অভ্যাস, এই কাজ-খালির বিজ্ঞাপন হাতড়ানো; তার সভ্যতার একটা লক্ষণ, এই কাজ নিয়ে তার অসন্তুষ্টি। কোথায় কোন কাজ সে আর পেতে পারে যাতে তার চিত্ত ভরে' থাকে পূর্ণতায়, অথচ দেহে অটুট থাকে এই অব্যাহত ঔদ্ধত্য। কাগজের স্তম্ভগুলির উপর চোখ বুলিয়ে-বুলিয়ে বনানী মনে-মনে হাসে, কোথাও তার জন্য কাজ নেই, তেমন কাজ। এই সে বেশ আছে, এই কলকাতায়, সভ্যতার অসভ্য মরুভূমিতে।

বাদুড়ের পাখার মতো আকাশে ঝোলে অন্ধকারের পাখা, সমস্ত শূন্য রিক্ততায় পাণ্ডুর হ'য়ে আসে। ঘরে যেন আর মন টেঁকে না, কোথাও বেরিয়ে পড়বার জন্য বনানী দেহ-মনে আন্দোলিত হ'য়ে ওঠে—এই সূর্যাস্তের শেষে, এই আসীদমান শীতের অন্ধকারে। সমস্ত কলকাতা চুঁড়ে এক শিপ্রাদের বাড়িটা সে চিহ্নিত করতে পারে, কিন্তু শনি-রবি শেষ পর্যন্ত সেখানে যেতে তার পা ওঠে না, সেখানে যাওয়া মানে তার এই নির্জনতাকে যেন ব্যঙ্গ করা, পরিচিত লোকের নৈকট্যে নিজেকে ব্যাহত করা। যেতে ইচ্ছে করে তার সেইখানে, এই ম্রিয়মাণ সন্ধ্যায়, সেই অপরূপ অপরিচয়ের দেশে, যেখানে সব লোকজন তার অচেনা, তাদের কথাবার্তা, তাদের ব্যবহার, তাদের হাসি-তামাসা, সেই আশ্চর্য, অসীম অজ্ঞানের রাজ্যে। অতএব কোথাও আর তার যাওয়া হয় না, সেই অজ্ঞাত রাজ্য খোঁজবার জন্যে সে আলোর কাছে বই নিয়ে বসে।

বই নিয়ে বসে কিন্তু মন পড়ে থাকে ঘরের দুয়ারে। যেন কে আসবে। আসবে অচেনা অন্ধকারে নয়, এই প্রত্যক্ষ দিবালোকে। আসবে বিপ্লবীর মতো। কোষমুক্ত তলোয়ারের মতো। আসবে নির্লজ্জ উন্মোচনে, তিমিরবিদারী সূর্যের সৎসাহসে। বলবে, আমরা সত্যের, সামঞ্জস্যের নই, আমরা মৃত্যুর, নয় মৃতকল্পতার।

স্কুল থেকে ফিরে, একদিন, চুল বেঁধে খোঁপায় কাঁটা ... চ্ছ, একটি মধ্যবয়স্কা অচেনা ভদ্রমহিলা আস্তে-আস্তে তার ঘরের দরজায় দেখা দিলেন। সঙ্গে তাঁর একটি তিন-চার বছরের মেয়ে, হাতে করে' একটা লম্বা লেবেনচুষ চুষছে।

ভদ্রমহিলা কুণ্ঠিত পায়ে চৌকাঠটা পেরিয়ে আসতে-আসতে বল্লেন, —আমি আপনার এই পাশের বাড়িতেই থাকি, একটু বেড়াতে এলুম।

বনানী মর্মরিত হ'য়ে উঠলো: আসুন, আসুন। তাড়াতাড়ি খোঁপায় দু'টো চড় দেবে বনানী দু'পাশে দু'খানা চেয়ার এগিয়ে দিলো: বসুন, বোসো খুকি। খুকিকে সে নিজে হ'য়ে নিজের হাতে তুলে চেয়ারে বসিয়ে দিলো।

মহিলাটি চেয়ারে বিস্তৃত হ'য়ে বসলেন। খরখরে চোখে চারদিক চরে' নিয়ে বল্লেন,—আপনি বুঝি এখানে একা আছেন?

—না, একা হ'লে আর পেরে উঠতুম কী করে? বনানী বসলো তার তক্তপোষের উপর সুজনি-ঢাকা বিছানায়: সঙ্গে একটা ঝি আছে।

—ও, সে তো একাই হ'লো। ভদ্রমহিলা তাঁর ভুরু তুললেন: আপনার বাবা-মা কেউ নেই?

—না।

—আর কেউ নেই? বলেন কী?

—আত্মীয়-স্বজনরা নানা দিকে এখানে-ওখানে ছিটিয়ে আছেন বৈ কি, কিন্তু আমার কাছে থাকবার মতো কাউকে দেখতে পাচ্ছি না।

তার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে' মহিলা চাপা, সন্দিগ্ধ স্বরে বল্লেন, —স্বামীর সঙ্গে বনিবনা হচ্ছিলো না বুঝি?

বনানী শিশুসুলভ সরলতায় হেসে উঠলো: নিজের সঙ্গেই বনিবনা হচ্ছে না বলে' এখনো বিয়ে করা হ'য়ে ওঠেনি।

ভদ্রমহিলা নাকি স্বরে ছোট্ট একটা আওয়াজ করলেন। বললেন,—এখানে মাস্টারি করতে এসেছেন বুঝি?

—হ্যাঁ।

—কোন ইস্কুলে?

—এই সুভদ্রা-গার্লস্ স্কুলে।

—সুভদ্রায়? ভদ্রমহিলা যেন সমস্ত গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলেন: ও ইস্কুলটা তো বিচ্ছিরি, একটুও ভালো নয়।

—কেন, কী করলো?

—ওটাতে নাচ-গান শেখায়? আমার প্রতিমাকে তো প্রথমে ঐ ইস্কুলেই দেবো ভেবেছিলুম, কিন্তু নাচ-গান শেখায় না জেনে পিছিয়ে গেলুম। মহিলা একটু নড়ে'-চড়ে' উঠলেন: আপনি আমার প্রতিমার নাচ দেখেন নি, সেই 'প্রলয়-নাচন নাচলে যখন'? দেবো, একদিন পাঠিয়ে দেবো প্রতিমাকে। বাড়িতে আর যখন লোকজন কেউ নেই।

বনানী মনে-মনে বিরক্তি চেপে রেখে মুখে স্নিগ্ধতা এনে বললে,—নাচ-গান জেনে কী হয়?

—কী হয় মানে? নাচ-গান না জানলে মেয়েদের আজকাল ভালো ঘরে বিয়ে হয় নাকি? ছেলেরা যে তাই আজকাল চায়।

বনানী কঠিন হ'য়ে বললে,—ছেলেরা কী চায় না-চায় সেই অনুসারেই মেয়েদের গড়ে' উঠতে হ'বে নাকি?

—ঠিক, ঠিক এই কথা আমার যতীশও সেদিন বলছিলো। ভদ্র-মহিলা ডগমগ হ'য়ে উঠলেন: এমনি বড়ো-বড়ো কথা সব সময়েই ওর মুখে লেগে আছে।

বনানী বোকার মতো তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলো।

—যতীশ, যতীশ আমার বড়ো ছেলে, সেণ্ট জেভিয়ার্সে, কথাটা

ভদ্রমহিলা সাড়ম্বরে উচ্চারণ করলেন : বি-এ পড়ছে। আপনি কদ্দুর পড়েছেন ?

বনানী হেসে বল্‌লে,—কষ্টেস্থষ্টে বি-এটা পাস করেছি।

—করেছেন ? কোন বছর ?

—গেলো বছর।

—ঠিক, যতীশও আমার ঐ গেলো বছরেই পাশ করতো। হঠাৎ পরীক্ষার আগে বলালে, দেবে না, ভালো তৈরি হয় নি। সেণ্ট জেভিয়ার্সে কিনা, তাই খুব কঠিন। ভদ্রমহিলা সন্তানগর্বে বিস্ফারিত হ'লেন। মেঝে-বিছানো খবরের কাগজের উপর টাল-করা বইয়ের দিকে সকৃপ চোখ চেয়ে তিনি বল্‌লেন,—আপনারো দেখি মেলা-ই বই আছে। ও গুলি কী বই ? সাহিত্য ?

—এই আছে নানা-রকমের।

—আর কিছু পরীক্ষা দেবেন বুঝি ?

—না, ওগুলো নেহাৎ বাজে বই। এমন ওদের দুর্ভাগ্য যে পরীক্ষার কোনো কাজে আসে না।

—যা বলেছেন। ভদ্রমহিলা যেন এতোক্ষণে একটা গুণগ্রাহী শ্রোতা পেলেন। আমার যতীশেরো তাই, ঠিক আপনার মতো। এই কেবল রাজ্যের বাজে বই পড়বার ঝোঁক। আর সে তো বই নয়, পাহাড়। আর রাতে-দিনে কী পড়াটাই না পড়ে, পড়তে-পড়তে ঘুমিয়ে পড়ছে, তবু বই ছাড়ছে না।

খুকিটি চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে।

ভদ্রমহিলা হঠাৎ কাছাকাছি হ'য়ে জিগ্‌গেস করলেন : আপনি নাচ-গান বুঝি কিছু জানেন না ?

বনানী শুক্‌নো মুখে একটু হাসলো : দেখতেই পাচ্ছেন। নইলে তো কোনদিন বিয়ে হ'য়ে যেতো।

খুকিটি পিছলাতে-পিছলাতে চেয়ার থেকে নেমে পড়লো।

ভদ্রমহিলা বললেন,—গানটাও জানেন না? সে কী কথা? গান-ও আবার কোন মেয়ে না জানে? ও তো একটা বিদ্যে।

বনানী যেন দুঃখে গলে' গিয়ে বললে,—সব বিদ্যেই কি সবার কপালে হয়!

খুকিটি গুটি-গুটি অগ্রসর হ'তে লাগলো।

সহানুভূতি করতে পেয়ে ভদ্রমহিলা যেন এতোক্ষণে আশ্বস্ত হ'লেন: তা যা বলেছেন। আমার প্রতিমা কিন্তু এ-বিষয়ে খুব ভাগ্যবতী। গানের কম্পিটিশানে ফার্স্ট হ'য়ে সোনার মেডেল পেয়েছে। উপাধিও পেয়েছে একটা—কী না বলে, গীতিকণিকা। বেশ উপাধিটা, না?

খুকিটি ততোক্ষণে দূরের টেবলটার নাগাল পেয়েছে। ব্রাউন-পেপারে মোড়া ছোট কেকটা খপ্ ক'রে' ধরে' ফেলে সে চেঁচিয়ে উঠলো: ওটা আমি খাবো।

বনানী ছুটে এগিয়ে গেলো: খাবে বই কি। প্লেটে করে' কেটে দিই, কেমন?

— না, কেকশুদ্ধ হাতটা সরিয়ে নিয়ে মেয়েটি কেঁদে উঠলো: সমস্তটা খাবো।

ভদ্রমহিলা গর্জন করে' উঠলেন: কী সর্বনেশে মেয়ে, বাবা। রাখো, রাখো শিগগির।

খুকিটি ভ্রূক্ষেপও করলো না।

— এই এক থালা পুডিং, গুচ্ছের সন্দেশ খেয়ে এসে বাজারের কেনা এই একটা কেক্ খেতে তোর ইচ্ছে হ'লো? ভদ্রমহিলা চেয়ার থেকে তার গায়ের উপর লাফিয়ে পড়বার একটা ভঙ্গি করলেন: হাঁগলি? দিদির কেক্ যে ওটা। বেচারি সারাদিন খেটে-খুটে এসে কোথায় একটা কিছু চিবোবে—তা না. বাগলি? রাখ. রেখে দে বলছি।

বনানী খুকির পাট-করা চুলের উপর হাত বুলোতে-বুলোতে স্নিগ্ধ গলায় বল্‌লে,—না, থাক্‌ না। তুমি খাও, খুকি। তোমার কী নাম?

কেকএর মধ্যে হাঁ-টা ডুবিয়ে দিয়ে খুকি বল্‌লে,—ছন্নি।

বনানী হেসে বল্‌ল,—ভালো নাম?

—ভালো নাম এখনো কিছু রাখা হয় নি। ভদ্রমহিলা একটু ক্লান্ত হয়ে বল্‌লেন: খুঁজছি। আপনার কিছু মনে পড়ে? বেশ একটা ঝক্‌ঝকে নাম। আপনার নামটি তো এখনো জানতে পারলুম না।

—আমার নাম? বনানী কী ভাবলে: আমার নাম ভারি বিচ্ছিরি, বড্ড সেকেলে। সে বলবার মতো নয়।

—তা যা বলেছেন। নামের আজকাল ভেজায় দাম। তবু বলুন না।

হেসে গড়িয়ে পড়তে-পড়তে বনানী বল্‌লে,—আমার নাম জগদম্বা। ঠাকুমা রেখেছিলেন।

ভদ্রমহিলা বিমর্ষ হ'য়ে গেলেন: ছি ছি, ঐ নামটা বদলে নিতে পারলেন না?

—বদলাবার আর সময় পেলুম কোথায়?

ভদ্রমহিলা আপাদমস্তক গম্ভীর হয়ে গেলেন। এইবার বোধকরি উঠতে হয়।

খুকি হঠাৎ তীব্র কণ্ঠে প্রতিবাদ করে' উঠলো: অমন বড়ো-বড়ো চোখ করে' আমার দিকে তাকাচ্ছ কী, মা? দিদি তো আমাকে সমস্তটা খেতে দিলো। কেমন দিদি, তুমি দাও নি?

ভদ্রমহিলা অসহায় মুখে বল্‌লেন,—সবটা খেয়ো না, অসুখ করবে। এই বেশ আছে, বাকি আদ্ধেকটা রেখে দাও, কাল খেয়ো। ওটা এখন রেখে তোমার সেই গানটা একবার দিদিকে শুনিয়ে দাও তো? সেই 'শেফালি তোমার।' কী সুন্দর যে গায়!

—তুমি গান জানো নাকি, খুকি? বনানী নিচু হ'য়ে তাকে আবার আদর করলো।

—শুধু গান? হাত তুলে-তুলে মাটির উপর লুটিয়ে-লুটিয়ে কেমন চমৎকার নাচে। তোমার সেই কীর্তনটা ধরো, সেই 'গোগিনী হইয়া যাবো সেই দেশে।' যোগিনীকে খুকি গোগিনী বলে। ভদ্রমহিলা আহ্লাদে একেবারে ফেটে পড়লেন।

কিন্তু খুকির যোগিনী সাজবার কোনো লক্ষণই দেখা গেলো না। হাতের কাছে যা সে পেয়েছে তা নিঃশেষ করে' তার অন্য কথা।

ভদ্রমহিলা উঠে পড়লেন। বাড়িটার আনাচে-কানাচে কড়ি-বরগা সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম পরীক্ষা করে' তিনি শুধোলেন: কতো ভাড়া দেন?

—টাকা পঁচিশেক হ'বে হয়তো, আমি ঠিক জানি না।

—খুব সস্তা তো? ভদ্রমহিলা খুকির হাত ধরে' আস্তে-আস্তে বেরিয়ে এলেন: এ-পাড়ায় বাড়ি ভাড়াটাই কিছু কম। আমাদের ওই বাড়ি দেখছেন তো? ওই যে রেডিও বাজছে। পচানব্বুই টাকা ভাড়া। যাবেন একদিন। প্রতিমার সোনার মেডেলটা দেখে আসবেন।

বনানী তাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলো।

ঘরে যখন সে ফিরে এলো, তখন, এমন মুখ করে', যেন সে এইমাত্র চিতায় তার কোন প্রিয়তম আত্মীয়কে পুড়িয়ে রেখে এসেছে। ঘরে জমছে সন্ধ্যার আবছায়া, যেন একটা মূর্তিমান অনর্থকতা।

বনানী টুক্‌রো-টুক্‌রো হ'য়ে বিছানার উপর লুটিয়ে পড়লো। যেন কত যুগ ধরে' সে রোগশয্যায় পড়ে' আছে। হে বিধাতা, রক্ষা করো, তাকে রক্ষা করো এই সভ্যতা থেকে, এই তার প্রতিবেশিতা থেকে। তাকে দাও অন্ধকার, ঘন নিঃশব্দতার অন্ধকার, বর্বর ভয়ঙ্কর অন্ধকার, শুধু আপনাকে নিয়ে থাকবার দুর্গম বন্যতা। বনানী অন্ধকারে হঠাৎ কেঁদে উঠলো। তুমি কোথায়?

দশ

সৌম্য আজকাল আপিস থেকে একটু দেরি করে'ই বাড়ি ফেরে, মানে, যতোটুকু আগে সে চেষ্টা করে' আসতে পারতো, ততোটুকু চেষ্টাও সে আর করে না। তার জায়গা যেন হঠাৎ ফুরিয়ে গেছে, আড্ডাটাও আজকাল তার ভালো লাগে না, ভালো লাগে না বই, সৌম্য তার শ্রান্ত শূন্যতায় একটুখানি বিশ্রাম-শ্যামল আশ্রয় খুঁজে বেড়ায়।

সিঁড়িতে পায়ের ভারি শব্দ করতে-করতে সৌম্য উপরে উঠে এলো। বসবার ঘর পেরিয়ে তবে শোবার। ঘরে অন্ধকার জমছে, পাতলা পিছল অন্ধকার, তার ভিতর থেকে ঘরের জিনিসপত্রগুলি দেখাচ্ছে অশরীরী, অস্পষ্ট কতোগুলি অনুভূতির মতো। দেয়ালগুলি যেন জীবনের শূন্যতার মতো দাঁড়িয়ে। খোলা জানলা দিয়ে বিশাল একটা ধূসরতার আভাস পাওয়া যাচ্ছে, মৃত্যুর অবিচ্ছিন্ন একটি মূর্ছার মতো। সৌম্য এক মুহূর্ত স্তব্ধ হ'য়ে রইলো।

হঠাৎ কোথা থেকে একটা শ্লথকায় সাপ যেন একরাশ শুকনো, ঝরা পাতার উপর উঠলো খসখসিয়ে।

ভয়ার্ত কণ্ঠে সৌম্য চমকে উঠলো : কে ?

যেন অন্ধকার কথা কইলো : আমি।

সৌম্য তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে স্যুইচ-অন্ করলে। সর্বাঙ্গে ঝলমল করে' কোণের একটা কৌচ থেকে বনানী উঠে দাঁড়ালো।

মানুষের ঔপম্যবোধ অদ্ভুত। সৌম্যর মনে হ'লো, সেই পলায়মান দ্রুত মুহূর্তে, বৃক্ষগহন বিশাল অরণ্য থেকে বেরিয়ে এলো একটা বাঘিনী, সমস্ত দেহে তার বলিয়ান মহিমা, প্রশান্ত সৌন্দর্য। সৌম্যর সমস্ত শরীর যেন আকস্মিক ভয়ের আনন্দে রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠলো।

—বাবাঃ, কতোক্ষণ ধরে' চুপ করে' বসে' আছি। বনানী ঘরের সমস্ত আলো যেন বন্ধুতায় আর্দ্র করে' তুললো: আপনার ফিরতে এতো দেরি হয়?

—কই, না, দেরি হয়েছে নাকি? সৌম্য যেন জাহাজ থেকে মাটিতে এসে নামলো: আপনি আসবেন সেটা তো কখনো ভাবিনি।

—কী করে' ভাববেন? বনানী যেন বহু-দূর-থেকে-দেখা উদার, উদাস দৃষ্টিতে সৌম্যর দিকে চেয়ে রইলো। তাকে এই পোশাকে কেমন দৃঢ়, উদগ্র দেখাচ্ছে। ফ্ল্যানেল্‌এর ট্রাউজারটা নিখুঁত অসংকোচে নেমে এসেছে, কড়া কলারটা গলার সঙ্গে বসেছে নিটোল আঁট হ'য়ে, টাইটার কী স্পর্ধিত তীক্ষ্ণতা। এমন দুঃসহ দীপ্তি, যেন কোথাও এতোটুকু আঙুলের ছোঁয়া সইবে না। সমস্ত শরীর যেন প্রচ্ছন্ন চঞ্চলতায় স্থির, সংহত হ'যে রয়েছে। বনানীর মনে হ'লো, সৌম্য যেন ঠিক মানুষ নয়, মানবীয় একটা জন্তু, বলিষ্ঠ, পেশল, বিস্ফার। মুহ্যমান দৃষ্টিকে হাসিতে সহসা তরল করে' এনে বনানী আগের কথাটাকে প্রসারিত করলো: শেষকালে পালিয়ে না এসে আর পথ পেলুম না। প্রতিবেশীরা সদলবলে হঠাৎ আমাকে তাড়া করেছে।

— কেন, কী হ'লো?

—আর বলবেন না! পাশের বাড়িতে একটি মা আছেন, তিনি তাঁর মেয়ের নাচ আমাকে দেখাবেনই। বনানী বিরক্তিতে কুঁকড়ে গেলো: একেবারে মরে' গেছি, আমাকে বাঁচান।

সৌম্য হেসে উঠলো, দ্রুত গলায় বল্‌লে,—বসুন। আমি বদ্‌লে আসছি।

সৌম্য শোবার ঘরে সরে' গেলো।

সমস্ত পোশাকে ঢিলেঢালা একটা বাঙালীয়ানার শৈথিল্য নিয়ে যখন সে ফের ফিরে এলো, দেখলো আলো-জ্বালা ঘরের অন্ধকার সেই

কোণটিতে বনানী সঙ্কীর্ণ হ'য়ে বসে' আছে। অন্ধকারে খুব গভীর জলের যে একটা চমৎকিত দীপ্তি আছে, সেই দীপ্তিতে বনানী যেন শান্ত, ভারি হ'য়ে আছে। সৌম্য চেয়ারে না বসে' দূরে টেব্‌লের ধারে ভর দিয়ে দাঁড়ালো। বল্‌লে,—কেমন আছেন?

—তবু যা হোক জিগ্‌গেস করলেন। বনানী ছায়াময়, ভারি দু'টি চোখ তুলে তার দিকে তাকালো: এমনি মন্দ ছিলুম না, কিন্তু নেইবাসে'র জ্বালায় অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছি। মানুষের সঙ্ঘবদ্ধতার এই হচ্ছে দোষ। সব সময়ে আমাদের জীবনে এই ভদ্র সামাজিকতার বিষ ফুটিয়ে দিচ্ছে।

—তাই বুঝি পালিয়ে এলেন আরেক ভদ্রতার কোটরে? সৌম্য দুর্বল একটু হাসলো।

—কী করি বলুন, বনানী সহজ পরিচিতির সুরে বল্‌লে—যদি আপনি একদিনো না যান। সময় পান না শুনেছিলুম, কিন্তু এসে দেখি, ততো মারাত্মক কিছু সময়াভাব নয়। যদি ধরিত্রি, বনানী মুখে আবার ভাবের বিচ্ছিন্নতা নিয়ে এলো: মনে না করেন, গিয়ে পড়লে সত্যি-সত্যি সময়টা মাটি হ'বে।

সৌম্য আমতা-আমতা করে' বল্‌লে,—এই যাবো-যাবো করছিলুম ক' দিন থেকে।

—যাবেন। বনানী আবার সাদাসিধে পরিচ্ছন্ন গলায় বল্‌লে,—ঠাকুমা এসেছেন।

—এসেছেন নাকি?

—হ্যাঁ, আপনাকে দেখবার জন্যে তিনি ভারি ব্যস্ত। বনানী হাসলো: আপনাকে মানে শিপ্রার বরকে।

—ও, আমাকে নয়?

—তা ছাড়া আবার কী? বনানী নির্লিপ্ততায় দুরূহ হ'য়ে উঠলো:

সামাজিক জীব হিসেবে আমাদের আর কী পরিচয় আছে বলুন? আমি অমুকের মেয়ে, আপনি অমুকের স্বামী, শিপ্রা অমুকের স্ত্রী। সমাজের মাঝে আমরা কতো সঙ্কীর্ণ, কতো খণ্ডিত হ'য়ে থাকি। কিন্তু ছেড়ে দিন আমাদেরকে আমাদের নিজেদের মধ্যে, জীবনের একাকী, নির্জন এই চেতনার অন্ধকারে, বনানীর চকিত চোখ অন্ধকারে একবার জ্বলে' উঠলো: আমরা খুঁজে পাবো না আমাদের সীমা, আমাদের বিস্ময়।

সৌম্য বল্লে,—সেই বিচিত্র সীমা পাবার জন্যেই তো আমরা সামাজিক বন্ধনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছি।

—সত্যি কথা। বনানী চঞ্চল হ'য়ে উঠলো: কিন্তু তাতে হয়েছে এই, আমরা অনেকের স্তূপীকৃত কতোগুলি কাটা-কাটা অংশ হয়েছি মাত্র, সম্পূর্ণ 'আমি' হ'য়ে উঠতে পারি নি, নির্জন, নির্লিপ্ত আমি। সমাজের স্রোতে আমরা কতোগুলি ভাসা-ভাসা ফুল মাত্র, কিন্তু নিজের অন্ধকারে আমরা মাটির তলাকার প্রচ্ছন্ন শিকড়ের মতো রহস্যময়।

বনানীকে সৌম্যর যেন কেমন ভয় করতে লাগলো। অরণ্যচারী হিংস্র পশুর মতো সে যেন তার শরীরের অন্ধকারে তার বন্য দূরত্ব নিয়ে বসে' আছে, ভয় করতে লাগলো সেই দূরত্বের বন্যতা।

কিন্তু যা দূর তাই আবার যখন ঘনিষ্ঠ মনে হয়, মনে হয় ব্যবধানহীন। ঘনাশ্রিত আকাশের মতো। সৌম্যর মনে হয় বনানীর এই রহস্যপুঞ্জিত শরীর যেন শুধু ভয় দিয়ে তৈরি নয়, আনন্দ দিয়ে, লীলালাবণ্যের জলে কেলি-কৌতুকের ঢেউ দিয়ে তৈরি। মেঘের মাঝে শুধু বিদ্যুৎ-বজ্রই নেই, আছে বৃষ্টির সমর্পণ, বৃষ্টির শীতলতা। স্নেহচক্ষু শ্যামলতার প্রতিশ্রুতি।

কিন্তু যা সন্নিহিত তাই আবার দূরতম। যা হাতের কাছে তাই আবার হাহাকারের কাছাকাছি। যা সঙ্গসঙ্গীতমুখর তাই আবার স্পন্দনহীন, নিঃশব্দ-নির্জন।

সৌম্য আবিষ্টের মতো বললে,—কিন্তু সেই নির্জনতায় আপনি কী করবেন? কী পাবেন?

—ঐ তো আপনাদের সামাজিক ব্যাধি, করা আর পাওয়া। বনানী কঠিন হ'য়ে বললে,—আমি শুধু হ'বো। আমি হ'বো শুধু নিজে, নির্জন নিজে।

—কী করে' বা হ'বেন যদি কিছুই আপনি না করেন সত্যি সত্যি?

—আমি তো বিশেষ কিছু হ'বো না যে তার জন্যে আমাকে বিশেষ কিছু করতে হ'বে। বনানী অশরীরী একটা ছায়ার অস্পষ্টতায় যেন নিজেকে মুছে ফেললে: আমি শুধু ভেসে যাবো, বা ভাসিয়ে দেবো নিজেকে ধাবমান জীবনের জলে, যেখানে আমাকে নিয়ে যায়, রিক্ততার যে গভীর অন্ধকারে।

শূন্য চোখে তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে সৌম্য বললে,—এ কী রকম জীবন?

—এই তো জীবন। যেখানে আমি যেটুকু প্রতিধ্বনিমান হ'য়ে উঠি, সেই তো আমার বাঁচা। বনানী ম্লান গলায় বললে: ইচ্ছে করে'ই কি আমি কোনো একটা নমুনায় নিজেকে নিয়ে যেতে পারি? আর পারলেও, সেটা তো একটা নমুনাই হ'বে মাত্র, আমি কোথায়? আমি মুছে ফেলবো আমার মন, আমার ইচ্ছে, পরিপূর্ণ ছেড়ে দেবো আমাকে বিরাট এই অন্ধকারের অজানায়। বনানী অদ্ভুত হেসে উঠলো।

ঘরের মধ্যে আরো আলো থাকলে যেন সৌম্য নিশ্চিন্ত বোধ করতো। বনানীর হাসির প্রতিশব্দে সে-ও অসহায় হেসে উঠলো। বললে,—আপনি তা হ'লে কিছু জানবেন না, কিছু বুঝবেন না?

বনানী বললে,—যতো জানবো ততোই তো জানবো যে কিছুই জানা হয় নি। কী আমার আর বোঝবার আছে বলুন, আমার এই

আমি ছাড়া। তা-ও, যখনই বুঝতে যাবো, তখনই ফেলবো নিজেকে ছোট করে'।

গিরধারী ট্রে-তে করে' চায়ের যাবতীয় সরঞ্জাম নিয়ে এলো।

বনানী ক্ষিপ্রতার একটা দীপ্তি বিচ্ছুরিত করে' উঠে দাঁড়ালো। বল্লে,—সরুন, চা-টা আমি তৈরি করছি।

সৌম্য অনায়াসে সরে' গেলো, বস্‌লো দূরে, একটা ইজি-চেয়ারে। বনানী তার এই রমণীয় পরিমিতি পেতে সে-ও যেন পেলো তার একটা স্বাভাবিকতার স্বস্তি। বনানী যেন তাকে তার সমতল প্রাত্যহিকতা থেকে কোন এক অতীন্দ্রিয়, অনির্ণেয় অন্ধকারে নিয়ে এসেছিলো, যেন কোন পাহাড়ের চূড়ায় উঠে দেখছিলো সে একটা অনাবিষ্কৃত, অনন্বুসন্ধিত মহাসাগর। বনানী হঠাৎ তার সাংসারিক নারীশ্রীতে রূপান্বিত হ'য়ে উঠতেই সে যেন তার চারপাশে আবার খুঁজে পাচ্ছে একটি পরিচিত উষ্ণতা, ঘন একটি অচ্ছেদনীয় শান্তি। চাম্‌চেয় করে' পট-এর লালচে জলটা একটু নাড়তে-নাড়তে বনানী জিগ্‌গেস করলে: স্ট্রং করবো?

সৌম্য ভরাট গলায় বল্লে,—হ্যাঁ।

চায়ের একটা বাটি তার চেয়ারের হাতলের উপর রেখে বনানী বল্লে,—দেখুন, মিষ্টি হয়েছে কিনা।

চায়ের রঙের দিকে চেয়ে থেকেই সৌম্য বল্লে,—হয়েছে। কিন্তু আপনার চা কই?

—এই যে নিচ্ছি।

—খাবারের প্লেটটাও নিয়ে আসুন।

বনানী একটা খালি টিপাই এগিয়ে দিয়ে খাবারের প্লেটটা রাখলো।

সৌম্য বল্লে,—আপনিও নিন কিছু।

—অসম্ভব। বনানী তার চায়ের বাটিটা হাতে করে' ওধারের দিকে তার কৌচে গিয়ে বসলো।

—তা কী করে' হয়? সৌম্য বন্ধুতায় স্নিগ্ধ গলায় বল্‌লে,—আপনাকে ফেলে একা খাই কী করে'?

চায়ে ঠোঁট ডুবিয়ে যতোদূর নিঃশব্দে সম্ভব ছোট্ট একটি চুমুক দিয়ে বনানী বল্‌লে,—ঐ তো আপনাদের দুর্বল, অসার ভদ্রতা। নিন্ এই ছোট্ট দৃষ্টান্তটা। আপনি আপিস থেকে ফিরেছেন, ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত—আপনার এখন স্থূল কিছু খাদ্য চাই—সেখানে তো আপনি একা। তার কাছে আপনার আর-কিছুতে দ্বিধা করবার কথা নয়। লজ্জা হচ্ছে ভদ্রতার একটা কুৎসিত উপসর্গ।

সৌম্য কুণ্ঠিত হ'য়ে বল্‌লে, তবে আপনি চায়ের পেয়ালাটাই বা নিলেন কেন?

—তার চমৎকার উত্তর আছে। বনানী নিচু সোপানো-তে হেসে উঠলো: চা খেতে আমার ভালো লাগলো এই বিন্দুতমো মুহূর্তটির জন্যে এই আমার চরমতমো ভালো লাগা। তাই আপনার মতের পর্যন্ত অপেক্ষা করি নি। আপনার মৌখিক, ভদ্রতাগন্ধ সমর্থনের আগে আমার ভালো-লাগাটাই আমার বেশি।

সৌম্য হেসে বললে,—দয়া করে' খাবারের প্লেটটাতেও একটু ভালো লাগান না?

বনানীর হাসি আরেক পর্দা উঠে গেলো: রক্ষে করুন। আপনি যেমন একা আপনার ক্ষুধায়, আমিও তেমনি আমার ক্ষুধামান্দ্যে। যা আমাদের ভালো লাগে না তাই আমাদের পাপ, আর যা ভালো লাগে তাই আমাদের পূর্ণতা, আর পূর্ণতাই হচ্ছে পুণ্য। তার কাছে আর-সমস্ত বিবেচনা একেবারে অবাস্তব।

দু'জনকে ঘিরে কল্লোলিত হ'য়ে উঠলো স্তব্ধতার গহনতা। সৌম্যর ভয় করতে লাগলো। যেন মনে হ'লো তার সমস্ত সঙ্কীর্ণ সীমা-রেখা সে-স্তব্ধতায় মুছে যাচ্ছে, সমুদ্রের ঢালু পাড়ে বালির চিহ্নের মতো।

মনে হ'লো সে-স্তব্ধতায় তার যেন একটা স্থির সংজ্ঞা নেই, সে যেন অসীমচিহ্নিত, অবর্ণিত একটা শুভ্রতা। জীবনের অনেক-কিছু যেন তার এখনো অজানা, এখনো অন্ধকৃত, সেই অননুমেয় অপরিচয়ের ভয়ে সৌম্যর সমস্ত অস্তিত্ব যেন ভীত, শিহরিত হ'য়ে উঠলো।

চেয়ে দেখলো একবার বনানীর দিকে। আবার মনে হ'লো পাহাড়ের চূড়ায় বসে' সে যেন অস্পষ্ট ক'রে প্রসারিত পৃথিবীর ধূসর বিশালতা দেখছে। দেখলো তা'র দুটি সবলবর্ধন হাতে নিষ্ঠুরতার একটা দীপ্তি, তার বসবার সমস্ত ভঙ্গিটিতে একটা পাশব গাম্ভীর্য, তার চামড়ার বুনটে গভীর অন্ধকারের শাণিত উজ্জ্বলতা। সৌম্যর ভয় করতে লাগলো, আবার সেই অশরীরী, অস্পর্শনীয় ভয়। তার কঠিন একটা কোন বাহ্যিক অস্তিত্ব নেই, অথচ পঙ্কের গন্ধের মতো যেন তা শোঁকা যাচ্ছে। ভয় করতে লাগলো তার এই চুপ ক'রে বসে থাকার অসহায়তাকে। তার মাঝে যে এতো স্তব্ধতা ছিলো সেই প্রথম আবিষ্কারের অসহনীয়তাকে। মনে হল এই স্তব্ধতা তাকে ঠেলে দিচ্ছে, ঠেলে নিচ্ছে অতলস্পর্শ সমুদ্রের মৌনে, স্পর্শের সমুদ্র। উদ্ধত অনিবার্যের মতো। কোথাও বাধা নেই, বিরোধ নেই, শুধু একটি প্রোজ্জ্বল প্রতীক্ষা, নিশ্চল নিমন্ত্রণ।

কথা, কথা, সৌম্য যা হোক একটা কিছু কথা ক'য়ে' উঠবার জন্যে ছটফট করতে লাগলো। ঘরের জাজ্বল্যমান আলোটা যেন এই অন্ধকারকে, এই কথা-না-বলার অন্ধকারকে, স্পষ্টতায় আরো ভয়াবহ ক'রে তুলেছে। কথা, কথা, ছোটখাটো অবান্তর কথা, শিপ্রার কথা, শিপ্রার প্রতি তার অজস্র স্নেহের কথা, সৌম্য যেন এই অনাবৃত প্রখর, প্রবল স্তব্ধতা থেকে তার ভদ্রতার ভালো-মানুষির খোপে নেমে আসতে পারলে বাঁচে। উন্মুক্ততার এতো ভার যেন বওয়া যায় না।

সৌম্য ডেকে উঠলো: গিরধারী!

গলায় কথা পেয়ে সে যেন এতোক্ষণে নিশ্বাস ফেলতে পারলো। ফিরে পেলো তার পুরোনো, স্বাভাবিক অনুপাত।

গিরধারী এদিকে-ওদিকে ঘুরঘুর করছিলো, কাছে এসে দাঁড়াতেই সৌম্য বললে,—নিয়ে যা এগুলো।

জিনিসগুলি কুড়িয়ে গিরধারী চলে' গেলে বনানী বললে,—এ সময়টা আপনি কী করেন?

—সাধারণতো কিছুই করি না।

অনেক কথা বলে' ফেলে বনানী যেন একটু ক্লান্ত হয়েছে, তার সমস্ত মুখাভাসে এসেছে এখন একটি নিবাভ ধূসরিমা। শান্তিতে গভীর চোখ মেলে বললে,—কোথাও যান না বেড়াতে?

সৌম্য যেন বনানীর অদৃশ্য ছোঁয়া পেয়ে আকস্মিক খোঁয়াটে হ'য়ে উঠেছে। বললে,—যাবার জায়গা কোথায়?

—পড়েন?

—সারা দিনের খাটুনির পর আবার পড়া? সৌম্য নিরর্থ মুখে হাসলো: বসে'-বসে' শুধু দেখি।

—কী দেখেন?

—জানলায় বসে'-বসে' রাতের রঙিন কলকাতা। অদ্ভুত, সৌম্যর কথার আড়ালে এমন যে একটা আশ্চর্য সুর ছিলো তা সে নিজেই কোনোদিন শোনে নি: শুনি তার ভাসা-ভাসা শব্দের টুকরো।

—আচ্ছা, আপনার কি সত্যিই মনে হয় না, বনানী অটল, সতেজ দীর্ঘতায় উঠে দাঁড়ালো: যে আমাদের এই দেখা ও শোনা, ছোঁয়া ও অনুভব করারো অতীত একটা চেতনা আছে? শুধু দেখে ও শুনে, শুঁকে ও ছুঁয়ে আমাদের জীবন আমরা নিঃশেষ করতে পারি না?

—হ'বে হয়তো, কিন্তু, সৌম্যও একটা ক্ষিপ্রতার ভঙ্গি করলে: আপনি এখুনি উঠলেন নাকি?

—হ্যাঁ, এবার যাই আর-কি। ঠাকুমার দূত হ'য়ে এসেছিলুম, তাঁর মেসেজ্ তো আপনাকে পৌঁছে দিয়েছি।

—চলুন, আপনাকে একটু এগিয়ে দিয়ে আসি। কাঁধের উপর সৌম্য তাড়াতাড়ি একটা চাদর কুড়িয়ে নিলো।

বনানী উঠে দাঁড়াতেই সৌম্য'র দৃষ্টি আকর্ষণ করলো তার শীতাবরণের স্বল্পতা। তার শাড়ি পরবার ধরনে এমন একটা সবল, নির্মম শ্রী আছে, পা ফেলায় এমন একটা ঋজু স্বতঃস্ফূর্ততা, সমস্তটা আবির্ভাবে এমন একটা ক্ষিপ্র, অথচ তাপহীন ঔজ্জ্বল্য যে, তাকে, তার ব্যক্তিকতাকে, যেন এক মুহূর্তের জন্যেও অস্বীকার করা যায় না, প্রতিরোধ করাও কঠিন হ'য়ে ওঠে। সে যেন, সৌম্যর মনে হ'লো, সেই শব্দ-স্পর্শ-রূপ-গন্ধের অতীত একটা অসমাপ্তি দিয়ে তৈরি। তাকে ধরলেও যেন সে ধরার অতীত হয়ে থাকবে। তাকে বন্দী করে রাখলেও সে হয়ে থাকবে মুক্তির সংকেত, সংকীর্ণ অঙ্গনের উপরে আকাশের ঠিকানা। তাকে পেয়ে ফেললেও ফুরিয়ে ফেলা যাবেনা। সে অসম্পূরনীয়া। সে শেষ করবে অথচ নিজে শেষ হবেনা। সে এখন চলে' যাক। সে এখন চ'লে' গেলে সৌম্য যেন তার সুস্থ পরিমিততায় উত্তপ্ত হ'তে পারে।

রাস্তায় নেমে এসে সৌম্য জিগ্গেস করলে: এখন বাড়ি গিয়ে কী করবেন?

তার স্বরটা যেন ভীষণ ভদ্র শোনালো।

—কিছু ঠিক কী বলা যায়? বনানীর গলা যেন যান্ত্রিক, একটু বা কর্কশ।

দুয়েক পা কাটলো নিঃশব্দে। সৌম্য কেন যে তার সঙ্গে আসছে কে বলবে?

বনানী বিরক্ত হ'য়ে বল্লে,—আপনাকে মিছিমিছি আর কষ্ট করতে হ'বে না। এবার ফিরুন।

—না, এই কতোটুকু আর রাস্তা।

—আমি জানি। আমি এটুকু একাই যেতে পারবো। ঠাকুমাকে এখন পাবেন না, এতোক্ষণে তিনি নিশ্চয় ঘুমিয়ে পড়েছেন।

—আচ্ছা, নমস্কার। পাহাড়ের উপর থেকে নিচে পড়তে-পড়তে সৌম্য নিজেকে সামলে নিলে।

এগারো

কিন্তু কেনই বা সৌম্য যাবে না? শিপ্রা বারণ করে' দিয়েছে, এবং সেই কারণে এতোদিন সে সত্যি যায় নি বলে' তার দস্তুরমতো হাসি পেতে লাগলো। শিপ্রা যদি এখন বারণ করে' দেয় যে সে রঙিন টাই বাঁধতে পারবে না, পারবে না সিঁথি কাটতে, পান খেতে, ভালো কাপড় চোপড় পরতে, তবে তার সেই আবদারো রাখতে হ'বে নাকি? শিপ্রা কী অসহ্য ছেলেমানুষ। শুধু ছেলেমানুষ। শুধু ছেলেমানুষ নয়, রীতিমতো খাপ্পাপ, সে সেখানে গেলেই যেন শিবের জটায় গঙ্গা যাবে শুকিয়ে, ভূমিকম্পে পৃথিবী যাবে রসাতলে। শিপ্রার এমন একটা অন্যায় অনুরোধ যে সে কেন এতোদিন মান্য করতে গিয়েছিলো তার কারণ সে নিজেই খুঁজে পেলো না। নিজের উপর, [illegible] দুর্বলতার উপর, তার বিক্কার উপস্থিত হ'লো। তা ছাড়া, সত্যি ভেবে দেখতে গেলে, শিপ্রার এখন আর কিছু নালিশ করবার থাকতে পারে না— বনানীর ঠাকুমা তাকে দেখতে চেয়েছেন। শিপ্রা যখন যায়, সমস্যাটা এমন চেহারা নিয়ে দাঁড়ায় নি, ঠাকুমার দিক থেকেও যে একটা তাগিদ আসতে পারে সেটা দেখেনি তার কল্পনায়।

আর, এমনিতেই, সেখানে যাবে না কেন? সেখানে গেলে তার ভালো লাগবে, ভালো লাগবে বনানীর সঙ্গে কথা কইতে, ভালো লাগবে কথা আবার না কইতে, ভালো লাগবে তার উপস্থিতির সুবিশাল সেই শান্তি, ভালো লাগবে তার দূর নির্লিপ্ততা। সে খুঁজে পাবে তার জীবনের আরেকটা নতুনতরো সুর, নতুনতরো স্বাদ—তার পরিচয়ের পরিধি যাবে বেড়ে, নিজের পরিচয়ের: নিজেকে দেখবে সে আবার নতুনতরো পরিপ্রেক্ষিতে। উড়োজাহাজে করে' অনেকটা ফাঁকা

জায়গায় সে ঘুরে আসবে, যেখান থেকে মাটি অনেক দূরে, চারধারে যেখানে শূন্যময় অশারীরিকতা। তার ভালো লাগবে, যেমন যখন সবুজ বৃষ্টি নামে ধান-ক্ষেতের উপর, যেমন শরীরের ক্লান্তির পর ঘনিয়ে আসে ঘরে ফিরে আসা গোধূলির ধূসরতা। যদি তার ভালো লাগে, যদি ভালো লাগে তার পৃথিবীর কারু কোনো ক্ষতি না করে', তবে কেন সে এইটুকু, শুধু এইটুকু ভালো দিয়ে তার জীবনের ক'টি রিক্ত মুহূর্তকে ভরিয়ে তুলবে না? কী যে মূর্খ যুক্তি থাকতে পারে এর প্রতিবন্ধনে, সৌম্য তো ভেবে হয়রান।

শুধু তার নিরপেক্ষ ভালো লাগবে বলে' নয়, তবু, এমনিতেই, তাকে সেখানে যেতে হ'বে। সোজা কথা, না গিয়ে সে পারবে না। থাকতে পারবে না সে কিছুতেই এই একাকী আর্ত আত্মনিমগ্নতায়, যখন তার জন্তে আর-কোথাও পুড়ছে একটি অন্ধকার, জ্বলছে একটি সহানুভূতি। তাকে যেতে হ'বেই। যেন তার অবচেতনার মাঝে একটা ডাক এসেছে, রাত্রির গভীর স্তব্ধতার ডাক। তার অস্ফুট প্রতিধ্বনিমানতায় পাচ্ছে সে নতুন ভাষা, যা এতোদিন তার সাংসারিক অভিধানের কোনো পৃষ্ঠায় লেখা ছিলো না। যাবে, নেহাৎ না-যাওয়ার কোনো মানে হয় না বলে'।

যাবে, যদি এক সময়, সময়েরো অজানতে, স্তব্ধতার দেশ থেকে চলে' আসে স্পর্শের সমীরণ। চন্দ্রমার লেখা যদি পরিণাম পায় তরল পৌর্ণমাসীতে। কে জানে কোন স্বর্গের দ্বারোদ্ঘাটন হবে। দিন যাপনের বদলে ফিরে পাবে জীবনবহনের চরিতার্থতা। শুধু হৃদয় দিয়ে কী হবে, যদি না থাকে বুদ্ধির প্রসাধন, ব্যক্তিত্বের প্রদীপ্তি। শুধু ক্ষুধা মেটানোই তো নয়, চাই স্বাদ, ব্যঞ্জনে নুন, রক্তে তীক্ষ্ণতা, নিজেকে প্রসারিত করার পরিবেশ।

সৌম্য একটু সজ্ঞানে সাজগোজ করলো। মন যে তার খুশি হয়েছে

সে-কথা শরীরকে সে অবাধে জানতে দিলে। পিছন থেকে অদৃশ্য ভ্রূভঙ্গি ক'রে শিপ্রা তাকে একটু দেখছে হয়তো, কিন্তু ভদ্রতার খোলসটা মানুষ এর চেয়ে হাল্‌কা করে কী ক'রে', সমস্ত শরীরে প্রচ্ছন্ন একটা প্রত্যুত্তর দিয়ে সৌম্য সগর্বে বেরিয়ে গেলো।

ঝি এসে দিলো দরজা খুলে। বনানী ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো—আশ্চর্য, তার হাতে একটা খুন্তি।

—এই যে, শেষ পর্যন্ত সময় ক'রে এসে পড়েছেন যা হোক্। ঠাকুমার কী ভাগ্যি।

—ও কী, রান্না করছিলেন বুঝি? পিছনে দরজাটা ভেজিয়ে সৌম্য ভিতরে চলে' এলো।

—হ্যাঁ, আপনাকে সম্বর্ধনা করতে নয়। আসুন, রান্নাটা আমি নামিয়ে আসছি। বনানী পরদা সরিয়ে ঘরের বাইরে পা দিতে-না-দিতেই চেঁচিয়ে উঠলো: ও ঠাকুমা, দেখবে এসো কে এসেছে।

বনানী এবার তার ঠাকুমাকে নিয়ে ঘরে এলো। শীতে ঝরে' পড়ে' গেছে সব শুকনো পাতার ভার, রিক্ত শাখায় বিশীর্ণ একটা গাছের মতো ঠাকুমাকে দেখালো। ঝরে' গেছে সব মাংসল আবেগ, স্নায়ব বিহ্বলতা—জীবনের সমস্ত কিছু অবাস্তর আতিশয্য, গাছের প্রচ্ছন্ন, প্রোথিত ক'টি শিকড়ের মতো রয়েছে ক'খানা হাড়, জীবনের শেষতম অস্তিত্বের শুচিতা। ধোঁয়া নেই, তাপ নেই, দাহ নেই, দীপ্তি নেই, তবু একটা শিখা, জীবনের পবিত্রতম অভিব্যক্তি। অভিজ্ঞতা দিয়ে বাঁচা নয়, রোমাঞ্চ দিয়ে বাঁচা নয়, শুধু বাঁচতে হ'বে বলে' বাঁচা। বাঁচার মাঝে এমন একটা দুঃসহ নিস্পৃহতার রূপ দেখে সৌম্য ক্ষণকাল সম্মোহিত হ'য়ে গেলো।

ঠাকুমাকে সে প্রণাম করলে।

তার চিবুক ধরে' একটি চুমু খেয়ে তাঁর মুখের নির্দন্ত দীপ্তিতে ঠাকুমা

বল্লেন,—তোমার মুখখানা দেখবার জন্যে কতোদিন থেকে হা-পিত্যেশ করছি।

বনানী টিপ্পনি কাটলো: একপক্ষ প্রত্যাশা করলেই তো হয় না, অন্য পক্ষেরো সময় পাওয়া চাই যে।

ঠাকুমা সৌম্যর পক্ষ হ'য়ে বল্লেন,—কী করে'ই বা পাবে? প্রকাণ্ড চাকরি করছে না? কতো মাইনে পাও?

বনানী বল্লে,—নিঃসংকোচে বলুন। আমি সরে' যাচ্ছি।

সৌম্য অনায়াসে বল্লে,—এখন, চার-শো'র কিছু ওপরে।

—খুব সুখের কথা। বেঁচে থাকো। শিপ্রা আমাদের ভারি পয়মন্ত। পা দিতে না-দিতেই ঘর-দোর সে লক্ষ্মী-শ্রীতে ভরে' তুলেছে।

—কিন্তু, বনানী স্মিতমুখে প্রতিবাদ করলো: শিপ্রার আসবার আগে থেকেই ওঁর চাকরি।

—হ'লোই বা। ঠাকুমা বল্লেন,—লক্ষ্মী মেয়ে না হ'লে কি আর দু'হাত ভরে' এতো ঐশ্বর্য পেতে পারে কখনো? তুমি বোসো, বাবা, দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

—কী আশ্চর্য, বনানী দুই চোখের অসহায় একটি ভঙ্গি করে' বল্লে,—সামনে চেয়ার দেখেও আপনি বসতে পাচ্ছেন না? মুখে আবার তা বলতে হ'বে? দেখুন, আগেই কিন্তু বলে' রাখছি, ভদ্রতার মৌখিকতায় আমি বেশি মুখর নই।

—না, না, বসছি। সৌম্য হেলান-দেয়া নিচু একটা বেতের মোড়ায় বসলো, শরীরের সহজ, শীতল শিথিলতায়।

ঠাকুমা ঈষৎ ঝাঁজালো গলায় বল্লেন,—তুই সংসারের কোন জিনিসটা জানিস? তারপর সৌম্যর দিকে চেয়ে গলা নামিয়ে: তুমি এই লক্ষ্মীছাড়িটার একটা ব্যবস্থা করে' দিতে পারো, বাবা? কতো ভালো-ভালো চাকুরের সঙ্গে তোমার চেনা।

সৌম্য একটু থতিয়ে বল্‌লে,—কী ব্যবস্থা ?

—আর কী ব্যবস্থা ! বনানী খিল্‌খিল্ করে' হেসে উঠলো : যাতে একজনের ঘরে পা দিতে-না-দিতেই তার ঘরটা ঐশ্বর্যে একেবারে উথলে দিতে পারি। নিজের ঘরটাতে শত দাপাদাপি করে'ও কিন্তু কিছু করতে পারলুম না।

—হাসছিস কী ? ঠাকুমা নিজেই হেসে ফেললেন : তোমাকে আপনার লোক ভেবেই বলছি, দেখো না চেষ্টা করে', ওর একটা কিছু গতি করতে পারো কিনা ?

—কিন্তু তা হ'লে তোমার কী গতি হ'বে, ঠাকুমা ? বনানী দুই হাতে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরলো।

—আহা ! কেন, নাত-জামাই আমাকে মাস-মাস গোটা কয়েক টাকা তুলে দিতে পারবে না ? কী বলো ? আমি চলে' যেতুম তখন কাশীতে।

—তোমার নাত-জামাইয়ের ভারি বয়ে' গেছে, আদ্যিকালের কোন এক বদ্যিবুড়ির জন্যে পয়সা খরচ করতে যাবে !

—কেন, তুই আছিস না পোড়ারমুখি ?

—আমি তো এই-ই আছি, ঠাকুমা।

—আহা, আমারই জন্যে যেন ওর বিয়ে করা হচ্ছে না !

বনানী আবার হাসির অনর্গলতায় পিছল হ'য়ে উঠলো : ইস্, আমি যেন তোমারই কথা ভেবে বিয়ে করছি না ! আমার বিয়ে যদি সত্যি হ'তোই, তবে আমি যেন আর এই বুড়ির জন্যে বসে' থাকতুম !

—তবে, এতো সম্বন্ধ এলো, এতো ভালো-ভালো সম্বন্ধ, একটাতেও তুই রাজি হ'লি না কেন ?

ঠাকুমার পাকা চুলে আদর করতে-করতে বনানী বল্‌লে,—ও-সব তা কতোগুলি সম্বন্ধই, ঠাকুমা, একটাও সম্পর্ক নয়।

ঠাকুমা কৃত্রিম রোষে তাকে একটা ঠেলা দিয়ে বল্লেন,—যা, অনেক হেসেছিস, যতোদিন আছি, ততোদিন এই হেসেই জ্বালাবি। এখন যা, সৌম্যকে কিছু খাইয়ে দে। বলতে-বলতে নিজেই তিনি অন্তর্হিত হ'লেন।

বনানী সৌম্যর দিকে লঘু এক-পা এগিয়ে এসে বল্লে,—আপনাকে একটা নতুন, অদ্ভুত জিনিস এনে দি, খাবেন? ঠিক ভদ্রতায় হয়তো পড়ে না।

সৌম্য তার দিকে, তার শিহরায়মান এই লঘুতার দিকে চেয়ে থেকে শুধোলে: কী?

—আমি যা রাঁধছিলুম। মাছ-ভাজা। চাঁদা-মাছ সমুদ্রের। চমৎকার স্বাদ। দাঁড়ান, নিয়ে আসি।

বনানীর আজ অন্য রকম সুর, তার এই ঘেরা দেয়ালের দেশে। তার সমস্ত লঘুতা নিয়ে সে যেন একটা উড়ন্ত পাখি, তার দূরত্বে আজ অভিনব আকাশের ব্যঞ্জনা। পরনের শাড়িটিতে সেই তীব্র পারিপাট্য নেই, তার চিত্তের চমকিত চঞ্চলতা যেন ভাজে-ভাঁজে ছড়িয়ে পড়েছে। তার মাঝে যে আবার এমন একটা শুভ্র স্বাভাবিকতা আছে এ কথা সৌম্য কবে বিশ্বাস করতে পারতো? কে জানতে পারতো তার মধ্যে আছে আবার এই সীমাবদ্ধ সংসারের সুর? ঈগল পাখি দুই ডানা ছুঁড়ে উড়ে গেছে সমুদ্রের উপর দিয়ে, আবার ফিরে আসছে তার গিরিনীড়ে, পর্বতশিখরের রিক্ত আশ্রয়ে। সংসারের সুরটিও তার উচ্চগ্রামে বাঁধা। কড়িকাঠের নিচে খড়কুটো কুড়োনো সে সামান্য বিলাপভাষী ঘুঘু নয়।

—কী ভাবছেন? প্লেট্এ করে' কড়কড়ে-ভাজা কতোগুলি মাছের টুকরো নিয়ে বনানী ঘরে ঢুকলো: মনে মনে ঠাকুরে পাত্রদের সন্ধান করছেন বুঝি?

—যদি মত দেন, সৌম্য সবিনয়ে একটু হাসলো: জোগাড় করে' আনতে পারি বৈ কি।

—জোগাড় করে' পাত্র পাওয়া যায় বটে, বনানী একমুহূর্তে আবার দুরূহ হ'য়ে উঠলো: কিন্তু জোগাড় করে' কখনো পূর্ণতা পেতে পারি না। যা পাওয়া যায় তাই বড়ো নয়, যা পেতে হয় তাই বড়ো। আমার মাঝে সব সময়ে এই একটা নিষ্ক্রিয় প্রস্তুতি আছে। কিন্তু, বনানী প্লেটটা টেবিলের উপর নামিয়ে রেখে বললে,—এখন এগুলো খান, আমি চা করে' আনছি।

সৌম্য তার দিকে কুটিল করে' চেয়ে বললে,—কিন্তু এগুলো খেতে তো আমার ভালো না-ও লাগতে পারে?

ইশারাটা বনানী বুঝলো। হেসে বললে,—আপনার ভালো না লাগে, আমার যে ভীষণ ভালো লাগবে আপনাকে খাইয়ে। এখন এ তুচ্ছ ভালোলাগার প্রতিযোগিতায় কে জেতে দেখুন।

কথাটা যে সেদিন এই ভাবে বলা যেতো সৌম্যর মনেই হয়নি। কাঁটা ছাড়িয়ে মাছের একটা টুকরো সে মুখে পুরলো।

বনানী চা নিয়ে এলো, একবাটি তার নিজেরো জন্যে। বসলো দূরে, তার শোবার খাটের কিনারে, দেয়ালে হেলান দিয়ে। তার দেহের ভঙ্গীর বঙ্কিমায় একটি অনুচ্চারিত অন্তরঙ্গতা।

সাহস পেয়ে সৌম্য জিগগেস করলো: আপনি কোনোদিন বিয়ে করবেন না বুঝি?

—পাগল। বনানী ভঙ্গির আলস্যটিকে ব্যস্ত করে' তুললো: এ কথা আপনাকে কে বললে? খুব ভালো লাগলে বা নিতান্ত ভালো না লাগলে যে কোনো মুহূর্তে বিয়ে করে' ফেলতে পারি। কিন্তু সে সব কথা নিয়ে মাথা ঘামাবার আমার-আপনার কারুরই কোনো দরকার নেই, মাছগুলি সব সাবাড় করুন।

—না, আর খেতে পাচ্ছি না। সত্যি পাচ্ছি না। সৌম্য চায়ের বাটিতে চুমুক দিলে।

বনানী বল্‌লে,—এ-বিষয়ে আমার পাকাপাকি কোনো মত নেই, থাকতে পারেও না, আমি নিজের কাছেই ভীষণ অস্পষ্ট। এবং মনে হয় সব মানুষই কম বেশি তাই, তাদের নিজেদের কাছে। কখন কে কী হ'য়ে উঠি কেউ বলতে পারে না। অতএব কে কী করবো বা না-করবো তা নিয়ে কথা বলতে গেলে কখনোই সত্য কথা বলা হ'বে না। আমি কি জানি আমার সমগ্র সম্ভবনীয়তাকে, কখনো জানি, আমারই মাঝে কতো অজ্ঞেয়, কতো অপ্রাপ্য, কতো অনাবিষ্ক্রিয় আমি আছি? বনানী আবার তার ভঙ্গিটিকে অলস প্রশ্রয়ে নমনীয় করে' আনলো। একটু-বা করুণ করে' চেয়ে বল্‌লে,—অন্য কথা বলুন, ব্যক্তিগত কথা আমার একটুও ভালো লাগে না। নিজের মাঝে কেমন যেন ছোট হ'য়ে থাকি।

তারপর তাদের মাঝে শুরু হ'লো অনেক কথা, অনেক মুখরিত নৈঃশব্দ্য। সৌম্যই বেশি উৎসাহ দেখালো। সে জানতোও না যে এতো কথা সে জানতো, এতো কথা ছিলো তার বলবার। বই আর দেশ, এমন-কি স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের ছোটখাটো পরিভাষা—ব্যাক্‌টিরিয়াম্‌ ও ভিটামিন্‌। যতো বাজে কথা, খুঁটিনাটি কথা, সময় কাটাবার অসাময়িক কথা। এমন কথা, যাতে তার নিরর্থকতার আবহাওয়ায় একটি সুদূরসঞ্চারী বন্ধুতা আসে ঘনিয়ে, পরস্পরকে ছুঁয়ে-ছুঁয়ে যা মিলিয়ে যায় বিস্মৃতিতে। সৌম্য যেন আরেকটা নতুন জগৎ খুঁজে পেলো, তার শব্দ ও স্তব্ধতা দিয়ে তৈরি। খুঁজে পেলো নিজেকে উদ্‌ঘাটিত করবার নতুন সূচীপত্র, সেই নিদর্শনে সে যেন আরেকটা পৃষ্ঠা উল্‌টোলে তার নতুনতরো আয়তন, নতুনতরো অনুপাত। সে যে শুধু একটা মাত্র ব্যক্তিত্ব দিয়ে তৈরি নয়, তার মাঝে আছে যে

একটা বিশাল বিরোধিতার বৈচিত্র্য, পেলো সে নিজের সম্বন্ধে সেই অপূর্ব চেতনা। দেখতে-দেখতে সে যেন বদ্‌লে গেলো, অস্তমিততা থেকে নতুন সূর্যোদয়ে, যেন পেলো আবার একটি আরম্ভের প্রবলতা।

কথার বিচ্ছুরিত কোমলতায় বনানী উদ্বেল হ'য়ে উঠেছে। কথার নির্মল জলের মধ্যে ফুটে উঠছে দু'-একটি করে' তার হাসির সফেনতা। সমস্তটি আবহাওয়া কথায় উষ্ণ, ঘন হ'য়ে এসেছে। কথার তাপে কোথা দিয়ে যে সময় যাচ্ছে গ'লে', শীতের রাত আলস্যে এসেছে সঙ্কীয়মান হ'য়ে, কারুরই কোনো খেয়াল নেই। দুই অন্ধকার স্তব্ধতার মাঝে ফেনায়িত হ'য়ে উঠেছে কথার উজ্জ্বল জলধারা।

আর কী নিয়েই বা কথা। পাখিদের নিজেদের ম্যালেরিয়া হয়, ইঁদুরের হয় ক্যান্‌সার, শস্যদের মধ্যে দেখা দেয় সংক্রামক রোগ। যে-মশাতে ম্যালেরিয়া হয় তারা মেয়ে-মশা। এই জীবাণুতত্ত্ব থেকে আবার কী কৌশলে তারা সাহিত্যে এসে পড়ে। সত্যি, সাহিত্যের কোনো চরিত্র দিয়ে আমরা প্রভাবিত হ'তে পারি কিনা। অসম্ভব, সাহিত্য পড়ে' আমরা ততোটুকুই পাই যা আমাদের নিজেদেরই ভাবের প্রতিধ্বনি, ততোটুকুই হই, আমরা এমনিতেই যা হতুম, ঠিক ততোটুকুই। তারপর চলে' যায় বা ঐশ্বরিক জিজ্ঞাসায়। মানুষ ঈশ্বরের, না, ঈশ্বরই মানুষের পরম রচনা। মরলে কী হয়, সৌরমণ্ডলের এই এক অণু পৃথিবীতেই আমাদের আয়ুর অঙ্কপাত কিনা। কথা, কথা, অগণন কথা।

সৌম্য হঠাৎ এক সময় চঞ্চল হ'য়ে বলে' উঠলো: রাত অনেক হ'য়ে গেলো। এবার আমি যাই!

—যাবেন এখন। বনানী চোখের দীর্ঘ একটি আলস্যে তাকে আর্দ্র করে' তুললো: এতো তাড়া কিসের?

—না, কোনো বিশেষ তাড়া নেই বটে। চাদরটা সৌম্য কাঁধের থেকে চেয়ারের পিঠের উপর আবার ছেড়ে দিলো।

বনানী বল্লে,—যদি অবিশ্যি ভালো না লাগে, তবে কব-খানা আর থাকতে বলবো না।

—শেষকালে বোধকরি তাড়িয়ে দিতেই আপনার ভালো লাগবে। সৌম্য সপৌরুষ শক্তিতে হেসে উঠলো।

কথা এসে আঘাত পেলো এই স্তব্ধতার পাথরে। চারদিকে একটা নিঃশব্দ মূর্ছা। কুয়াশায় সব যেন কেমন অস্পষ্ট, অবাস্তব। [illegible] সব আলো, বাড়ির দেয়াল, ক্লান্তিকর রাস্তার একাকীত্ব। [illegible] এই অবাস্তবতায় তারাও যেন ধীরে-ধীরে ডুবে যাচ্ছে। এক [illegible] কথা বলা দরকার, কিন্তু একজন আরেকজনের মুখের দিকে চেয়ে,—কে কথা কইবে?

কথা নেই, কথা নেই।

কথা নয়, এবার যেন কিসের প্রত্যাশা। তীক্ষ্ণতার স্তব্ধতার পাষাণে নতুন কী শিলালিপি। যার জন্যে কোনো জিজ্ঞাসা নেই কোনো প্রতিরোধ নেই। বিচার বিবেচনার ঊর্ধ্বে আদিম প্রতিপাদন।

মনে হ'লো, ঘরে যেন একজন ছাড়া আরেকজন কেউ নেই। হাত বাড়িয়েও কেউ কাউকে যেন খুঁজে পাবে না, সমস্ত ঘর অন্ধকারে মুছে ফেললেও না। তুমি কোথায়? আত্মার গভীর অন্ধকার থেকে দুজনেই আর্তনাদ করে উঠছে, কিন্তু নিজের কান্নায় আরেকজনের কান্না শুনতে পাচ্ছেনা। শুধু প্রশ্নই করছে, উত্তর নেই। শুধু প্রতীক্ষাই করছে, নেই আবির্ভূতি।

দ্বিতীয় খণ্ড

বারো

রাতে আয়নায় মুখ দেখা বারণ—শিপ্রা আজকাল সেই কুসংস্কার মানে না, মানবার তার সেই বয়েসও যেন আর নেই—নিচু, নতুন ড্রেসিংটেব্‌ল-এর সামনে ছোট, চৌকো একটা টুলে বসে' শিপ্রা চুল বাঁধছিলো। অনেক দিন পরে তাকে আমরা দেখলুম : তার খোকা এখন পুরো তিন মাসের। খাটভরা প্রকাণ্ড, পুরু বিছানাটার মাঝখানে আরেকটি ছোট বিছানায় রঙিন মশারির নিচে কাঁথা বালিশের ভিড়ে খোকা এখন ঘুমিয়ে পড়েছে। এতোক্ষণে শিপ্রা নিজেকে নিয়ে বসবার একটু সময় পেলো। বাবাঃ, এইটুকু মাংসের একটা ড্যালা, তার কী চেঁচানি! চোখে দেবে না একটু কাজল পরাতে, শুধু একটা জামা পরাতে গেলেই যতো অনাছিষ্টি। থাকতে চায় কেবল বুকের গরমে, আদরের ঠাণ্ডায়।

যতো কষ্টে তাকে ঘুম পাড়িয়ে শিপ্রা এতোক্ষণে এই চুল বাঁধতে বসলো। দু' দিনে ঘর দোর সে কিছুই গুছিয়ে উঠতে পারে নি, নিচে উপরে এখনো সব এক হাঁটু। চারদিকে সব অমিছিল, এলোমেলো ধুলো লেগে লেগে খাটের বার্নিশটা পর্যন্ত চটে' গেছে। এখনো কতো তার গুছানো বাকি, সামান্য ক্যালেণ্ডারের তারিখ পর্যন্ত এতোদিন বদলানো হয় নি, তাকের উপরকার ছোট টাইমপিস্‌টা রয়েছে বন্ধ হ'য়ে। আশ্চর্য, সৌম্য এতোদিন করছিলো কী? কড়িকাঠের কিনারে ঠুকরে ঠুকরে ফোকর করে' দু'টো চড়ুই পাখি দিব্যি বাসা করেছে, দেয়ালের ফটোগুলি রয়েছে বেঁকে, তাদের পেছনে মাকড়সারা বুনেছে জাল। দু' দিনে সে কতো গুছোবে? তার ছেলে যেমন কাঁদুনে, তাকে সামলাতেই তার দিন কেটে যায়, রাতেরো প্রায়

অনেকখানি। তবু চোখে যা প্রথম উৎকট ঠেকেছিলো, সব সে এরি মধ্যে কিছুটা সায়েস্তা করে' নিয়েছে। আলনার তলায় জমেছিলো ময়লা কাপড়ের বাঁড়ি, সারিয়েছে তক্ষুনি ধোপা ডাকিয়ে: চেয়ার টেবিলগুলো ছিলো আপন মনে এখানে-ওখানে ছড়ানো, সব সে নিয়ে গেছে তাদের পুরোনো পরিধিতে: আলমারির দরজা দু'টো তো সে এসে খোলাই দেখতে পেয়েছিলো। আশ্চর্য, এতো বিশৃঙ্খলাই বা এলো কোত্থেকে? ঘর-দোরের যা হয়েছিলো, ঠিক একটা বাউণ্ডুলে, উড়নচণ্ডি চেহারা। এ ঘরে যেন কেউ থাকে না, শোয় না, দিবা রাত্র হাত পা তুলে নৃত্য করে। নিচেও কম উপদ্রব হয় নি, কোথায় বা ডালের হাঁড়ি, কোথায় বা কয়লা ভাঙবার হাতুড়িটা। আলোর বাল্‌ব্ গেছে দু'টো ভেঙে চায়ের সেটটা গেছে কানা হ'য়ে। সে ছিলো না, তার মানে এতোদিন যেন এ বাড়ির নিচেটা একটা পোড়ো ভূতের বাড়ি হ'য়ে ছিলো। লক্ষ্মীর গায়ের চল্‌টা উঠেছে, জগন্নাথের ছবির জমকালো রাঙ্‌তা আরশুলা খেয়েছে চেটে। এ দু' দিনে যতোদূর সাধ্যি ঘর-দোরের সে একটা শ্রী ফিরিয়েছে, কিন্তু এর চারপাশে আগেকার সেই সুস্থ স্থির, স্মিত প্রসন্নতা আনতে যেন এক যুগেও কুলোবে না। আর, বলতে কি, তার শরীরেও যেন আর দিচ্ছে না।

আয়নায় তার চেহারা দেখে শিপ্রা নিজেই কেমন চমকে উঠলো। এর আগে এতোদিন এ-আয়নায় তাকে এমন চোখে দেখবার তার অভ্যেস ছিলো না। চিরুনি চালাচ্ছে আর সঙ্গে-সঙ্গে উঠে আসছে এক মুঠো করে' শুকনো চুল, চুলের সেই শ্রীহীনতা সমস্ত মুখে এনে দিয়েছে বিশীর্ণ একটা বিষাদ। সমস্তটা মুখ শুকিয়ে কেমন লম্বাটে দেখাচ্ছে, নাকটা উঠেছে ঠেলে। ভুরু দু'টো কেমন কুঁচকে নুয়ে এসেছে, চোখের চারপাশে গভীর করে' কালি বুলোনো। হায়, আয়নাটা পর্যন্ত বদলে গেছে। নিজের চেহারা দেখে শিপ্রার নিজেরই ভারি মায়া করছে

লাগলো। তার সন্তানের জন্যে তাকে আর কম মূল্য দিতে হয় নি। সমস্তটা শরীর কেমন ধ্বসে' গেছে, গা-টা সব সময় কেবল ছ্যাক্-ছ্যাক্ করছে, চামড়া এসেছে খস্‌খসে, নিষ্প্রভ হ'য়ে। নেই আর সেই পিচ্ছল দীপ্তি, সেই পূর্ণস্ফূর্ত উচ্ছলতা। চর জেগেছে, তাই নদী এসেছে মরে'। ফল এসেছে, তাই ফুল ঝরিয়ে দিয়েছে তার পাপড়ির পরিচয়। জ্বলেছে যখন আগুন, তখন তলাকার ছাইয়ের দিকে কে তাকায়?

তার শরীরের এই হাল দেখে সৌম্য আপিস থেকে ফিরেই অমনি ছুটেছে ডাক্তারের বাড়ি। প্রথম দিনটা কোনো রকমে তাকে দাবিয়ে রাখা গিয়েছিলো, কিন্তু এই ঘুষ্‌ঘুষে জ্বরটা নাকি ভালো নয়, সৌম্যকে আর থামানো গেলো না। ভীষণ বাড়াবাড়ি। আপনিতেই তার সেরে যেতো, তার এই পুরোনো পরিবেশের উত্তাপে, তার এই স্নেহঘন শয্যার শীতলতায়। মানুষের টাকা থাকলে কতো বাজে কাজেই যে তা উড়োনো চলে। খোকার জন্যে একটা আয়া রেখে দেয়া হয়েছে, সেটার তবু একটা মানে হয়। কিন্তু ক'দিনের একটুখানি জ্বরের জন্যে শহর তোলপাড় করে' ডাক্তার নিয়ে আসতে হ'বে, যাই বলো, এটা একটা অত্যাচার। সত্যি, তার এই রহস্যময় অলৌকিক দেহটা যান্ত্রিক তথ্যসন্ধিৎসার অধীনে নিয়ে আসতে হ'বে ভেবে শিপ্রা যেন মনের একটা অশুচিতা অনুভব করছে। যেন তার কাব্যসৃষ্টিকে নিয়ে আসছে সে ব্যাকরণের বিচারে।

কিন্তু উপায় নেই, তার রূপের চেয়ে প্রয়োজনীয় এখন স্বাস্থ্য। তার আর তো সময় নেই যে, নিজের খুশিতে বয়ে' যাবে নিজের শরীরের ঢেউয়ে, এখন তার শরীরের অতল শীতলতায় নেমেছে একটি সমর্পণের শান্তি। সে আর এখন নিজের জন্যে নয়: সে উৎসর্গীকৃত। তার জীবনের উদ্বৃত্ততার ঐশ্বর্যে সে এখন সমারূঢ়। তার আর এখন সময় নেই পাতার শ্যামল প্রসারণে. সে চলে' গেছে মূলে, মাটির গভীর

অন্ধকারে, তার নিজের মহান অতিক্রান্ততায়। তাকে ছেড়ে তার এই অতিবিক্ততার বিস্ময়ে। নিজেকে এই নতুন করে' সৃষ্টি করবার আয়োজনে।

ফিতেটা দাঁত দিয়ে চেপে ধরে' শিপ্রা লতিয়ে-লতিয়ে বেণী করছিলো, সামনের আয়নায় পড়লো কা'র আবখানা ছায়া। শরীরের সেই বিহ্বল ডৌল দেখেই শিপ্রা তাকে এক নিমেষে চিনে ফেললো, টুল ছেড়ে উঠলো লাফিয়ে।

—এ কী, তুমি এলে কবে? বনানী খুশিতে ঝিলিক দিয়ে উঠলো।

—এই তো পশু। শিপ্রার গলা কেমন ভেজা, ঠাণ্ডা।

—তোমার চেহারা এ কী বিচ্ছিরি হয়ে গেছে, শিপ্রা? বনানী যেন আঁৎকে উঠলো: শক্ত কিছু অসুখ করেছিলো নাকি? তোমাকে এই শোয়ার ঘরে দেখতে না পেলে আমি তো তোমাকে চিনতেই পারতুম না। কী হয়েছিলো?

শিপ্রা ম্লান একটু হেসে রঙিন মশারিটির দিকে আঙুল তুলে ইশারা করলে: ঐ যে।

—ও কী, তোমার ছেলে হয়েছে নাকি? বনানী তাড়াতাড়ি সেই ছোট্ট মশারির উপর ঝুঁকে পড়লো। ফিরে এসে বললে,—কী? ছেলে?

মধুর একটি লজ্জায় ভিজে উঠে শিপ্রা বললে,—হ্যাঁ।

—কই, আমাকে তো কেউ বলে নি। বনানী ঘরময় চোখ বুলিয়ে খোকার অস্তিত্বের ছোট-ছোট চিহ্নগুলি দেখতে লাগলো: আমি তো এতোদিন এ কিছুই জানতুম না। ইস্, তুমি যে ভারি রোগা হ'য়ে গেছ।

শিপ্রা একটা চেয়ার এগিয়ে দেবার চেষ্টা করতে গেলো; বললে,—দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বোসো।

—না, বসবো না। বনানী আকস্মিক একটা দ্রুততার দীপ্তি আনলে: আমার এক্ষুনি এক জায়গায় যেতে হ'বে। সৌম্যবাবু কোথায়? বাড়ি আছেন?

গম্ভীর হ'য়ে শিপ্রা বল্‌ল,—না বোধহয়।

—নেই? বনানী এগিয়ে গিয়ে বাবার ঘরের দরজার পরদাটা তুলে ধরলো: সে কী কথা? তাঁর সঙ্গে আমার যে একটা জরুরী কাজ ছিলো। ভুলে গেলেন এরি মধ্যে? বনানী আবার আলোয় ফিরে এলো: কোথায় গেছেন বলতে পারো?

—তা আমি কী ক'রে' বলবো?

—বা, তুমি বলতে পারো না? বনানী হাসলো: আপিস থেকে ফিরে সাধারণতো এতো তাড়াতাড়ি তো তিনি কোথাও বেরুন না। সত্যি, তুমি জানো না?

শিপ্রার গলায় প্রচ্ছন্ন একটু ঝাঁজ পাওয়া গেল: কোথায় উনি যান না-যান আমাকে সব সময় ব'লে' যান নাকি?

—আচ্ছা, এলে বোলো আমি এসেছিলুম। বনানী যাবার জন্যে চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌লো।

শিপ্রা সঙ্গে সঙ্গে ভাঙা পায়ে এগিয়ে এসে বললে,—বসে' যাও না একটুখানি। উনি এক্ষুনি হয়তো এসে পড়বেন।

—না, আমার বসবার একটুও সময় নেই। বনানীর দরজার বাইরে চলে' গেলো: মনে ক'রে' তুমি বোলো কিন্তু, ভুলো না। বনানী খট্‌খট্‌ ক'রে' জুতোর গোড়ালির শব্দ করতে-করতে নিচে গেলো নেমে।

ঘরের স্তব্ধতাটা ভারি একটা পাথরের মতো শিপ্রার বুক চেপে ধরলো। আলোটা যেন নিঃশব্দ একটা অট্টহাসির মতো জ্বলছে। ঘরের দেয়ালগুলো অন্ধকারে যাচ্ছে গলে'। শিপ্রা খানিকক্ষণ

প্রেতায়িত, সাদা একটা ছায়ার মতো দাঁড়িয়ে রইলো, রাগ বা দুঃখ কিছুই যেন তার বোধ নেই।

বনানী তা হ'লে আজ এই প্রথম এ-বাড়িতে আসছে না। তার আসা-যাওয়ার মধ্যে কেমন একটা অবাধ স্বাচ্ছন্দ্য, সিঁড়ির প্রতিটি ধাপ তার গোনা, দরজা-জানালাগুলি মুখস্থ। ঘরের সমস্ত হাওয়া তার পথ ছেড়ে দেয়, দেয়ালগুলি কেমন পরিচিত চোখে তার দিকে চেয়ে থাকে। না, এই প্রথম আসছে না সে। শিপ্রা যে এখানে এসেছে এই খবরটা ঘূণাক্ষরেও তার কানে ওঠে নি। তবু, এমনি সে এসে পড়েছিলো যেমন সে প্রায়ই এসে থাকে, যেমন সে এতোদিন এসেছিলো শিপ্রার অনুপস্থিতির অবকাশে। না, তার জন্যে সে আসে নি, এলে, এমন একটা ঝাপ্টা মেরে চলে' যেতো না, কিছুক্ষণ হয়তো বসতো, এতোদিন পর দেখা, গল্প করতো হয়তো গলা নামিয়ে। আশ্চর্য, স্পষ্ট করে' তো সে বলে'ই গেলো কা'র কাছে এসেছিলো—তবু এতো সন্দেহের কী দরকার! শিপ্রার চোখ-মুখ জ্বালা করে' উঠলো। না, সে এই নতুন আসে নি, তার আজকের এই পলায়মান দ্রুত বিদ্যুতের পিছনে সঞ্চিত হ'য়ে আছে অনেক মন্থরতার মেঘ। এই ঘরের হাওয়ায় শিপ্রা যেন অনুভব করলো অনেক তাদের ঘনতার সৌরভ, অনেক তাদের নির্জন উষ্ণতা। অথচ এই তাদের এতো মেলামেশার মধ্যে সৌম্য একদিনো বলেনি, ভুল করে'ও বলে নি শিপ্রার এই নতুন সৌভাগ্যোদয়ের কথা। যেন কথাটা কতো লজ্জার, সেটাকে চেপে রাখাই ভালো। বিরাট পৃথিবীতে সে যেন একটা নেহাৎ অপ্রয়োজনীয়, অবাস্তব ঘটনা—এতে তাদের কোনোই রুচি নেই, আকর্ষণ নেই, এতে তাদের কিছু এসে যায় না। কতো মা'রই তো ছেলে হচ্ছে—এ আবার কে মনে রেখে কা'র কাছে বলতে যাবে? বলে নি, শিপ্রা এতোদিন ধরে' কী ভয়ানক ভুগছে, জ্বরে-জ্বরে কেমন শুকিয়ে আসছে সে একটু-একটু করে'। হ্যাঁ,

বলবার মতো একটা কথা বটে! কা'র না কা'র একটু জ্বর হয়েছে, সেই তাপ কেউ আবার তার মনের মধ্যে পুষে রাখে! তার চোখের সামনে যখন স্বাস্থ্যের এমন একটা পুষ্পিল উজ্জ্বলতা, নির্মেঘ নির্মল নীলিমা। বয়ে' গেছে তার অসুখের কথা বলে' সেই রুপোলি আবহাওয়াটাকে ঘোলা করে' তুলতে। শিপ্রার সমস্ত শরীর ঘৃণায় পিছল হ'য়ে উঠলো। আর সেই জন্যে, তার এই অসুখ হয়েছে বলে' বনানী তার উপর কী অপরিমেয় সদয়। তাকে কে এই অধিকার দিয়েছে তাকে এই সহানুভূতি দেখাতে? আর কী তার উদ্ধত ঘৃণা! তার খোকাকে সে একটু ছুঁলো না পর্যন্ত। এমন একটা ভাব দেখালো যেন সে একটা পোকার চাইতেও কুৎসিত। এতে তার বিন্দুমাত্র কৌতূহল নেই, দেয়ালের ফাটলে সামান্য একটা চারাগাছ দেখে সে এর চেয়ে বেশি আকৃষ্ট হয়। তার সেই বনানী-দি! আজ শুধু মুখের একটা ভদ্রতা করতে পর্যন্ত যার সময় হয় না। দিব্যি তাকে হুকুম করে' চলে' যায়—তার পদার্পণের খবরটা যেন স্বস্থানে সে পৌঁছে দেয়! আর, আশ্চর্য, সেই হুকুম কিনা তাকে আজ মানতেই হবে।

কতোক্ষণ কেটে গেছে কে জানে, সৌম্য ফিরলো ডাক্তারের বাড়ি থেকে। শিপ্রা জানলার কাছে উঁচু, বাঁধানো জায়গাটায় চুপ করে বসে' আছে, ঘোমটা পড়েছে কাঁধের উপর ভেঙে, ঢল্‌ঢলে খোঁপায় মুখখানি দেখাচ্ছে ভারি করুণ, দুই চোখে যেন কতো রাতের অনিদ্রা।

সৌম্য তার কাছে এগিয়ে আসতে-আসতে খুশি, দরাজ গলায় বল্‌লে,—ডাক্তারকে কল্ দিয়ে এলুম, কাল রবিবার এগারোটার সময় আসবে।

দেয়ালের সঙ্গে লেপ্‌টে মিশে যেতে-যেতে শিপ্রা আর্ত কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলো: খবরদার, ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না আমাকে।

—কেন, কী হ'লো? সৌম্য একেবারে স্তম্ভিত।

—সরে' যাও এখান থেকে। সরে' যাও বলছি। •

চারদিকে তাকাতে-তাকাতে সৌম্য সরে' দাঁড়ালো।

শিপ্রা উঠলো খেঁকিয়ে : তোমার লজ্জা করে না, লজ্জা করে না তোমার ডাক্তারের বাড়ি যেতে ?

সাত-পাঁচ কিছু ঠাহর করতে না পেরে সৌম্য হতভম্ব হ'যে বল্‌লে,—কেন, কী হয়েছে ?

– কী হয়েছে! পাশবিক ঘৃণায় শিপ্রার সমস্ত মুখ কুৎসিত হ'য়ে এলো : তোমার এতো সব জরুরী কাজ, আর তা ফেলে তুমি শখ করে' ডাক্তারের বাড়ি বেড়াতে গেছ ? লজ্জা করে না ?

—আমার আবার কী কাজ! সৌম্য বিড়বিড় করতে লাগলো : তোমার অসুখ, ডাক্তারের বাড়ি যাওয়া ছাড়া আমার আর এখন কী জরুরী কাজ থাকতে পারে ?

—আহা, ন্যাকা! উনি জানেন না ওঁর কী জরুরী কাজ। শিপ্রার জিভটা লক্‌লক্ করে' উঠলো : এদিকে বাক্স যে যাচ্ছে তলিয়ে। যাঁর সঙ্গে জরুরী কাজ তিনি যে আজ এসেছিলেন।

সৌম্য মূঢ় চোখে চেয়ে রইলো : কে এসেছিলো ?

—আহা, কে এসেছিলো যেন উনি জানেন না! সে যেন আজ এই নতুন আসছে।

—বা, নাম না বললে চিনবো কী করে' ?

শিপ্রা সর্বাঙ্গে জ্বলে' উঠলো : নাম কি আর তুমি জানো ? নাম কি তোমার কারুর মনে থাকে ?

—এ তো ভারি মুস্কিলের কথা হ'লো দেখছি। সৌম্য অল্প একটু পায়চারি করে' নিলো : মাথা ঠাণ্ডা করে' নামটা স্পষ্ট বলে' ফেললেই হয়।

শিপ্রা জানলা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো : তুমি জানো না, সত্যি করে'

বলো, তুমি জানো না, তোমার কাছে কে আসে, কার এমন বরাবর ওপরে উঠে আসবার সাহস আছে? জানো না, জানো না তাকে? তবু তো, আমি এসেছি, এ-কথা সে এখনো শোনে নি। সে তো তোমার কাছেই এসেছিলো রোজ, রোজই তো আসে। তাই, তাই আমার ঘর-দোর এমন এলোমেলো, জায়গার জিনিস জায়গায় খুঁজে পাই না। জানো না, তাকে জানো না বৈ কি!

সৌম্য ক্লান্ত হ'য়ে একটা চেয়ারে বসে' পড়লো। আচ্ছন্ন গলায় বল্লে, কে, বনানী এসেছিলো বুঝি?

—আহা, নাম না বললে কী আর চিনতে পারবে! শিপ্রা বিদ্রূপে বিষাক্ত গলায় হেসে উঠলো: নামটা তো দেখছি মধুর মতো জিভে লেগে আছে।

—এ-সব তুমি কী বলছ যা-তা? সৌম্য ম্লান গলায় প্রতিবাদ করলে।

আমি তো যা তা বলবোই। সে যে তোমার কাছে জরুরী কাজের জন্য এসেছিলো। শিপ্রা ধারালো গলায় ধম্‌কে উঠলো: যাও না, যাও না, ঠাঁট করে' আর এখানে বসে' আছো কেন? রাজ্য যে ওদিকে ভেসে যাচ্ছে।

সৌম্য গম্ভীর হ'য়ে বল্লে,—কোন কাজটা আমার বেশি জরুরী তা তোমাকে আর বলে' দিতে হ'বে না। আমি নিজেই ভালো বুঝতে পারবো।

—এতোদিন ধরে' খুব ভালো করে'ই তো তা বুঝেছ। শিপ্রা হঠাৎ বিছানার উপর ভেঙে পড়লো।

সৌম্য তাড়াতাড়ি উঠে তাকে দু'হাতের মধ্যে টেনে নিলে।

শিপ্রা উঠলো মুঠোর-মধ্যে ধরা পাখির মতো ছটফট করে': ছেড়ে দাও, আমাকে ছুঁয়ো না বলছি, যাও না, যেখানে তোমার

বেশি ভালো, যে তোমার বেশি জরুরী। এখানে মরতে পড়ে' আছো কেন ?

সমস্ত শরীরে বিষণ্ণ হ'য়ে এলেও সৌম্য কণ্ঠস্বরে উত্তাপ নিয়ে এলো : তুমি আমার কথাটা যে একেবারে উল্‌টো বুঝলে। এমনি তোমার রাগ! আমি কী বললুম আর কী শুনলে!

—না, রাগ হ'বে না! সুখে আমি ধেই-ধেই করে' নাচবো। ছাড়া পাবার জন্যে শিপ্রা আবার কতোগুলি ভাঙা-ভাঙা ঢেউ তুললো : আমি মুখখু মানুষ, তোমাদের উল্‌টো-সোজা কথার আমি কী বুঝবো ? যে বোঝে তার কাছেই যাও না। সে তোমার জন্যে যে বসে' আছে। যাতে তুমি এলেই তোমাকে পাঠিয়ে দিই, আমাকে বারে-বারে তার দিব্যি দিয়ে গেছে।

সৌম্য হেসে উঠলো, হেসে না ওঠার চেয়ে আর কিছু সে ভাবতে পারলে না। শিপ্রার নুয়ে-পড়া, শীর্ণ পিঠের উপর আস্তে-আস্তে হাত বুলুতে-বুলুতে বল্‌লে,—কী যে তুমি বলো ছেলেমানুষের মতো, কোথায় কী-একটা মিটিংয়ে যাওয়ার চেয়ে তোমার জন্যে ডাক্তারের বাড়ি যাওয়াটা বেশি জরুরী নয় ? এই সামান্য, সোজা কথাটা তুমি বুঝলে না ? বুঝলে না কে আমার বেশি ভালো, কে আমার বেশি আপনার ?

এতোতেও শিপ্রা নরম হ'লো না। নিজেকে শিথিল করে' নিয়ে দূরে সরে' বসলো, এক ধারে। বললে,—তবে কেন ও আসে ?

—বললুম যে অ্যালবার্ট-হল্‌এ আজ সন্ধ্যের সময় একটা মিটিং ছিলো, সেখানে বনানী দেবী যেতে চেয়েছিলেন।

—চেয়েছিলেন! শিপ্রা মুখ বেঁকিয়ে উঠলো : কেন তার নিজের দু'টো হাত-পা নেই ? তোমার কাঁধে চড়ে' যাবার কী হয়েছে ?

সৌম্য খানিকক্ষণ কোনো কথা বলতে পারলো না। নীরবে তার

চেয়ারে এসে বসলো। বললে,—তা তোমার বনানী-দিকেই জিগ্‌গেস করলে পারো। আমি তো আর যাই নি। দেখলে তো, আমি গিয়েছিলুম ডাক্তারের ওখানে।

—সে তো শুধু আজকের কথা হ'লো। কিন্তু আর কোনো-দিন ও হয়নি এমুখো? আর কোনোদিন যাও নি ওর সঙ্গে শহর বেড়াতে?

—ছি, শিপ্রা, সৌম্য দুঃখে-ঘৃণায় আপাদমস্তক বিমর্ষ হ'য়ে উঠলো: এ তোমার কী কুৎসিত ব্যবহার!

—আর তোমাদের ব্যবহারে পৃথিবী একেবারে পবিত্র হ'য়ে যাচ্ছে! শিপ্রা আবার ছিটকে মেঝের উপর ছুটে এলো, প্রখর গলায় বললে,—কেন, কেন ও আসবে? আমি বাড়ি নেই জেনেও ওর আসা চাই কেন?

—বা, তুমি তো বাড়ি আছোই।

—সে তো আজ হ'লো। অমন করে' কথা ঘুরিয়ে নিতে পারবে না বলে' রাখছি। আর এতোদিনের মধ্যে ও আসে নি একদিনো?

—এলে কী হয়?

—আর তুমিও গেছ তার বাড়িতে?

—গিয়েছি। গেলে কী দোষ?

নিষ্পলক, নিষ্ঠুর চোখে চেয়ে শিপ্রা বললে,—তুমি আমার গা ছুঁয়ে সেদিন প্রতিজ্ঞা করেছিলে না?

—বা, আমি তার কী জানি? ধরা-পড়ে'-যাওয়া অপরাধী শিশুর মতো ধরা গলায় সৌম্য বললে,—ওঁর ঠাকুমা আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন, শিপ্রার বরকে দেখবার তাঁর সে কী দারুণ শখ, বলো, আমি যাবো না? ঘরের মধ্যে কুনো হ'য়ে বসে' থাকবো? বলো ·

—সে তো একদিন হ'লো। তারপর, তারপর আর যাওনি?

—বা, প্রতিজ্ঞা একবার ভেঙে গেলে পরে আর যেতে দোষ কী? সৌম্য হাসবার চেষ্টা করলো।

—তাই যাও না, যাও না তোমার সেই দেবীর কাছে, শিপ্রা হঠাৎ এগিয়ে এসে সৌম্যর গায়ে একটা ঠেলা দিলো : সেখান থেকে এখানে আর তবে ফিরে এলে কেন? কে, কে তোমার ডাক্তার দেখাবে, কী হ'বে তোমার তাকে বাঁচিয়ে? মিথ্যাবাদী কোথাকার! উনি আবার আমার গা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন!

শিপ্রা ছুটে বিছানার উপর লুটিয়ে পড়লো। উঠলো ফুঁপিয়ে : আমি যাতে না বাঁচি তাই তো তুমি চাও। তাই তো তুমি আমার গা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করে'ও তা রাখলে না।

সৌম্য চেয়ারে স্তব্ধ, নিস্পন্দ হ'য়ে বসে' রইলো। মেরুদণ্ডটা যেন অসাড় হ'য়ে গেছে, সমস্ত বসে'-থাকার মধ্যে যেন আর এতোটুকু বশ নেই। ঘটনাটা আগাগোড়া সে স্পষ্ট আয়ত্ত করতে পারলো না : প্রবল, অন্ধ একটা আকস্মিকতার মতো তার উপর ভেঙে পড়েছে। সজ্ঞানে এতোটুকু প্রস্তুত হ'বার পর্যন্ত সময় পায় নি। কী যে সে এখন করে, চারিদিকে সে কঠিন অন্ধকার দেখতে লাগলো। শিপ্রার মাঝে যে এতো বিষ ছিলো, ফুলের পাপড়ির তলায় সূক্ষ্ম শাণিত একটা সাপ, এ-কথা কে কবে ভাবতে পেরেছে? রাগে জমে'-জমে' সৌম্য বরফের মত ঠাণ্ডা হ'য়ে গেলো। কিন্তু শিপ্রার কী দোষ! নিজেকেই মনে হতে লাগলো অপরাধীর মতো, অপরিচ্ছন্নের মতো। কেন বনানীকে সে একান্ত একলার করে গোপন করে রাখতে পারেনি? কেন উপেক্ষার আবরণে অন্তরের আকাঙ্ক্ষাকে ঢেকে রাখতে পারেনি? ঐশ্বর্যের আবরণে উলঙ্গ উপবাসকে? শিপ্রা কী করবে? তার আর কে আছে? কী বা করতে পারে সে আর? শুয়ে আছে শিপ্রা বিছানার একধারে করুণ অস্তমিততায়, সমস্ত গায়ে তার শীর্ণতার বোঝা, এখান থেকে দেখা যাচ্ছে তার পাণ্ডুর গালের দুর্বল একটুখানি আভা। দেখে, এতো রাগ এতো জ্বালা থাকা সত্ত্বেও, সৌম্যর কেমন মায়া করতে

লাগলো। অবুঝ, বোকা, একেবারে ছেলেমানুষ। মনের যা কথা, তা সে কেমন উদার অসঙ্কোচে প্রকাশ করে' ফেলে, খুঁটিয়ে, আগু-পিছু ভেবে কিছুই সে বিচার করতে আসে না। একেবারে, একেবারে ছেলেমানুষ। শুয়েছে, যেন পৃথিবীতে তার মতো দুঃখী আর কেউ নেই। ফোঁপাচ্ছে, যেন কে তার হাত থেকে রঙিন একটা খেলনা নিয়েছে কেড়ে। তার দিকে চেয়ে মমতায় সৌম্য গলে' যেতে লাগলো। কতোদিন পর তার সঙ্গে দেখা, কতো দূর দীর্ঘতার পর। সৌম্য আস্তে-আস্তে উঠে পড়লো। বিছানার কাছে এসে আস্তে আস্তে দুই হাতে তাকে কুড়িয়ে নিয়ে অস্ফুট গলায় বল্‌লে,—ছি-ছি, তুমি তার জন্যে একেবারে কাঁদতে বসে' গেলে দেখছি। বেশ তো, আমি আর সেখানে না-ই গেলুম। আমি না গেলেই যদি তুমি খুশি হও—

শিপ্রা সেই স্পর্শের দেয়ালে মাথা কুটতে লাগলো: থাক্‌, সুখের আমার আর দরকার নেই। ছাড়ো। তোমাকে আমি খুব চিনেছি। তুমি আবার যাবে না। তোমার কথার আবার একটা দাম।

—বেশ তো, কী হয় সেখানে না গেলে? সৌম্য শিপ্রাকে খাটের বাজুর পাশে জোর করে' বসিয়ে দিলো: কিন্তু আমাকে বলো, না, বলতেই হ'বে তোমাকে, গেলেই বা কী হয়?

—কে ধরে' রাখছে, গেলেই তো পারো। শিপ্রা মুখ ফিরিয়ে নিলো: সে তো তোমার সঙ্গে মিটিংএ যাবে বলে, সেজে-গুজে বসে' আছে কখন থেকে। শিপ্রা আবার তাকে একটা ঠেলা দিলো: যাও, বেরিয়ে পড়ো। মিটিং যে ভেঙে গেলো।

সৌম্য এক ইঞ্চিও সরলো না। বল্‌লে,—না, এ রকম ভাবে প্রশ্নটা এড়িয়ে গেলে চলবে না। তুমি বলো, সেখানে গেলে কী হয়? কী হয় বলে মনে করো?

—আমি কী জানি তোমাদের কী হয়? শিপ্রা চেঁচিয়ে উঠলো:

এতো যে যাওয়া-আসা, আমাকে একদিনো সে-কথা লিখেছ? একবারো লিখেছ কোথায় তুমি যাও না-যাও, কী তুমি করো না-করো? লিখেছ?

—বা, ওদের ওখানে যাই সেটা এমন আবার কী লেখবার কথা! সৌম্য হাসবার ভান করলে: তবে ভাত খেয়ে যে আমি আঁচাই, সেদিন যে আমার গলায় একটা কাঁটা ফুটেছিলো, সে-কথাও তোমাকে লিখি আর-কি।

—হ্যাঁ, ভাত খেয়ে আঁচাবার মতোই তো সে একটা নিত্যিকার খবর, তা লিখবে কেন?

—এ যে আবার মনে করে' রেখে লিখতে হ'বে তা আমি ভাবতেও পারি নি। সৌম্য আকাশ থেকে পড়বার একটা চেষ্টা করলো: কিন্তু আমাকে বুঝিয়ে বলো, সেখানে যদি এক-আধদিন গিয়েই থাকি তো কী দোষ হয়েছে?

—কিন্তু কেন, কেনই বা তুমি যাবে? শিপ্রা উঠলো একেবারে দকুলক্ করে': ভূ-ভারতে তোমার আর যাবার জায়গা নেই? এতোদিন, জীবনের এতো দীর্ঘ সময়টা ওঁর বিরহে তবে কী করে' কাটিয়েছিলে?

সৌম্য হাসি দিয়ে রাগটাকে পিষে ফেললে। বললে,—বা, আলাপ হ'য়ে গেলো, তুমিই তো একদিন আলাপ করিয়ে দিলে, আমি তো বিন্দুবিসর্গ কিছু জানতুমও না—তারপর, সৌম্য একটা ঢোঁক গিললো: দেখা-শোনা এক-আধটু না করলে হয় কী করে'? নতুন জায়গায় একেবারে একলা আছেন।

—আহা, সেইজন্যে দুঃখে একেবারে তোমার বুকটা ফেটে যাচ্ছে। লজ্জা করে না তোমার? শিপ্রা রাগে সাদা হ'য়ে গেলো: তার চেয়ে সাফ বলো না কেন উনি একলা আছেন বলে'ই তুমি যাও?

—তা গেলুম-ই বা। সৌম্য পরিচ্ছন্ন, সাদা গলায় বললে,—দু'জনে বসে' কতো কথা নিয়ে গল্প করি, গল্প করতে ভালো লাগে। তাতে কী দোষ হয়েছে? না-হয় আর না-ই গেলুম, কিন্তু আমাকে বলো, এতে অপরাধটা তুমি কোথায় দেখলে?

—না, অপরাধ কোথায়! শিপ্রা কুটিল, কুৎসিত মুখে একটা আর্ত শব্দ করে' উঠলো: যাবেই তো, যাবে না, তোমার জন্যে যে সেজে গুজে বসে' থাকে।

—ছি,—ছি শিপ্রা, তুমি এতো অভদ্র হ'য়ে উঠছ? নিষ্ঠুরতায় সৌম্যর দুই ভুরু স্ফীত হ'য়ে উঠলো: এ তোমার সেই বনানী-দি, না? তোমার নমস্যা।

—আর তোমার যে বনানী দে—বী। যাও না, যাও না, দেবীর পা দু'টো পূজো করো না বসে'-বসে'।

শিপ্রা আবার পড়লো বিছানায় লুটিয়ে। অসহায় অশ্রুর সজলতায়।

সৌম্য অবলম্বনহীনের মতো ভাবহীন, দুর্বল পায়ে মেঝের উপর পায়চারি করতে লাগলো। চিরকাল জীবনে সে একটা সুস্থ পরিচ্ছন্নতা চেয়েছে, সমতল সহজ একটি সামঞ্জস্য, অবাধ একটি ছন্দোময়তা: এখন হঠাৎ এসে পড়েছে যেন একটা ধোঁয়াটে, আবিল আবহাওয়ার মধ্যে। এমন কি, নিশ্বাস টানতে পর্যন্ত তার কষ্ট হচ্ছে, পায়ের তলায় পাচ্ছে না যেন সমান জায়গা। মাথাটা ঘুরছে, গলার কাছে এসে কাঁপছে হৃৎপিণ্ড। সে যেন আর আগের সেই সৌম্য নেই, নিশ্চিন্ত, নির্লিপ্ত, উদাসীন। একটা প্রকাণ্ড ছন্দোভঙ্গ হঠাৎ তাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে' ফেলেছে। কী যে সে করবে, বা, কী যে সে করবে না, কিছুই তার মাথায় এলো না। শূন্য, নিশ্চিহ্ন একটা শুভ্রতার মতো সে দাঁড়িয়ে রইলো।

মনে হলো শিপ্রা যেন কেউ নয়, তাকে নিয়ে কোনো দায়িত্ব কোনো কর্তব্য তার নেই। যেন বানের জলে ভেসে-আসা অশুচি আবর্জনা।

রুগ্ন, কুৎসিৎ, কলঙ্কিত। একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল তার দিকে, ভাবতে চেষ্টা করল তাকে সে দেখেছে কিনা, ছুঁয়েছে কিনা নির্জন অন্তরঙ্গতায়।

আবার শিপ্রাব শরীরময় সেই বিধুর শীর্ণতা, কান্নায় বুকের একটা পাশ তার কাঁপছে, সেই তার চিবুকের ডৌলে কোমলতার ছোট্ট একটি ঢেউ। আবার সৌম্যর শরীর মমতায় নরম হ'যে এলো, তার রোগা, শুকনো মুখে সে অসীম একটি সমর্পণের ছবি দেখলে। তার আর কে আছে। কী আর করবার আছে তার। তাকে ফের দু'হাতে জুড়িয়ে নিতে-নিতে সে বললে,—যাবো না বাপু, আর যাবো না। এতে একেবারে কেঁদে ভাসিয়ে দিয়েছে দেখ। ওঠো, ওঠো, আর কেনোদিন না গেলেই তো হ'লো।

আদরে শিপ্রা আস্তে আস্তে আবার জুড়িয়ে এলো। তার জন্যে, তার খোকার জন্যে নতুন গয়নার কী-কী অর্ডার যাবে, সৌম্য তারো একটা ফর্দ দিলে। শিপ্রার শরীর একটু সারলেই যে তাকে সে চেঞ্জে নিয়ে যাবে, গোপালপুর বা পুরী—হাতে তার কিছু ছুটি জমেছে এতে আর কোন সন্দেহ নেই। মা হয়েছে বলে'ই শিপ্রার এই সাজসজ্জা সম্বন্ধে ঔদাসীন্য কেন, তার রঙিন শাড়ি নেই, সে-কথা সৌম্যকে সে তো বললেই পারে। কাবেরি, গোদাবরি, নর্মদা—যা সে চায়। অনেক—অনেক সে তাকে আদর করলে, অনেক রঙিন প্রতিশ্রুতি, কিন্তু সব যেন সে মুখস্ত বলে' যাচ্ছে মন পড়েছে তার ঘুমিয়ে। দু'হাতে ... অনেক প্রশ্রয়, কিন্তু নেই যেন সেই পুরোনো অজস্রতা।

এক সময়, হঠাৎ শিপ্রার কানের কাছে মুখ এনে সৌম্য চুপি চুপি বললে,—আচ্ছা, আমি তো যাবো না, কিন্তু ধরো, উনি যদি একদিন এসে পড়েন?

—কেন, সে আসতে যাবে কেন? শিপ্রা ঝাঁজিয়ে উঠলো: তুমি যদি না যাও, তার এখানে আসবার তবে কী দায় পড়েছে?

—বলা যায় না তো, যদি এসেই প'ড়েন একদিন ?

—এলে আসবে, আমার সঙ্গে দু'টো গল্প করে', না-হয় এক পেয়ালা চা খেয়ে বাড়ি চলে' যাবে।

সৌম্য উঁচু গলায় হেসে উঠলো : কিন্তু আমার সঙ্গে যদি দেখা করতে চান ?

শিপ্রা এক নিমেষে আবার গম্ভীর হ'য়ে গেলো : তোমার ঘরে তক্ষুনি ঠেলে পাঠিয়ে দিয়ে বাইরে থেকে শেকল টেনে দেবো।

সৌম্যর হাসিটা এবার জম'লো না।

শিপ্রা খাট থেকে নেমে এলো, দাঁড়ালো তার অধিকারের প্রচণ্ড স্পর্ধমানতায়। বল'লে—এবার এমুখো হ'লে সটান ঐ সিঁড়ি দেখিয়ে দেবো। আসুক দেখি না আরেক বার।

—সে কী কথা ? সৌম্য স্তব্ধতায় নিশ্চল হ'য়ে দাঁড়ালো : এলে ওঁকে তাড়িয়ে দেবে নাকি ?

—নিশ্চয়ই দেবো। আমার বাড়ি, আমার ঘর, শিপ্রা আবার একটা ঢেউ তুললো : যাকে খুশি আমার তাড়িয়ে দেবো। আজো তো দিয়েছি তাড়িয়ে। নইলে কি আর তোমার জন্যে দু'ঘণ্টা বসিয়ে রাখতে পারতুম না ?

—বলো কী ? সৌম্য অসহায় নিষ্ঠুরতায় ছট্‌ফট্ করে উঠলো : অন্যায়, অভদ্র কথা তাঁকে কিছু বলেছ নাকি ?

ঠোঁট দুটো কুঁচকে, চিবুকের উপর কুটিল রেখা ফেলে শিপ্রা বল্‌লে, —ইস্, বড্ড মায়া দেখ্‌ছি যে। যাও না, পায়ে ধরে' দেবীর মান ভাঙাও গে। এখানে আর ব'সে আছো কেন ? যাও, তাঁকে এবার মাথায় করে' নিয়ে এসো। অন্যায়, অন্যায় করে' যে তাঁকে তাড়িয়ে দিয়েছি।

শিপ্রাকে বুকে আঁকড়ে ধরে নিস্পন্দ হয়ে শুয়ে আছে বটে কিন্তু সৌম্যর মন বেরিয়ে পড়েছে পথে, সঙ্গীহারা শীতের রিক্ততায়।

তেরো

আপিস থেকে বেরিয়েই সৌম্য সোজা বাড়ির দিকে ছোটে, পথে এক সেকেণ্ডও কোথাও দেরি করে না। তবু তার নিস্তার নেই, উপরে উঠতেই শিপ্রা চোখের কোণে বাঁকা, ধারালো একটা জিজ্ঞাসা নিয়ে তার মুখের দিকে তাকায়। বলে: কী, এতো দেরি হ'লো কেন? কোথায় গেছলে শুনি?

সৌম্য হাতের ঘড়িটা দেখিয়ে বলে: বা, কই দেরি হ'লো? ট্র্যাম কতোক্ষণে আসে কিছু হিসেব আছে?

—এখন এ-সব ওজর তো দেখাবেই। শিপ্রা ঘাড় দোলাতে-দোলাতে বলে: কোনোদিন বা শুনাবো, গাড়ি মাঝপথে ভেঙে পড়েছিলো, পথে বেধেছিলো দাঙ্গা, বেরিয়েছিলো বিয়ের মিছিল,—কতো কী!

অসম্ভব। শিপ্রার ও একটা ব্যাধির মতো হয়েছে। বাঘ যেমন রক্ত শুঁকে বেড়ায়, শিপ্রাও তেমনি সব সময়ে সন্দেহ শুঁকছে। দেরি সত্যি না হ'লেই এই, আর দেরি হ'লে তো সর্বনাশ। যুক্তির কথা ছেড়ে দিই, শিপ্রার সামান্য একটা সহানুভূতি পর্যন্ত নেই। খেতে-শুতে, চলতে-বসতে, একটু ফাঁক পেলেই তার এই কথা, এ যেন তার হাতের শুধু একটা খেলনা, একটা অস্ত্র। সব সময় আর সহ্য করা যায় না। হয়তো রাতে আজ আর সৌম্যর খিদে নেই, ব্যস্, অমনিই শিপ্রা চোখ নাচিয়ে বল্‌লে: ও, খাইয়ে দিয়েছে বুঝি? হয়তো অন্যমনস্ক হ'য়ে চুপ করে' বসে' আছে, কোলের উপর বইর নামে বই রয়েছে পড়ে', শিপ্রা অমনি পিছন থেকে এসে চিমটি কাটবে: আনমনে বসে' কা'র কথা ভাবা হচ্ছে? হয়তো-বা নিচু হ'য়ে টেব্‌লে বসে' কিছু লিখছে,

অমনি তীরের মতো একটা প্রশ্ন এসে তাকে বিদ্ধ করলো: কা'কে চিঠি লিখছো দেখি ?

সৌম্য ক্লান্তিতে জীর্ণ হ'তে লাগলো। একেক সময় সহ্য করা তার অসম্ভব হ'য়ে ওঠে, মনে হয় দুষ্কর, দুঃসহ একটা-কিছু সে করে' বসে, আর-কিছু না পারে, সোজা বনানীর ওখানেই চলে' যায়, তার নির্মল, উজ্জ্বল উন্মুক্ততায়, কিন্তু সত্যি করে' কিছুই সে শেষ পর্যন্ত করে' উঠতে পারে না, শিপ্রাকে, অবোধ, অবুঝ শিপ্রাকে, দুঃখ দিতে তার ভীষণ মায়া করে। জ্বরটা তার কিছুতেই যাচ্ছে না, এই জ্বর নিয়েই ঘর-দোরের সে তদারক করে, ছেলেকে নিয়ে উৎসব: জ্বর নিয়েই তার তোলা-পাড়া, ওঠা-নামা,—ডাক্তারের কথায় কে কান দেয়। বিছানা একবার নিলেই তো সংসার গেলো উচ্ছন্ন। কয়েক মাস তৈবায় পড়ে' একটু বাপের বাড়ি গিয়েছিলো বলে'ই তো এই অনাসৃষ্টি। এখন তাকে বিছানায় ঠেলে দিতে পারলেই তো সৌম্যর সুবিধে—শিপ্রা কি আর তা বোঝে না, না, তার বোঝবার বয়েস নেই ? যা হ'বার হ'বে—সৌম্য সময়ের হাতে ছেড়ে দিয়েছে তার সমস্ত অসম্পূর্ণতা। শিপ্রার জন্যে যে তার মায়া করে—তারো নাকি একটা প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য আছে। অতএব কিছুই আর সে বলে না, বলবার তার স্বভাবো নয়। সুখের চেয়ে স্বস্তি ভালো, জীবন্মৃতার চেয়ে এই জীবন্মৃততা। পাছে শিপ্রা আঘাতে জর্জর হ'য়ে ওঠে, চার পাশের ঘুমন্ত হাওয়া ওঠে ঘুলিয়ে, দেহমনের এই মৃত শুদ্ধতা যায় টুকরো-টুকরো হ'য়ে—সৌম্য ঘরের বাইরে এক পা-ও কোথায় বেরোয় না, ঘরের অন্ধকারে, কখনো বা আলো জ্বালিয়ে চুপ করে' বসে' থাকে। সব চেয়ে ভয় করে সে সাংসারিক অশান্তি, সাংসারিক সামঞ্জস্যহীনতা—একটা কলুষিত ক্লেদের মতো তা যেন তাকে শরীরে-মনে পীড়িত, বিমর্ষ করে' তোলে। শিপ্রা তার জন্যে এতো ত্যাগ, এতো দুঃখ স্বীকার করতে পারলো, আর

বিনিময়ে সে-ই বা না-হয় নিজেকে খানিক অস্বীকার করলো, রাখলোই না হয় নিজেকে একটু ছোট করে', রুদ্ধ করে', কী এমন স্বর্গ থেকে সে বঞ্চিত করবে নিজেকে? নিজেকে একটু কেটে ও কমিয়ে না আনতে পারলে শিপ্রার সঙ্গে সে একটা সহজ সমতা পাবে কী করে' শিপ্রা, যে-শিপ্রা তার জন্যে নিজেকে করলো এতো ক্ষয়, ভরে' উঠলো আবার এতো পূর্ণতায়! শিপ্রার জন্যে সমস্ত শরীর তার স্নেহে গলে' যায়, প্রজাপতির পাখার মতো এতো সে লঘু যে আঙুল দিয়ে ছুঁলে পর্যন্ত যেন তার সইবে না। ঘন, ভারি সেই তার চুল উঠে যাচ্ছে পাংলা হ'য়ে, শঙ্খের মতো সাদা, নিটোল গলাটি সরু লম্বা হ'য়ে এসেছে, আঙুলগুলি কেমন সিটোনো, ফাঁক-ফাঁক, মুঠিটি হাল্কা, ঝুলে পড়েছে সেই দুরন্ত ঢলোঢলো দু'টি কাঁধ। আগে সমস্ত শরীরে ঝিরঝির করে' ঝরে' যেতো একটি কৃশতা, এখন যেন পাকিয়ে হয়েছে একটা দড়ি, হাড় ক'খানা এ-দিক ও-দিক তাকিয়ে আছে। এর পর আর তার মনে কষ্ট দিতে মন ওঠে না। মানুষে শান্তির জন্যে কতো-কিছু সহ্য করে, কতো-কিছু করে ক্ষমা, সে-ও না হয় নিজেকে নামিয়ে আনলো এই শীতল নমনীয়তায়, তার আকাঙ্ক্ষার দানবিকতাকে হ্রস্ব করে' সহজ, দৈনন্দিন. সাধারণত্বে। সৌম্য তাই আজকাল আর বাড়ি থেকে বেরোয় না, শিপ্রার দু'-একটা খেলো সাংসারিক কাজে সে সাহায্য করে। হয়তো খোকা কাঁদছে, শিপ্রা পাতবে বিছানা, সৌম্য ছেলেকে কোলে করে' রাখে। কখনো বা মশারি খাটিয়ে দেয়, ধুলো ঝেড়ে বই গুছিয়ে রাখে, কখনো বা শিপ্রাকে দেখিয়ে তার ছেলেকে আদর করে। তাদের চার পাশে নিয়ে আসে একটি লঘুতার সুর।

কেন, কেন সে শান্তি চাইবে, চাইবে ক্ষীণজীবী ভদ্রতা? কেন সে উত্তালতার আস্বাদ নেবেনা জীবনের তরঙ্গের বিক্ষোভে? সে কি

অল্পপ্রাণ, অল্পতনু? তার ভদ্রতার গুহার বাইরে নিজেকে একবার দেখবেনা সে রুদ্ররূপে?

কিন্তু সেদিন আপিস থেকে ফিরে সৌম্যর মন অকস্মাৎ চঞ্চল হ'য়ে উঠলো। যথারীতি হাত-মুখ ধুয়ে জল-খাবার খেয়ে সে তার বসবার ঘরে এসে বসেছে, অন্ধকারের নতুন উষ্ণতায়, দিনের স্মৃতিগুলি যখন একে-একে ছায়ায় যাচ্ছে মিলিয়ে। পাশের ঘরে শোনা যাচ্ছে, দোলনায় খোকাকে শুইয়ে শিপ্রা তার উপরে নিজেকে দিয়েছে ঢেলে, দূর থেকে পাওয়া যাচ্ছে তাদের বিছানার একটা আভাস, নিশ্চিন্ত নিভাঁজ বিছানা, দেখা যাচ্ছে র‍্যাকে তার আপিসের পোশাক, এখানে-ওখানে ছড়িয়ে আছে টেব্‌ল্‌-চেয়ার, দেয়াল ঘেঁষে বিশালকায় ক'টা আলমারি,—তবু এতো সব আরাম-আভরণের মাঝেও সৌম্যর নিজেকে ভারি একা, ভারি নিঃসঙ্গ মনে হ'তে লাগলো। ইচ্ছে করে'ই হাত বাড়িয়ে আলোটা আর জ্বালালো না। দূরে-দূরে আকাশের নিচে বিশাল কলকাতা কালো হ'য়ে আসছে, সমস্তটা শহর এখন কেমন একটা নির্জন গুহার মতো ভয়াবহ। কোথাও যেন কারুর আশ্রয় নেই, অবলম্বন নেই, এমন একটা ধূসর হতাশা পড়েছে ছড়িয়ে। সৌম্যর মন কেমন ভারি, অবসন্ন হ'য়ে এলো। এ সে এখানে বসে' করছে কী, এই ঘনায়মান কালিমায়, এই ক্লান্তিকর নিশ্চিহ্নতায়? মধ্যরাত্রে ঘুমভাঙা শিশুর মতো সৌম্যর আত্মা আর্তনাদ করে' উঠলো। সে যেন আর কোথাও যেতে চায়, কোন বহু দূর সমুদ্রের গহনে, যেখানে তার সমস্ত জীবন প্রকাশের উদগ্র প্রেরণায় উত্তাল, উলঙ্গ হ'য়ে উঠেছে: আর কোনো বৃহত্তর আকাশে যেখানে তার সমস্ত জীবন গভীরতায় প্রশান্ত, পরিপ্লুত। এখানে সে বসে' আছে কেন, এই তার পরিচয়ের খর্বতায়, দেয়ালের এই কোটরীভূত অন্ধকারে, এই তার জীবনের খণ্ডিত, বিচ্ছিন্ন একটা পরিচ্ছেদে। তার মাঝে আছে আরো বড়ো পরিচয়,

আরো অনেক অন্ধকার। সৌম্যর সমস্ত স্নায়ু-শিরা সন্তছিন্ন তারের মতো হাহাকার করে' উঠলো। কী যেন তার বাড়বার ছিলো, বাড়তে পায়নি, কী যেন তার জানবার ছিলো তা হয়নি এখনো জানো। তার জীবনের সেই অগঠিত অংশটা তাকে যেন সীমাবদ্ধ করে' রেখেছে। সেই অজ্ঞানের অন্ধকার থেকে ছাড়া পাবার জন্যে সৌম্য চেতনায় হঠাৎ বিস্ফারিত হ'য়ে উঠলো। কী যেন তার পাবার ছিলো, তার পিপাসাটা সে সর্বাঙ্গে একটা তীব্র যন্ত্রণার মতো অনুভব করলো। তা পাবার তারো ছিলো স্নায়ু, তারো ছিলো সময়, তারো ছিলো অধিকার। এখানে বসে' সে করছে কী, এই পৃথিবীর অন্ধকারে! সে প্রকাশ করবে নিজেকে নিজের অন্ধকারে, গভীরতর ঐশ্বর্যে। তার কিসের দুঃখ, কিসের ভয়, যতোক্ষণ পর্যন্ত পৃথিবীতে এক কণা ঘাস আছে, আর কিসের লজ্জা, সে বাঁচবে আপন পূর্ণতায়, আপন একাকীত্বে।

কে তার শিপ্রা? কেউ নয়। তার জীবনের ভ্রান্তি, পদচ্যুতি। একটা কদর্য অভ্যাস, ক্ষয়ময় বিবর্ণতা। যৌবনের অস্বীকৃতি, সাধনার অন্তরায়। সমস্ত ভবিষ্যতের হন্তা।

ঘরের মধ্যে হঠাৎ আলো জ্বল' উঠলো।

শিপ্রা, তার কোলে ছেলে, আস্তে আস্তে কাছে এসে বল্‌লে,—ও কী, অন্ধকারে চুপ করে' বসে' আছো কেন?

আলোয় সৌম্যর মুখ গেছে শুকিয়ে। ধরা গলায় বল্‌লে,—শরীরটা কেমন্ ভালো নেই।

স্বরের ক্লান্তি শিপ্রার অন্তরতম স্নেহমূল এসে যেন স্পর্শ করলো। আরো একটু এগিয়ে এসে বল্‌লে,—হ্যাঁ, তোমার যেন কী হয়েছে। তোমার মনের আর সেই স্ফূর্তি নেই। সন্ধ্যেবেলাটা বাড়ি বসে' আছো, কেন? একটু কোথাও বেড়িয়ে এলেই তো পারো।

বিরক্ত মুখে সৌম্য বল্‌লে—থাক্।

—কেন, থাক্ কেন? শরীরটা ভালো নেই, ঘরের মধ্যে বসে' আছো কী? হাওয়ায় একটু বেরোলেই সেরে যাবে দেখো। নাও, ওঠো, দিন-রাত বাড়ির মধ্যে বসে' থাকতে দেখলে আমারো কেমন ভালো লাগে না।

—হয়েছে। সৌম্য গভীরতরো বিরক্তিতে বলে' উঠলো: আমি কোথাও যাই, আর তুমি অমনি আমাকে খোঁটা দিতে শুরু করো। তোমাকে আমি চিনি না? থাক্, ঢের হয়েছে—দরকার নেই কোথাও গিয়ে, এই আমি বেশ আছি।

শিপ্রা হালকা করে' একটু হাসলো, বল্লে,—আমাকে তুমি ঠকাতে পারবে না; না, তুমি যাও। তুমি কোথায় গেছ না-গেছ ফিরে এলে তোমার চেহারা দেখেই ঠিক বলে' দিতে পারবো। শিপ্রা তার গা ঘেঁষে এগিয়ে এলো: একটা কথা একদিন কী বলেছি বলে' একদম আর বেরোতেই হ'বে না। আগে তো কতো বেরোতে।

—না, হতাশ মুখে সৌম্য বল্লে,—না, যাবার আমার কোথাও জায়গা নেই।

—কেন, তোমার সেই আড্ডা কী হ'লো?

—সে ভেঙে গেছে।

—তবে আর কোনো বন্ধুর বাড়ি, বায়স্কোপ, খেলার মাঠ—

—ও-সব আমার কিছু ভালো লাগে না।

শিপ্রা এক মুহূর্ত চুপ করে' রইলো। পরে বিবশ, গাঢ় গলায় বল্লে,—এমন আর কোনো জায়গা নেই যেখানে যেতে তোমার ভালো লাগে?

সৌম্য অবাক হ'য়ে তার মুখের দিকে তাকালো। এই সে বেশ আছে এমনি সমর্পণে আস্তে-আস্তে তার একখানি হাত ধরলে।

মমতায় মলিন, বিষণ্ণ মুখে শিপ্রা বললে,—বেশ তো, তার কাছেই

যাও না, যদি সত্যিই তোমার ভালো লাগে। যা ভালো লাগে তা করবে না কেন? মিছিমিছি মন ভার করে' বসে' থেকে লাভ কী?

—কী যে তুমি বলো! সৌম্য সন্ত্রস্ত হ'য়ে শিপ্রাকে সেই ধরাহাতে নিজের কাছে আকর্ষণ করলে: এই তো আমি চমৎকার আছি। কোথায় আবার আমি যাবো, সংসারে আমার জায়গার কী ভাবনা? সৌম্য হঠাৎ হাত বাড়িয়ে খোকাকে আদর করতে শুরু করলো।

—দেখ, দেখ, যাবার জন্যে কী রকম হাত বাড়িয়েছে! শিপ্রা খুশি হ'য়ে বললে,—তোমাকে এরি মধ্যে কী ভীষণ যে চিনেছে!

দুই হাতে খোকাকে সৌম্য বুকে তুলে নিলো।

শিপ্রা ঝিলিক দিয়ে উঠলো: একটুখানি বোসো, আমি ওর খাবারটা তৈরি করে' আনছি।

মাকে ছেড়ে দিতে খোকার বেশি মত দেখা গেলো না। তাকে কাঁধে করে' সৌম্য হাঁটতে শুরু করলো, তবু ওর সমস্ত মন পড়ে' আছে মা'র কোলের উপর। সৌম্যকে সে চায় না, চেনে না; তার কাছে সৌম্য একান্ত অবান্তর, একান্ত নিঃসম্পর্ক। সে তার মায়ের জন্যে, মা-ও শুধু তাকে নিয়েই ভরে' উঠেছে। তাদের দুয়ের মাঝে একটি দুর্ভেদ্য সম্পূর্ণতা, সেখানে আর কারুর নেই প্রবেশের অধিকার। সৌম্য খোকাকে নিয়ে হাঁপিয়ে উঠলো। নরম একতাল মাংস—তাকে চুপ করাবার না জানে সে কায়দা, তাকে নিয়ে নিজে চুপ করে' থাকবার না-বা আছে তার ধৈর্য। এই একটা জীবাণুর মাঝে শিপ্রা কী পেলো কে জানে, সৌম্য শরীরের প্রতি তন্তুতে ছট্‌ফট্ করে' উঠলো। এক কণা এই প্রাণের স্ফুলিঙ্গে শিপ্রা ক্ষয় করে' দিয়েছে তার সমস্ত দীপনা, ভরে' উঠেছে সে অফুরন্ত ঐশ্বর্যে। খোকার শরীরে ঢেলে দিয়েছে তার সমস্ত লাবণ্য, তাকে সাজাতে খসিয়ে ফেলেছে তার সমস্ত আভরণ। কিন্তু, হায়, খোকা শুধু শিপ্রার একার সৃষ্টি ছিলো না, তার মাঝে

সৌম্যরো ছিলো অমর অভীপ্সা, নতুন দেহে নবতন বাঁচবার আকাঙ্ক্ষা, তবু তাকে নিয়ে নেই তার তৃপ্তি, নেই তার শেষ। তার মতো, শিশুও তার কাছে উদ্বৃত্ত, অবান্তর, তার মাঝে তার পরিচয় আছে, কিন্তু পরিণতি নেই। শিপ্রা পৌঁছে গেছে তা, সন্তানের মধ্যে, সহজে, অনায়াসে, কিন্তু সৌম্যর মনে হ'লো, তার এখনো যেন চলাই শুরু হয় নি।

ছেলের কান্না শুনে শিপ্রা এলো ছুটে।

—দাও বাবা দাও, একটুখানি রাখতে বলেছি তো বাড়িময় একটা লঙ্কাকাণ্ড শুরু হ'য়ে গেছে।

ছেলেকে তার মা'র কোলে ছেড়ে দিতে-দিতে সৌম্য বললে,— বাঁচলুম।

একটা পিচ্ছিল অপরিচ্ছন্নতা থেকে যেন সে দুই হাত মুক্ত করে' আনলো। তার শরীর থেকে নেমে গেলো যেন একটা ক্লান্তির বোঝা।

খোকা নিমেষে গেলো জল হ'য়ে। গায়ে পেয়েছে মা'র কোমলতা, মুখে দুধের বোতল। সমস্ত ছবিটি সুষমায় কী সুসমঞ্জ, শিপ্রা ও তার ছেলেতে মিলে কী একটি সুভঙ্গ সম্পূর্ণতা। শিপ্রা যেন এখন দাঁড়িয়েছে তার নিজের জায়গায়, নিজের সত্যে, নিজের মহিমায়: কিছু আর তার চাইবার নেই, পাবার নেই, পেয়ে গেছে সে তার পরম পরিসমাপ্তি। দুধের বোতল মুখে পুরে খোকার মুখে তৃপ্তির যে উচ্ছলতা, তার ছায়া পড়েছে শিপ্রার দুই চোখের দীর্ঘ, মন্থর দৃষ্টিতে। তার দাঁড়াবার ভঙ্গিটি পর্যন্ত সুষমায় এসেছে আর্দ্র হ'য়ে। তার শরীরের কৃশতাটি যেন তার মাতৃস্নেহেরই একটা সুর। দেখে সৌম্যর হিংসা করতে লাগলো। শিপ্রা কেমন ভরে' উঠেছে তার প্রাপ্তির পূর্ণতায়, তার সমর্পণের শান্তিতে। সেখানে

সৌম্যকেও তার প্রয়োজন নেই, সৌম্য আছে দূরে, সৃষ্টির নির্জন নির্বাসনে।

সৌম্য হঠাৎ দুই লোলুপ হাত বাড়িয়ে দিয়ে বল্‌লে,—এবার দাও দিকি আমার কোলে।

শিপ্রা বল্‌লে, —না, মিছিমিছি কাঁদিয়ে লাভ কী।

তবু সৌম্য জোর করে' ছেলেকে ছিনিয়ে নিলো। যেন ছেলের মাঝে সে কাঁদছে, তার রক্ত তার মাংস, তার বাঁচবার তার বাড়বার পিপাসা। কী যন্ত্রণা এই বাঁচবার দায়িত্ব হাতে নেয়া, নিয়ে। জীবনের বিরাট জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে যাওয়া। কী যন্ত্রণা সকলের মাঝ থেকে এই এক হওয়া, একা হওয়া। সৌম্য এই শিশুর কান্নার মাঝে শুনতে পেলো যেন তার নিজের প্রার্থনা, নিজের প্রশ্ন।

শিপ্রা তাড়াতাড়ি আবার ছেলেকে কেড়ে নিলো। হায়, সে শুধু তার ছেলেকেই শান্ত করতে পারে।

দুধ খেতে-খেতে খোকা পড়েছে ঘুমিয়ে। তাকে বিছানায় শুইয়ে রেখে শিপ্রা আবার ফিরে এলো।

আশ্চর্য, সেই শিপ্রা আর নেই।

ধূসর অবসাদের সুরে শিপ্রা বল্‌লে,—এ কী, তুমি এমনি চুপ করে' বসে' থাকবে নাকি?

—বা, এই তো দিব্যি চুপচাপ বসে' আছি। সৌম্য ক্লান্ত একটু হাসলো: কোথায় আর যাবো?

—আহা, তোমাকে যেন কোথাও যাবার জন্যে আমি ঠেলে দিচ্ছি। শিপ্রাও হাসবার চেষ্টা করলো: বসে' আছো তো বসে'ই আছো। আর যেন তোমার কিছু করবার নেই।

আলগোছে টেব্‌ল্ থেকে একটা বই কুড়িয়ে নিয়ে সৌম্য বল্‌লে,—না, এই বইটার কয়েক পৃষ্ঠা এখনো বাকি আছে।

—কেন, কালকেই তোমাকে পরীক্ষা দিতে হ'বে নাকি? শিপ্রা নিজেরই অজানতে সৌম্যর সোফার দিকে এগিয়ে এলো: আপিস থেকে ফিরে তক্ষুনি কে কবে আবার বই নিয়ে বসে শুনি?

—বা, সৌম্য অবাক হ'য়ে গেলো: তবে, আর কী করা যায়?

—তা তো বটেই, শিপ্রা আচ্ছন্ন গলায় বল্‌লে,—বইয়ের অক্ষরগুলো যে আজ রাতেই সব উবে যাচ্ছে। মুখস্ত করে' না রাখলে চলে কী করে'? আমি কী, আমার চেয়ে বইয়ের পৃষ্ঠাটা যে তোমার অনেক দামী।

শিপ্রা পিছ্‌লে চলে' যাচ্ছিলো, সৌম্য তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে তাকে ধরে' ফেললে। কথাটা যে এমন ভাবে আসতে পারে সে ভাবতেই পারে নি। এখন কী করা যায় তারই সে একটা সভ্যতর দৃষ্টান্ত দেবার চেষ্টা করছিলো মাত্র, কিন্তু সব ছেড়ে একান্তে বসে' শিপ্রার সঙ্গেও যে আলাপ করা যেতে পারে, আশ্চর্য, এ-কথাটাই তার মনে হয়নি।

দুই হাতে মৃদু-মৃদু বাধা দিতে-দিতে শিপ্রা বল্‌লে,—ছাড়ো, আমার সঙ্গে কথা বলে' নতুন কিছু তো আর শিখতে পাবে না—

—আমরা যেন কেবল শেখবার জন্যেই জন্মেছি। সৌম্য শিপ্রাকে তার পাশে বসতে দিলে।

বল্‌লে,—ওষুধটা খেয়ে আজকে কেমন আছো?

—বাবাঃ, তোমার আর কথা নেই? শিপ্রা মলিন মুখে বল্‌লে,—অসুখের কথা শুনে-শুনে কান দু'টো আমার পচে' গেলো। ভীষণ, ভীষণ ভালো আছি। ঐ বাবা এসেছেন বুঝি, ওঁর কাছে একটু বসি গে।

শিপ্রা তবু উঠে পড়তে গা করলে না। সৌম্য তার নীরবতায় তাকে আচ্ছন্ন করে' ধরলো। কী কথা যে বলা যায়, কী নতুন কথা, তাই যেন

সে অনুভূতির অন্ধকারে লাগলো হাতড়াতে। কথার কী-ই বা দরকার, এই সে বেশ আছে স্তব্ধতার শীতল আশ্রয়ে, শিপ্রার এই সামীপ্যের স্নিগ্ধতায়। শিপ্রার শুকিয়ে-আসা নরম আঙুল ক'টি নিয়ে সৌম্য খেলা করতে লাগলো, দুর্বল, অসহায় ক'টি আঙুল। এই ক'টি আঙুলে সে যেন তার সমস্ত জীবন ঢেলে দিয়েছে, সমস্ত কামনা। কোথাও এতোটুকু উদ্ধত অহঙ্কার নেই, আঙুলগুলি যেন করুণার ক'টি ধারা। গায়ের শীর্ণতাটি যেন এই করুণায় ভিজে আছে। সরলতায় সিঞ্চিত মুখখানিতে, দু'টি অলস আকুল চোখে একটি কোমল নির্ভর, সমস্ত ভঙ্গিটিতে একটি সহায়হীন সমর্পণের ক্লান্তি। শিপ্রার জন্যে সৌম্যর কেমন হঠাৎ ব্যথা করে' উঠলো। তার বসে' থাকবার এই নির্বাক প্রতীক্ষাটি দেখে মনে হয় সংসারে তার যেন কেউ নেই, কোথা থেকে যেন সে কোথায় চলে' এসেছে। ভাগ্যিস, সে সৌম্যর কাছে এসে পড়েছিলো, নইলে কেউ কোনোদিন তার দুঃখ বুঝতো না, কেউ দিতো না তাকে এই স্নেহ, এতো কৃতজ্ঞতা। আর কোনো ঘরে চলে' গেলে কতো কষ্টে সে পড়তো না জানি, কে বা তখন তাকে দেখতো, কে বা করতো সেবা। তার উপর কতো অবিচার না-জানি হ'তো, কতো অমর্যাদা। ঈশ্বর তাকে রক্ষা করেছেন। সৌম্য শিপ্রার মুখখানি নিজের কাঁধের কাছে নামিয়ে আনলো। পিঠের উপর হাত বুলুতে-বুলুতে বললে,—না, তুমি শরীরের ওপর একটুও যত্ন নিচ্ছো না, শিপ্রা। এ ভালো নয়।

হাসির ঢেউয়ে শিপ্রা উঠে পড়লো। বললে,—বাবাঃ, এতোক্ষণ চুপ করে' থেকে এই বুঝি তুমি কথা বলতে পারলে ?

—না, এ ছাড়া আর কোনো কথা নেই। সৌম্য জোর গলায় বললে,—তুমি কাল থেকে বিছানায় চুপ করে' শুয়ে থাকবে, এক পা ওঠা-নামা করতে পারবে না। তুমি আমার কথার একটুও বাধ্য হও না কেন ?

—বেশ, সে-কথা বললেই তো হয়। শিপ্রা ঝাপ্‌টা মেরে উঠে পড়লো।

—সে কী, চললে কোথায়?

—তোমাব কথার বাধ্য হ'তে, বিছানায়, চিরকাল বিছানায় গিয়ে শুয়ে থাকতে। শিপ্রা গেলো দরজাব দিকে এগিয়ে: এর চেয়ে মানুষ আর কী স্পষ্ট করে' বলতে পাবে?

সৌম্য প্রমাদ গুনলে। তাড়াতাড়ি ছুটে গেলো তাকে ফিরিয়ে আনতে, তাকে ফিবিয়ে আনতে খানিক আগেকার সেই অনির্বচনীয় নিঃশব্দতায়, সেই তাদেব মাঝেকার সমাসীন প্রশান্তিতে।

শিপ্রা উঠলো ধম্‌কে: যাও, আগে আমাব কথাব বাধ্য হও। বসে'-বসে' বই পড়ো গে যাও। নেবো, বিছানা নেবো, তোমার ভাবনা নেই।

শিপ্রা তরতরিয়ে নিচে নেমে গেলো।

চৌদ্দ

টিপি-টিপি বৃষ্টি হচ্ছে সকাল থেকে। আকাশহীন দিন, ধূসর একটি অবসাদ দিয়ে তৈরি। দেয়াল দিয়ে ঘেরা, ছোট, ঘন এই ঘরটির বাইরে সৌম্যর জগতে আর কোনো পৃথিবী নেই সব গেছে মুছে, একাকার হ'য়ে। আর্দ্র, নিরানন্দ একটি আলস্যের অন্ধকারে সৌম্য সমস্ত শরীরে স্তূপীকৃত হ'য়ে পড়ে' ছিলো—ক'টা বেজেছে কে জানে, ঘড়ির দিকে তাকাবার পর্যন্ত তার উৎসাহ নেই। ছুটির দিনটা কাটছে তার একটা ভাবাক্রান্ত স্তব্ধতার মধ্য দিয়ে। কিছুই করার নেই, সেও যেন বৃষ্টিতে অস্পষ্ট, অবাস্তব হ'য়ে এসেছে, তার সমস্ত চেতনা, সমস্ত দৈহিকতা। ভালো কী মন্দ, না তার মাঝামাঝি একটা অবস্থা, কিছুই যেন তার বোধ নেই, সে ডুবে আছে বিশাল এক বিস্মৃতির কুয়াশায়। বৃষ্টি তার চারধারে এনে দিয়েছে একটি অপরিচয়ের রহস্য।

এখান থেকে পাশের ঘরে শুনতে পাচ্ছে সে শিশুর খেলার টুকরো চঞ্চলতা। সময়টা যে বিকেলের কাছাকাছি তা বোঝা পড়ছে তার ঘুম ভাঙা ছেলেকে নিয়ে সাজাবার ব্যস্ততায়, চায়ের ভূমিকার আড়ম্বরে। সহসা প্রখর হ'য়ে উঠেছে তার উপস্থিতি, চঞ্চলতায় এখানে ওখানে সে ছিটিয়ে পড়ছে। ভাসমান মেঘের আড়াল থেকে চাঁদের চকিত আবির্ভাবের মতো মাঝে-মাঝে উদ্ভাসিত হচ্ছে তার শরীরের জ্যোৎস্না, আপন পাতায় সে স্থির, কিন্তু দৃষ্টি চঞ্চল। দিনের দীর্ঘ বিলম্বিত ছায়া সে তার অনুভূতিতে এনে দিয়েছে বিষণ্ণ অস্পষ্টতা— শিপ্রাকেও তার মনে হ'লো এই অপরিচয়েরই একটা সুর। মনে হ'লো তাকে সে চেনে না, তার সঙ্গে কোনো জানা সম্পর্ক নেই, সংলগ্নতা নেই। বৃষ্টির আকাশে তারা দুই দিগন্তরেখার মতো উদাসীন। খোকাটা

কাঁদছে, যেন জলের সেই অবিশ্রান্ততারই একটা ছোঁয়া। সৌম্য তার আপন একাকীত্বে ভাসছে, মূলহীন বিচ্ছিন্নতায়, তার সমস্ত অস্তিত্ব যেন মৃত্যুর মাধুরীতে আছে ভিজে, কিছু-না-করার কিছু-না-হওয়ার অসীম মৃত্যুতে। সত্যি, বাঁচা কী কঠিন, কী কঠিন এই বাঁচবার দায়িত্ব হাতে নেয়া, তার চেয়ে অনেক কামনীয় এই বৃষ্টিস্নিগ্ধ অপরিচয়ের আকাশে মুছে যাওয়া, মুছে যাওয়া এই ভারহীন অশরীরিক প্রাণ।

হঠাৎ সিঁড়ির উপর থেকে কে কথা কয়ে' উঠলো, নীল এক-টুকরো আকাশের মতো তার স্বর—সৌম্যর সারা শরীর রুপোলী রোদে ঝলমল করে' উঠলো। হঠাৎ উঠে পড়ে' সে আলো জ্বালালে।

শিপ্রাকে দেখতে পেয়ে বনানী তাদের শোবার ঘরেও আগে ঢুকলো। গা থেকে রঙিন রেইন কোটটা খুলে নিতে নিতে বললে— সৌম্যবাবু বাড়ি আছেন?

—দেখতে পাচ্ছো না, শিপ্রা শুকনো কর্কশ গলায় বললে,—তোমার সাড়া পেয়েই পাশের ঘরে কেমন আলো জ্বলে' উঠেছে?

—ও। এতোক্ষণ তিনি অন্ধকারে বসে' ছিলেন নাকি? বনানী হাসলো।

—আগাগোড়াই তো অন্ধকারে বসে' আছেন। শিপ্রা সারা শরীরে একটা রুক্ষতার চমক এনে ঘর থেকে সরে' গেলো।

সরে' গেলো মানে বনানীকে পাশের ঘরে যাবার জন্যে সে জায়গা দিলে। বনানী চলে' যেতেই সে আবার তার ঘরের মধ্যে ফিরে এলো। দিলো বাইরে থেকে বসবার ঘরের দরজাটা ভেজিয়ে [illegible]। আস্তে যে প্রথম প্রার্থিত অভ্যর্থনার আকাঙ্ক্ষা তার কেউ তা লক্ষ্য করলে না।

সৌম্য দীপ্ত কণ্ঠে বললে,- আসুন। এই বৃষ্টিতে?

জানলার কাঠের উপর বনানী রেইন-কোটটা মেলে রাখলো। বললে,—বৃষ্টি বলে'ই তো বেরিয়ে পড়লুম। ভাবলুম বাড়িতে নিশ্চয়

আজ আপনাকে পাওয়া যাবে। ভালোমানুষের মতো ঘরের মধ্যে নিশ্চয় বসে' আছেন।

—হ্যাঁ, কী আর করি বলুন।

—হ্যাঁ, আমিও আর কোনো কাজ খুঁজে পেলুম না। বনানী গা থেকে জলের গুঁড়োগুলো ঝেড়ে ফেলে দিতে-দিতে বললে,—কিছুতেই মন টিঁকছিলো না ঘরের চাপা, ঠাণ্ডা গুমোটের মধ্যে। ভাবলুম আপনার ওখানে চলে' যাই।

—তা বেশ করেছেন। সৌম্য অভ্যর্থনায় অবাবিত হ'য়ে উঠলো: আমিও ভাবছিলুম আপনার ওখানে যাবো। বসুন, দিনটা কী বিশ্রী করে' যে এসেছে।

—ছাই যাবেন। বনানী তার বিসর্পিত আলস্যের বিলাসে সোফার উপর এসে বসলো, হাসি-মুখে বল্‌লে,—কতো দিন এর মধ্যে সুন্দর করে' এসে গেছে হয়তো, চোখেই পড়েনি আপনার। সেদিন ট্র্যামে দেখা হ'লো, কতো করে' কথা দিলেন, অথচ এ-পথটুকু আর পেরোতে পারলেন না। কী আপনার এতো কাজ তা-ও তো কই দেখতে পাই না।

—না, সত্যি আমি আজ যেতুম, সৌম্য অনাবশ্যক দৃঢ়তার সঙ্গে হঠাৎ বলে' উঠলো: আপনি না এসে পড়লে দেখতে পেতেন আমিই এতোক্ষণে আপনার ওখানে চলে' গেছি।

বনানী হেসে উঠলো: ভাগ্যিস বৃষ্টিটা এসেছিলো।

—হ্যাঁ, আপনার মনে হয় না, বৃষ্টিতে কেমন নিজের কাছেই আমরা অচেনা হ'য়ে উঠি, আমাদের থেকে কেমন আস্তে-আস্তে যাই মুছে। সৌম্য মুখোমুখি আরেকটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলো: কী যে চাই কিছু বুঝি না, কী যে কোথায় আছে তারো কোনো নির্দেশ নেই—চমৎকার একটা অস্পষ্টতা।

—তবে দিনটা ভারি বিশ্রী করে' এসেছে বলছিলেন কেন?

—এখন এই আলো জ্বালিয়ে তা দেখতে পেলুম। আমাকে আবার ঘিরে দাঁড়ালো আমার রূঢ় দৈনন্দিনতা। সৌম্যকে যেন ভারি ক্লান্ত শোনালো: আবার বাঁধা পড়ে' গেলুম খর্বিত একটা সুস্পষ্টতার মধ্যে।

বনানী বল্লে—এতোক্ষণ অন্ধকারে বসে' ছিলেন বুঝি?

সৌম্য হাস্লে: হ্যাঁ, নিজের অনাবিষ্কৃতির অন্ধকারে।

—তা হ'লে আলো জ্বালিয়ে সব মাটি করে' দিলুম বলুন?

—না, না, আলোটা বেশি উজ্জ্বল হ'য়ে জ্বললো না এই যা দুঃখ। সৌম্য হঠাৎ ব্যস্ত হ'য়ে জিগগেস করলে: বৃষ্টিটা এখন ধরে' গেছে বলতে পারেন?

—কেন বলুন তো, কোথাও বেরুবেন?

—হ্যাঁ, কোথাও বেরুতুম। চলুন না, কোথাও যাবেন? সৌম্য আপাদমস্তক শিহরিত হ'য়ে উঠলো: কী ছাই ঘরের মধ্যে বসে' আছি। আশ্চর্য, কথাটা আমার এতোক্ষণ মনেই পড়ে নি।

বনানী সৌম্যর মুখের দিকে দীর্ঘ চোখে তাকিয়ে রইলো: আমার বেরুবার জন্যে বৃষ্টিকে কখনো থামতে হয় না, দেখতেই তো পাচ্ছেন চোখের উপর। গেলে কোথায় যাবেন?

—সত্যি তো, কোথায়ই বা যাবো? সৌম্য হেসে উঠলো: আপনিই তো এসেছেন। আশ্চর্য, আপনি যে এসেছেন তা-ই আমি ভুলে গেছি।

তারপর অনেকক্ষণ তাদের মধ্যে কোনো কথা নেই—তাদের উপর নেমে এসেছে কথা-ধোয়া স্তব্ধতার আকাশ। দু'জন কেউ কাউকে দেখছে না, শুনছে না, স্পর্শ করছে না; অথচ দু'জনের মাঝে একটি অনস্বভূয় সান্নিধ্যের গভীরতা।

যখন কেউ কাউকে দেখলো, তখন একই সময় দু'জন দু'জনকেই দেখলো।

তার বিশাল স্তব্ধতায় সৌম্যকে যেন একটা অমানবিক আবির্ভাবের মতো দেখাচ্ছে। তার বিস্তৃত পেশলতায় সে ভয়াবহ, তার স্তম্ভিত বলিষ্ঠতায় সে সুন্দর। বনানী মুগ্ধ হ'য়ে গেলো, তার সমস্ত অস্তিত্ব অকিঞ্চিৎকরতায় এলো সঙ্কুচিত হ'য়ে। একপিণ্ড আগুনের মতো তার হৃদয় পুড়তে লাগলো তার বুকের মধ্যে, মনে হলো এক মুহূর্তে নিজেকে যেন সে উৎসর্গ করে দিতে পারে অমিতবল আকাঙ্ক্ষার কাছে, অপ্রতিরোধ্য দস্যুতার কাছে। যজ্ঞাগ্নির কাছে অরণির মতো। হ[illegible] কাঁচলি ভাবণ্য হার—সেও নিমেষে বিসর্জন করতে পারে সবন্ধ। [illegible] বনানী [illegible]সলো নিজের চিন্তার রমণীয়তায়।

সৌম্য দেখলো তার আকাশে হঠাৎ আজ এসেছে [illegible] দিন, অপারপরিধি সমুদ্রের উন্মুক্ততা। বনানী ব[illegible] থেকে [illegible] বাইরে যাবার সুর। শূন্যতা থেকে [illegible] এসেছে মুক্তি। [illegible] নিরাবেশ, নির্মল চোখে বনানীর দিকে তাকিয়ে রইলো [illegible] শাড়িতে ছোট-ছোট বৃষ্টির দাগ [illegible] আছে, সমস্ত [illegible] আছে যেন এই বৃষ্টির [illegible]। [illegible] দেখলো, অথচ কতো সহজে, [illegible] এতোটুকু তপস্যা না [illegible]। এই বৃষ্টির পর সূর্যোদয় যেন তবু অসম্ভব, কিন্তু বনানীর এই [illegible], যেন একবিন্দু অলৌকিকতা নেই। বনানীর উপস্থিতিটি [illegible] আপন প্রাচুর্যে একটি ফুলের মতো ফুটে আছে। সৌম্যর মনে [illegible], সেই ফুল যেন একদিন তারই জন্যে ফুটে ছিলো। সেদিন অনায়াসে সে তা ছিঁড়ে আনতে পারতো। আনতে পারতো বটে কিন্তু কে জানে, হয়ে থাকতো হয়তো এমনি ফুলদানির জিনিস। শুকনো, বিকৃত, অভ্যাসম্লান। না, তার জন্যে মূল্য দিতে হবে। প্রেমের জন্যে প্রাণহীন কর্তব্যের মূল্য। আবন্তের জন্যে অভ্যাসের মূল্য। কঠিনের সাধনা করতে হবে নিষ্ঠুর নিষ্ঠার সঙ্গে। তাই সে ফুল

আজ সাদা ফুল নয়, লাল ফুল, যাতে কামনার সঙ্গে আছে বিপ্লবের বন্ধুতা।

অসহ্য হ'য়ে উঠলো এই স্তব্ধতার প্রখরতা, কারো কথা ক'য়ে ওঠা দরকার।

সৌম্যর হঠাৎ তন্দ্রা ভেঙে গেলো পাশের ঘরের কোলাহলে। খোকা হঠাৎ তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠেছে, শিপ্রার হাত থেকে খসে' পড়েছে কী-সব বাসন-পত্র। গিরবানী কী কাজে যেন উপরে উঠে এসেছিলো, তার মুখের উপর ছিটকে পড়লো কতোগুলি ধমকের চাবুক। সাংসারিকতার দৌরাত্ম্যে সমস্ত বাড়ি ঘর যেন ওলোট-পালোট হ'য়ে যাচ্ছে।

সেই কোলাহলটা সৌম্যকে কথা বলতে সাহায্য করলো। সৌম্য বললে,—এখন একটু চা খেলে মন্দ হয় না।

বনানী টের পেয়েছে শিপ্রার অনুপস্থিতির তীক্ষ্ণতা। টের পেয়েছে তার নিজের এই নির্জনতার ভার। সেও একটা আশ্রয় পাবার জন্যে গলায় কথা খুঁজলে। বললে,—বসুন, আমি শিপ্রাকে ডেকে আনছি।

বনানী পাশের ঘরে চলে' গেলো। সৌম্য রইলো কান পেতে।

বনানী ঘরের বিশৃঙ্খলাটা বিশেষ লক্ষ্য করলো না। শিপ্রা খাটের বাজুতে চুপ করে' বসে' ছিলো, পাশে ছেলে দুলছে দোলনায়—বনানী বন্ধুতায় এক হাত তার পিঠের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললে—এখানে একা বসে' আছো কেন? ও-ঘরে চলো।

—তোমরা থাকো গে। পায়ের কাছে একটা চাদর পড়ে' ছিলো সেটা তাড়াতাড়ি গায়ের উপর জড়িয়ে নিয়ে শিপ্রা বললে,—আমার ভীষণ জ্বর এসেছে।

—বলো কী? বনানী তার গায়ে হাত দিতে গেলো।

বিছানার এক পাশে সরে' গিয়ে চাদরে মুখ ঢেকে শিপ্রা বললে,—থাক্।

বনানী অবাক হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো। বললে,—তোমার ছেলে যে কেঁদে খুন হচ্ছে, শিপ্রা।

শিপ্রা তেমনি নিষ্ঠুর নির্লিপ্ততায় বললে,—কাঁদুক গে।

—সে কী, ওকে একটু কোলে নাও। কাঁদতে-কাঁদতে যে টাক ধরে' যাচ্ছে। বনানী নিজেই গেলো দোলনার কাছে এগিয়ে।

শিপ্রা উঠলো খেঁকিয়ে : থাক্, ওকে আর তোমার ধরতে হ'বে না। কাঁদুক, কাঁদুক ওর যতো খুশি।

গোলমালটা আরো বেড়ে গেলো দেখে সৌম্য আর বসে' থাকতে পারলো না।

ভীত, বিরক্ত গলায় বললে,—কী হয়েছে ?

—শিপ্রার হঠাৎ জ্বর এসে গেলো। বনানী বললে।

ঘর-দোরের নির্লজ্জ নিঃসহায় অবস্থা দেখে সৌম্যর সারা গা রি-রি করে' উঠলো। ট্রাঙ্ক-বাক্সগুলোর ডালা খোলা, মেঝের উপর টাল করে' ফেলা বিছানাটা, ড্রেসিং-টেব্‌লটা ছত্রখান। ঘরের মধ্যে অকারণে পাখা ঘুরছে। কুঁজোর জল পড়েছে গড়িয়ে, আলনার কাপড়গুলো এলোমেলো। এমন-কি টেব্‌লের উপর ছোট টাইমপিস্‌টা পর্যন্ত মুখ থুবড়ে পড়ে' আছে। অথচ সমস্ত দিন ধরে' শিপ্রা কোমরে আঁচল জড়িয়ে এই ঘর-দোর ফিটফাট করেছে, বৃষ্টি এনে দিয়েছিলো তার মনে এই ঘর-সাজাবার সুর। মুহূর্তে কী যে কাণ্ডটা ঘটে' গেলো সৌম্যর জানতে আর কিছু বাকি রইলো না।

বিরক্তিতে সৌম্য উঠলো ঝাঁজিয়ে। দোলনায় খোকার দিকে আঙুল বাড়িয়ে বললে,—কিন্তু ও—ও কাঁদছে কেন ? ওকে শান্ত করাও না, ও-বেচারা কী দোষ করলো ?

শোয়া থেকে শিপ্রা হঠাৎ লাফিয়ে উঠলো। সমস্ত মুখ-চোখ তার ফোলা, নাকের ডগাটা লাল, শরীরের শীর্ণতাটা ছুরির ফলার মতো

খাবালো। কিছু যে তার একটা অসুখ করেছে তাতে সন্দেহ নেই। ঈগলের মতো সে ছোঁ দিয়ে পড়লো দোলনার উপর, ছেলেকে বুকের মধ্যে ছিনিয়ে নিয়ে এঁদো, দমকা একটা হাওয়ার মতো ঘর থেকে গেলো বেরিয়ে। যেতে-যেতে বল্‌লে,—ও কাঁদলে যদি তোমাদের গল্পের অসুবিধে হয়, তবে আমি নিয়ে যাচ্ছি ওকে।

বনানী ব্যাপারটা যেন কিছু তলিয়ে বুঝতে পারলো না। সৌম্যর মুখের দিকে ভাসা-ভাসা চোখে চেয়ে থেকে শুধোলে: ওর কী হয়েছে?

—এই জ্বর-জারি, অম্বলের অসুখ, সৌম্য তরল নির্লিপ্ততায় বল্‌লে, —কিছু হজম হচ্ছে না, দেখছেন না, মেজাজ কেমন খিটখিটে হ'য়ে গেছে।

—কিন্তু জ্বর নিয়ে এখন ও গেলো কোথায় ঠাণ্ডায়?

—ওর জ্বর কখন আসে, কখন যায়, দেবতারাও জানতে পারে না। গেছে হয়তো নিচে, রান্নাঘরে। সৌম্য বাইরের দরজার দিকে এগিয়ে এলো: চায়ের জোগাড় করতে হয় এখন, কী বলেন? বলে'ই সে হাঁক দিলে: গিরধারী! আমাদের চা কই?

মুখ কাঁচুমাচু করে' গিরধারী এসে হাজির। কাঁদ-কাঁদ গলায় বল্‌লে,—আমি কী করবো বাবু, এবার আমাকে মাপ করুন—

—কেন, তুই আবার কী করেছিস?

—আমি মা'র আর আপনার জন্যে ঠিক দু' পেয়ালা চা করে' আনছিলুম, মা হঠাৎ সেই পেয়ালা দু'টো ট্রে থেকে তুলে নিয়ে জানলা দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে দিলেন।

সৌম্য গলা ছেড়ে হেসে উঠলো, হেসে উঠলো তার অসহনীয় রাগ ও লজ্জা ঢেকে ফেলতে। হাসতে-হাসতে বল্‌লে,—মা শুনতে পেলে আর তোকে আস্ত রাখবে না, গিরধারী। নিজে ভেঙে ফেলে শেষকালে কিনা মা'র নামে চালাচ্ছিস। গিরধারী যেন কী প্রতিবাদ করতে

যাচ্ছিলো, সৌম্য হাসিমুখে বললে : যা, তোকে আর কষ্ট করে' চা করতে হ'বে না, কেৎলিতে করে' খানিকটা গরম জল নিয়ে আয়—দু'জনের আন্দাজ। আমরাই চা-টা করে' নিতে পারবো।

বনানী বললে,—স্বচ্ছন্দে।

সৌম্য ব্যস্ত হ'য়ে বললে,—চলে' আসুন, আমরা ও-ঘরে গিয়ে বসি।

আবার তারা দু'জনে যে যার জায়গায় গিয়ে বসলো। সৌম্য হঠাৎ কথার অবিশ্রান্ত ঝড় বইয়ে দিলে, হাল্কা খেলো খুঁটিনাটি কথা, অগুনতি অফুরন্ত কথা। যে-সব কথার কোনো দাম নেই, শুধু বলতে পারার মধ্যেই তাদের দাম। কথার গলিত অনর্গলতায় ধুয়ে নিয়ে গেলো সে সব ঘোলাটে স্তব্ধতা, আবহাওয়াটা সে কথার কিরণে খট্‌খটে করে' তুললে। এর আগে এতো ভয়ানক সহজ করে' এতো উচ্ছ্বসিত স্বাভাবিকতায় এতো সাধারণ কথা কোনোদিন সে বনানীকে বলতে পারে নি। বনানীও সেই কথার তরলতায় নিজেকে নিঃশেষ ঢেলে দিয়েছে। সহজ হওয়ার কী ভীষণ যন্ত্রণা! তার না পাওয়া যায় সীমা, না পাওয়া যায় তল। কোথাও থাকে না আবরণের এতোটুকু আশ্রয়, নিরাপদ এতোটুকু গোপনীয়তা। অথচ ভারি সহজ সে-সব কথা, নিতান্ত আটপৌরে। তাই তাদেরকে এতো ভয়, তাদের গায়ে লেগে নেই আর ভদ্রতার মৌখিকতা, সৌজন্যের চাকচিক্য। নেই আর বিদ্যাবত্তার ছটা, মৌলিক হ'বার চেষ্টা। জলের মতো অবিরল, নির্মল সে-সব কথা—সেই কথার স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে গেলো তারা পৃথিবী থেকে সমস্ত মানুষ, আকাশ থেকে সমস্ত তারা; ভাসিয়ে নিয়ে গেলো শিপ্রা ও তার ছেলেকে, তাদের কালকের প্রভাতকে, তাদের ঘিরে সমস্ত দূরত্বকে। শুধু কথা আর কথা, বাজে, বোকা, ছেলেমানুসি কথা—একের পর এক কথা বলতে-বলতে পরের-পর কথায় তাদের সাহস ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে—কী যে কখন কে বলে' ওঠে কিছুই আশ্চর্য নয়—

শুধু কথার পর কথার উন্মোচন। তাদের এই কথার বাইরে পৃথিবীতে আর কোনো উপস্থিতি নেই, নেই আর কোনো প্রতীক্ষা। শুধু তারা, আর তাদের বেষ্টন করে' এই কথার কুয়াশা।

কী অসহায় তারা, কী সীমানির্দিষ্ট। শুধু অসার কথার আশ্রয়ে আত্মগোপন। মনে-মনে লজ্জায় মলিন হয়ে যাচ্ছে অথচ ফের নির্লজ্জতাকেই লজ্জা।

গিরবালী সোপর্দ করা চায়ের জল নিয়ে এলে। সারা শরীরে হালকা হ'য়ে বনানী লাগলো চা করতে। আরো একদিন সে এমনি চা করেছিলো, কিন্তু বলতে কি, সেদিন যেন সে এতো সহজ ছিলো না। খোলের ভিতরে শামুকের মতো সেদিন তার ব্যবহারে ছিলো একটি ভদ্রতা লুকিয়ে, এমন উৎসারিত একটি স্বাচ্ছন্দ্য ছিলো না। সেদিন ছিলো দয়া, বাধ্যতা নয়। সৌম্য মুগ্ধ হ'য়ে বনানীর আঙুল ক'টির নাড়া-চাড়ার দিকে চেয়ে রইলো। সমস্ত ছবিটির মধ্যে কোথাও এতোটুকু আর অবিশ্বাস্য নেই, নিষ্ঠুর অপ্রতিরোধ্যতায় তা স্বাভাবিক। এ যেন সৌম্যের প্রাত্যহিকতারই একটা দৃশ্য। বনানী যেন কতোদিনের দীর্ঘ বিস্মৃতির ঘুম থেকে উঠে এসেছে।

বৃষ্টি আর নেই, জোরে বইছে হাওয়া। মখমলের মতো নরম আকাশের অন্ধকার। পথে লোকজনের আনাগোনা বেড়েছে, জলে-ভেজা মোটরের শরীরগুলো দূর থেকে দেখাচ্ছে সামুদ্রিক জন্তুর মতো। ভিজা রাস্তার উপর আলোর ছায়া পড়েছে, দাঁড়ানো বাড়ির সমুখগুলো জলে ভিজে কেমন রহস্যময়।

বনানীর সঙ্গে-সঙ্গে সৌম্যও জানালায় গিয়ে দাঁড়ালো। রেইন-কোট্টা হাতের উপর গুছোতে-গুছোতে বনানী বল্লে,—এবার যেতে হয়।

গায়ের উপর একটা ওভারকোট চাপিয়ে সৌম্য বল্লে,—চলুন, আপনাকে এগিয়ে দিয়ে আসি।

এইবার তারা যে যাবে আর সঙ্গচ্যুত হবেনা। ফিরবেনা তারা আর এই পুরোণো পৃথিবীতে। এই অভ্যাসের আবাসে।

কিন্তু যাবার আগে সামান্ত একটু ভদ্রতার পাঠ আছে। তাই—

বনানী গেলো শিপ্রার কাছ থেকে বিদায় নিতে। সৌম্যকেও তাই পিছে-পিছে শোবার ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়াতে হ'লো।

খোকা ঘুমিয়ে পড়েছে মেঝের উপর ছোট একটি বিছানায়, শিপ্রা বসে' আছে দেয়ালে পিঠ দিয়ে মেঝেরই উপর। ঘরের হাওয়াটা একটু পড়েছে, থম্‌থম্‌ করছে স্যাঁৎসেঁতে একটা নীরবতা।

বনানী এক পা এগিয়ে এসে বল্‌লে,—এ কী, এমনি চুপ করে' বসে' আছো কেন? তোমার না জ্বর?

শিপ্রা হঠাৎ সরে' বসলো, মুখ ফিরিয়ে বল্‌লে,—আমার আবার জ্বর! কখন আসে কখন যায়, কিছুই ঠিক নেই।

তার কথা বলার ধরণ দেখে বনানী অল্প একটু না হেসে থাকতে পারলো না, সৌম্যর দিকে তাকিয়ে করুণায় গলে গিয়ে বল্‌লে,—আপনাকে আর এগিয়ে দিতে হ'বে না, আমি একাই যেতে পারবো। বলে' সমস্ত শরীরে আকস্মিক দ্রুততার একটা দীপ্তি এনে সে তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলো।

পায়ের শব্দ তখনো হয়তো নিচে মিলিয়ে যায় নি, সমস্ত রাত্রি যেন ভেঙে গেলো শিপ্রার কঠিন আর্তনাদে: যাও, এক্ষুনি বেরিয়ে যাও বাড়ি থেকে। চুপ করে' দাঁড়িয়ে রয়েছ কী, প্রেয়সী যে পাখা মেলে উধাও হ'লেন।

সৌম্য অবিচল স্তব্ধতায় পাষাণ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

শিপ্রা আবার উঠলো খেঁকিয়ে: যাও, যাও আমার স্থমুখ থেকে। পথ যে ফুরিয়ে গেলো এতোক্ষণে। গেলে?

সৌম্য পকেটে দুই হাত ডুবিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। গম্ভীর,

নির্মম গলায় বল্‌লে,—যাবোই তো। তার জন্যে তোমার মত নিতে হ'বে নাকি? আমার বাড়ি, আমার ঘর—আমি যাই না-যাই তা আমার ইচ্ছে।

—ইস্‌, তোমার বাড়ি? শিপ্রা ঘৃণায় মুখ কুটিল করে' তুললো।

—যাকে খুশি জিগ্‌গেস করো। আমার ইচ্ছে মতো আমি লোক ডেকে আনবো, ইচ্ছে মতো দেবো তাড়িয়ে। তাতে কা'র কী বলবার আছে?

—তাই, তাই বেশ। দাও আমাদের তাড়িয়ে। শিপ্রা ছোঁ মেরে হঠাৎ ঘুমন্ত ছেলেকে বুকে তুলে নিলো, উঠে দাঁড়ালো স্খলিত আঁচলে, বল্‌লে,—কে থাকতে চায় তোমার এই পাপপুরীতে?

সৌম্য নিষ্ঠুর হাতে শিপ্রার বাহুটা চেপে ধরলো: তুমি ছেলে নিয়ে কোথায় যাচ্ছো? ও তোমার নয়, তোমার কোনো অধিকার নেই ওর উপর। ইচ্ছে হ'লে তুমি একা চলে' যেতে পারো।

—তাই, তাই যাবো।

কিন্তু টানাটানিতে খোকা উঠেছে কেঁদে। শিপ্রা কী করবে কিছু বুঝতে না পেরে, অগত্যা, যেন খানিকটা অভ্যাসবশতই ছেলেকে বসলো শান্ত করতে।

তাকে এখন কী দুর্বল, কী অসহায় যে দেখাচ্ছে। সৌম্যর মন সহসা আবার নরম হ'য়ে এলো। বিকেলে শিপ্রা আজ আর চুল বাঁধে নি, দিনের সেই দাগ-লাগা শাড়িটা অপার একটি ব্যর্থতার মতো এখনো তার গায়ে আছে জড়িয়ে। ঠাণ্ডা, অথচ গায়ে একটা জামা দেয়নি, সমস্ত শরীরে তার শীর্ণতাটি কাতর চোখে চেয়ে আছে! খোলা চুলে তার মুখখানি একেবারে শিশুর মতো অসহায়, বসে' থাকবার ভঙ্গিতে যেন একটি অতল রিক্ততা। কী যে সে করবে, বা কী যে সে করতে পারে, কিছুই বুঝতে না পেরে সে যেন শূন্যে থেমে আছে। দেখে

[illegible] হলো [illegible] [illegible] কপালের উপর থেকে [illegible] দিয়ে ঢুকে, আর, তার ছলোছলো অভিমানী [illegible] চোখের উপর ভেসে থাকে।

সৌম্য এ-দিক ও-দিক অসংলগ্ন পায়চারি করতে-করতে মুখ-ফেরিয়ে বললে,—আমি কী করতে পারি? যদি এসেই পড়ে কেউ কারুর বাড়ি, তবে ভদ্রলোকে আর কী করতে পারে? আমি তো আর [illegible]। আমি তো আর যাইনি পায়ে পড়ে'।

শিপ্রার দুই ঠোঁট ফুলে-ফুলে উঠতে লাগলো, কোনো কথা বললে না, চোখের পালকের ফাঁকে-ফাঁকে কণা-কণা জল আলোয় ঝিকমিক করে' উঠলো।

সৌম্য তেমনি আপন মনে পদচারণা করছে। আপন মনে বলছে: [illegible] দেখে আমি তো ঘরের কোণেই বসে' ছিলুম—আজকাল যে আমি আর কোথাও বেরুই না তা তো চোখের সামনেই দেখা যাচ্ছে,—আমার কী দোষ?

—এদিকে ঠাট করে' ট্রামে যে নিত্যি হাওয়া খাওয়া হচ্ছে! শিপ্রা বিষাক্ত জিভে একটা ছোবল মারলে।

সৌম্য থেমে গেলো। বললে,—বা, সে তো হঠাৎ একদিন দেখা হয়ে গিয়েছিলো। তার আমি কী করতে পারি? ট্রাম তো আর আমার নয় যে তাকে আমি নামিয়ে দেবো!

—কিন্তু বাড়ি তো শুনছি তোমার, শিপ্রার মুখ রাগে কুৎসিত হ'য়ে উঠলো; তবে এখান থেকে তাকে তাড়িয়ে দিতে পারলে না কেন?

—তুমিই পারলে? তুমিই তো তাকে তাড়িয়ে দেবার জন্যে [illegible] ছিলে, তোমারই মুখ দিয়ে বেরুলো একটা কথা? [illegible]
[illegible]

—কী করে' পারবো ? তার ভারটা বিকৃত ভঙ্গিতে প্রসারিত করে' দিয়ে শিপ্রা বিকৃততর মুখভঙ্গি করে' বললে,—এখানটা যে কেউ না হ'লে একেবারে চৌচির হয়ে যাবে।

—আহা, আবার কেন তোমার কী দায়! সৌম্য চাপা গলায় হেসে উঠলো।

সেই হাসিতে শিপ্রা উঠলো সর্বাঙ্গে দগ্ধ হ'য়ে, বললে,—আমি তাড়িয়ে দেবার কে, বরং আমারই তো বিতাড়িত হ'য়ে যাবার কথা। আমি আর কেন এখানে বসে' আছি ?

শিপ্রা ক্ষিপ্তের মতো উঠে পড়লো। কী সে করে তাই সৌম্য দেখতে লাগলো তীক্ষ্ণ চোখে। খোকাকে নিচেই একপাশে শুইয়ে দিয়ে এক-মুহূর্ত—হয়তো তারো এক অণুতম ভগ্নাংশ সে স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়ালো। তার সামনে ভয়াবহ বিশাল একটা ছায়ার মতো সৌম্যর স্থূল উপস্থিতিটা যেন তাকে অভিভূত, নির্জীব করে' ফেললে। কোনো দিকে সে পথ খুঁজে পেলো না, শীর্ণতার তীক্ষ্ণ হাহাকারে ছিটকে পড়লো সে খাটের উপর।

সৌম্য তাকে ফের দু' হাতে কুড়োতে গেলো, বললে—না, তোমাকে বলতেই হ'বে, কেন তাকে তাড়িয়ে দেবার কথা তোমার মনে আসে। না, বলো, কোথায় তোমার লাগে, কেন তুমি এমন ব্যবহার করছ। কী হয় যদি সে আসে, না, বলতেই হ'বে তোমাকে স্পষ্ট করে', কী হয় যদি আমরা গল্প করি, কেন তাকে চলে' যেতে বলবো, কেন তার সঙ্গে আমি মিশবো না ?

শরীরে যতো শক্তি ছিলো সমস্ত তার দশ আঙুলে ডেকে এনে শিপ্রা নিজেকে আঁকড়ে রইলো, আর সঙ্গে-সঙ্গে আর্ত, অন্ধ একটা চীৎকার করে' উঠলো : তাই যাও না, মেশো না গিয়ে প্রাণ খুলে। এখানেই আবার কেন ? এখানে সুবিধে না হয়, যাও না তার বাড়ি, দরজা তো তার খোলাই আছে দিন-রাত।

—বড্ড বেশি হোলো। সৌম্য ক্ষেপে উঠলো : তোমার মতো মন কারুর নয়, অতো অরুচি নয়। নিজের মতো পৃথিবীর আর-সবাইকে তুমি অমন খারাপ মনে কোরো না। তুমিই মানুষ কিছু লেখাপড়া শেখো নি; কুৎসিত সংস্কারের একটা পচা ডোবা হ'য়ে আছ, তাই বলে' তোমার সঙ্গে-সঙ্গে সমস্ত পৃথিবীও এমনি পচে' গেছে মনে কোরো না। পবিত্রতার তুমিই শেষ কথা নও।

সৌম্য ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

সে-রাত্রে শিপ্রা আর নিচে নামলো না, পড়ে' রইলো খাটের উপর। খাবার সময় পরেশবাবু প্রভৃতি পদে তাকে হারালেন। এতোক্ষণ পরে এই ঘটনার মধ্যে পরেশবাবুকে আমরা দেখতে পেলুম। প্রৌঢ়তার প্রগাঢ় একটি কান্তিতে তাঁর সমস্ত শরীর উদ্ভাসিত। চুলের বিরলতা তাঁর মুখে এনে দিয়েছে একটি উদার গাম্ভীর্য। বয়সের সঙ্গে-সঙ্গে চলতে-চলতে তিনি যে সময়ের সঙ্গেও চলেছেন সেই নবীনতার পরিচয় তাঁর দুই চোখে যেন জলছে।

গিরিধারী বল্লে,—মা-জির আজ ভারি জর এসে গেছে, কিছুতেই উঠতে পাচ্ছেন না।

চল্‌চলে মারাঠি চটিতে শব্দ করতে-করতে পরেশবাবু উপরে উঠে এলেন। দরজাটা খোলা, ঘর অন্ধকারে হা-হা করছে। দরজার একপাশে দাঁড়িয়ে ভারি গলায় তিনি ডাকলেন : বৌমা।

ডাক শুনে শিপ্রা সন্ত্রস্ত হ'য়ে উঠে বসলো। সর্বনাশ,—শ্বশুরমশাই। এ সে কী ঘর-দোরের ছিরি করে' রেখেছে! শিপ্রা চারদিকে অন্ধকার দেখতে লাগলো। পরমেশবাবু আবার ডাকলেন। শিপ্রা আলো জ্বালালে।

—তোমার নাকি আবার জর এসেছে, বৌমা? পরমেশবাবু মুঠোর মধ্যে আলগোছে তার একখানি হাত তুলে নিলেন।

চোখ নামিয়ে শিপ্রা বল্‌লে,—শরীরটা আর ভালো নেই।

—ডাক্তারে কিচ্ছু হ'বে না, পরমেশবাবুর দুই ভুরুতে কপাল যেন অন্ধকার করে' এলো : কোথাও চেঞ্জেই যেতে হ'বে।

শিপ্রা আবদারে একটু আনুনাসিক হ'য়ে উঠলো : বা রে, কা'র সঙ্গে আবার চেঞ্জে যাবো ?

—কেন, আমার সঙ্গে। ক'দিনে আর সৌম্যর কী অসুবিধে হ'বে ? একা-একা খুব চালিয়ে নিতে পারবে দেখো।

শিপ্রা সর্বাঙ্গে ছটফট করে' উঠলো : না, চেঞ্জে গিয়ে কী হ'বে ? এমনি'তেই আমি ভালো হ'য়ে যাবো, বাবা।

—তার তো কোনো সূচনাই দেখতে পাচ্ছি না। পরমেশবাবু তার হাতখানি আরো নিবিড় করে' চেপে ধরলেন : এমন বিচ্ছিরি বাদলা, অথচ গায়ে একটা গরম জামা দাও নি। সমস্ত রাজ্যের বিছানা দেখছি খাট থেকে নিচে নামিয়ে এনেছ। ও কী, দাদুকে তুমি মেঝের ওপর শুইয়েছ নাকি ?

শিপ্রা ত্রস্ত ক্ষিপ্রতায় খোকাকে বুকের মধ্যে তুলে নিলো। হাল্‌কা হ'বার চেষ্টা করে' বল্‌লে,—বিছানার ওপর যতো রাজ্যের ধুলো-বালি পড়েছিলো, তাই ওগুলো টেনে নামিয়ে এনেছিলুম। এই এক্ষুনি সব ফের গুছিয়ে ফেলছি। ওকে একটু ধরুন না।

ঘুমন্ত খোকাকে হাত বাড়িয়ে সন্তর্পণে তুলে নিতে-নিতে পরমেশবাবু বল্‌লেন,—তুমি কেন অমন রোগা শরীর নিয়ে বিছানা বইতে যাবে ? তুমি গরম জামা গায়ে দাও, চুল বাঁধো—তোমরা, আজকালকার বৌরা হয়েছ কী ? কপালটা একটা শুকনো মাঠ হ'য়ে আছে, এক ফোঁটা নেই সিঁদুর। ঘরে শাশুড়ি নেই বলে' যেন একেবারে টাঙে উঠে বসে' আছ। যাও, লক্ষ্মী মেয়ের মতো চুল-টুল বেঁধে ভদ্রলোক সাজো চট্‌ করে', আমি গিরিধারীকে ডেকে দিচ্ছি।

অগত্যা, প্রায় বাধ্য হ'য়েই, শিপ্রাকে শাড়ি বদ্‌লে গায়ে মোটা দেখে একটা ব্লাউজ চাপাতে হ'লো, বসতে হ'লো এসে আয়নার সামনে। তার শরীর যে অসুস্থ, ধীরে-ধীরে মুছে যাচ্ছে যে তার চামড়ার জৌলুস, শুকিয়ে যাচ্ছে যে তার লালিত্যের তরলিমা—সবাইর মুখে এ-কথা শুনতে আর তার ভালো লাগে না। কী সে হারালো তার হিসেবটাই সবাই খতিয়ে দেখছে, কী যে সে পেলো তা আর কেউ দেখছে না। [illegible] তিন গুছি করে' বিনুনি পাকিয়ে কোনো রকমে সে একটা খোঁপা বাঁধলে,—হায়, বাঁধতেই হ'লো তাকে। কিন্তু সিঁদুরের কৌটোতে আঙুল ডুবিয়ে কিছুতেই যেন সে কপালে ছাপ তুলতে পারবে না। তার পরাজয়ের, তার বন্দীত্বের ছাপ। কিন্তু সেই মুহূর্তে পরমেশবাবু গিরধারীকে নিয়ে ঘরের মধ্যে ফের এসে পড়েছেন। হাতটা শিপ্রার দুর্বলতায় কেঁপে উঠলো, কপালে, হায়, নিখুঁত উঠে গেলো সিন্দুরের সেই চিহ্ন।

পরমেশবাবু বল্‌লেন,—বাঃ, লক্ষ্মী মেয়ে। এখন ধরো তোমার ছেলে। গিরধারীকে বিছানাটা এবার দেখিয়ে দাও।

গিরধারী বিছানাটা পরিপাটি করে' তুললো। পরমেশবাবু ঘরের আনাচে-কানাচে এতোটুকুন বিশৃঙ্খলাও আর থাকতে দিলেন না।

বল্‌লেন,—সৌম্য কোথায়?

শিপ্রা বিছানার দেয়ালের প্রান্তে খোকাকে শুইয়ে দিয়ে বল্‌লে,—জানি না। কোথাও বেড়াতে গেছেন হয়তো!

পরমেশবাবু চমকে উঠলেন: বেড়াতে গেছে বলছো কী? এতো রাত করে'—এই বিচ্ছিরি ঠাণ্ডায়?

—রাত করে' ঠাণ্ডায় বেড়াতেই তো ভালো।

—ভালো আমি বা'র করছি। পরমেশবাবু হঠাৎ হাঁক পাড়লেন: সৌম্য।

পাশের ঘরটা অন্ধকার। সেই অন্ধকারের মধ্য থেকে সৌম্যর উৎকণ্ঠিত শব্দ এলো : এই যে বাবা, আমি এখানে।

শিপ্রা লজ্জায় গেলো এতোটুকু হ'য়ে।

—এখানে আয় দিকি, শুনে যা।

সৌম্য এসে দেখলো ঘরে কে ইন্দ্রজাল বুনে দিয়েছে। পবিত্র, প্রসন্ন একটি পরিচ্ছন্নতায় সমস্ত ঘর হাসছে। শিপ্রাও পর্যন্ত তার সঙ্গে মিলিয়েছে একটি সুর, নরম, নিচু, লঘু একটি সুর। বহুদিনের পুরোনো চিঠির নতুন আবিষ্কারের মতো সুন্দর একটি বিস্ময় দিয়ে সে তৈরি। ধুয়ে গেছে সময়ের সব ধুলো, আবার তাকে, চিঠির প্রত্যেকটি অক্ষরকে সে পড়তে পারছে।

কিন্তু সৌম্যর চোখে পরিচ্ছন্নতার এই নির্বাক স্তুতি শিপ্রাকে সর্বাঙ্গে যেন প্রহার করতে লাগলো।

পরমেশবাবু বল্লেন,—কী করছিলি ওখানে ?

—এই বই পড়ছিলুম বসে'-বসে'।

পরমেশবাবু না হেসে থাকতে পারলেন না : তোর এখনো পড়া! তা-ও অন্ধকারে বসে'।

সৌম্য হেসে বল্লে,—না, শেষকালে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম যে।

—কেন তোর আর ঘুমোবার জায়গা নেই ? শেষকালে বই শিয়রে করে' চেয়ারে বসে' ঘুমোতে হ'বে ? রাত্রে কি আজ আর খেতে হ'বে না নাকি ? যা শিগগির, ঠাকুর কতোক্ষণ খাবার নিয়ে বসে' আছে।

সৌম্যকে নিচে পাঠিয়ে দিয়ে পরমেশবাবু শিপ্রাকে লক্ষ্য করলেন : তুমি আজ শুধু একটু দুধ খেয়ে থাকো। দুধের নামে নাক সিঁটকাতে পারবে না। আমি দিচ্ছি ঠাকুরকে পাঠিয়ে। দুধটা খেয়েই শুয়ে পড়ো। অসুখ শরীরে বেশিক্ষণ রাত জেগো না বলে' দিচ্ছি।

সব গোছগাছ করে' দিয়ে পরমেশবাবু তাঁর নিজের ঘরে বিদায়

নিলেন। নির্জন অন্ধকারে বসে' তাঁর মনে পড়তে লাগলো তাঁদের সেই মধুর দাম্পত্যকলহের অতীত নিঃশব্দতাগুলি। কতোক্ষণ চুপ করে' থেকে সেই নিঃশব্দতা হঠাৎ কেমন করে' আবার গলে' যেতো নিঃশব্দতায়। ঝগড়াগুলি যখন অসামঞ্জিক দেখা দিতো, তখন কেমন পারিবারিক প্রয়োজনের সঙ্গে সজ্ঘর্ষ লেগে-লেগে সেই বিচ্ছেদগুলিতে জোড়া লেগে যেতো আপনা-আপনি—আবার সেই স্বাভাবিকতার স্রোত। মনে-মনে সেই সব হারানো দিনগুলি হাতড়ে-হাতড়ে পরমেশবাবু ঘুমিয়ে পড়লেন।

ঝগড়াটাই শুধু তিনি দেখেছিলেন, কিন্তু কারণ পানেন নি তার কোনো আঁচ করতে। দাম্পত্যকলহের যে একটা কারণ থাকতে পারে এটা তাঁর অভিজ্ঞতায়ই কোনোদিন আসে নি।

সৌম্য আঁচিয়ে উপরে উঠে এসে দেখলো সেই দৃশ্য আবার কখন উঠে গেছে। সব আছে ঠিকঠাক, শুধু শিপ্রার গায়ে নেই সেই জামা, মুছে গেছে সেই ফর্সা শাড়িটা, খোপা পড়েছে খসে', কপালে আবার সেই সুতীব্র শুষ্কতা—মেঝের উপর শুকনো একটা মাদুর বিছিয়ে বিনা-বালিসে শুয়ে আছে। দুই চোখে সৌম্য বিবর্ণ হ'য়ে উঠলো। আবার তাকে এ নিয়ে বলতে হ'বে আরো অনেক কথা, করতে হ'বে নানা ভাবে নানারকম সাধ্যসাধনা, এখনো তাকে খানিকটা সময় চুপ করে' থাকতে দেয়া হ'বে না—সৌম্য অসহায়ের মতো হাত কচলাতে লাগলো। একবার মনে হ'লো, থাক্ ও অমনি পড়ে', কী তাতে তার এসে যায়, তার জীবনের পূর্ণতার কাছে শিপ্রা কী, কতোটুকু তার দাম? কিন্তু পরক্ষণেই তার শোয়ার সেই মলিন, করুণ বঙ্কিমা দেখে সৌম্যর মন আহত একটা আর্তনাদ করে' উঠলো। অসুখ করবে যে ভয়ানক! একে এই রোগা শরীর, তায় রাত জরে' এই মেঝেয় পড়ে' থাকলে সে বাঁচবে না। সে থাকবে খাটে শুয়ে—আর নিষ্ঠুর একটা

ছন্দপতনের মতো শিপ্রা থাকবে মাটিতে, সৌম্য অস্থির হ'য়ে উঠলো। বল্লে, —তুমি এইখানে এমনি শুয়ে থাকবে নাকি?

শিপ্রা কোনো কথা বললো না। আঁকাবাঁকা ভঙ্গুর কর্কশ ক'টি রেখায় নিঝুম হ'য়ে পড়ে' রইলো।

সৌম্য ক্লান্ত, মূর্ছিত গলায় বল্লে—এ কী অন্যায় কথা। বিছানায় উঠে এসো বলছি। অসুখ বেড়ে যাবে যে।

শিপ্রার তবু সাড়া নেই।

—তুমি নিজেই একবার ভেবে দেখ না, সৌম্যর স্বর অনুনয়ে নেমে এলো: আমার আর করবার কী ছিলো? যা ঘটলো তাতে আমার কী হাত? আমি তো বাড়িতেই বসে' ছিলুম। যদি আমার সামনে এসেই পড়ে কেউ, কী করে' বলা যায় যে আমি বাড়ি নেই? আমার কী দোষ? তুমিই তো তাকে ঠেলে আমার ঘরে পাঠিয়ে দিলে। ওঠো, উঠে এসো বলছি।

সৌম্য নিচে নেমে বসলো তার পাশে। তার শোয়ার এই সমর্পিত বিশ্রান্তিটি তাকে, তার সবল সুমহান পৌরুষকে যেন ধ্যান করছে, তার বিশাল অস্তিত্বের আশ্রয়ে নিরাপদ, নিশ্চেতন একটি শান্তি। তার শোয়ার এই সুদূর নিঃসঙ্গতাটি দেখে সৌম্যর আবার মনে পড়লো সংসারে সে ছাড়া শিপ্রার আর কেউ নেই, তারই ছায়ার শীতল প্রসারণের নিচে ছোট একটি ঘাসের মতো সে স্তিমিত চোখে চেয়ে আছে। সৌম্য ছাড়া তার এই দুঃখ বুঝবে কে, তার এই অপ্রতিকরণীয় দুঃখ, বিশাল বিস্তীর্ণ এই নিঃসঙ্গতা। বোঝবার মতো সৌম্যর ছাড়া কা'র আর ছিলো সেই উদার কল্পনা? ভাগ্যিস, শিপ্রা তারই হাতে এসে পড়েছিলো, তারই সম-মমতার পরিমণ্ডলে, নইলে কে বা করতো তাকে মায়া, কে বা করতো তাকে অনুভব! হয়তো কতো দুঃসহ দারিদ্র্যে তাকে পুড়তে হ'তো, কতো নির্লজ্জ নিষ্ঠুরতায়? সে ছাড়া শিপ্রার

আর কে আছে? জলের মতো অসহায় অপ্রতিবাদে সে তার সঙ্গে মিশে গেছে, ছড়িয়ে পড়েছে রাত্রির অশরীরী অনুভূতির মতো। দেখে সৌম্যর অসহ্য মায়া করতে লাগলো, তার রুক্ষতায় অব্যাহত এই নিঃসঙ্গতা দেখে। পাণ্ডুর দু'টি ঠোঁটের কিনারে শীর্ণ একটি কান্না আছে ঘুমিয়ে, দুইখানি নিরবলম্ব, অসহায় হাত মা-হারা সন্তানের মতো লুটিয়ে পড়েছে তার বুকের কাছে। অসম্ভব তার থেকে মুছে যাওয়া, অসম্ভব তাকে বুকের ঘনতায় উত্তপ্ত করে' না তোলা। সৌম্য হাত বাড়াতে যাবে বলে' সারা শরীরে মধুর একটি অবসাদ অনুভব করলো, বল্‌লো: ছি শিপ্রা, তুমি তো একবার বিচার করে' দেখতে পারো। এর মাঝে কোথাও এতোটুকু অশোভন নেই, অশুচি নেই। কেন তবে তুমি— সৌম্য তার চুলের উপর ছড়িয়ে দিতে গেলো তার স্পর্শের দাক্ষিণ্য।

'তারই শুধু মায়া, আর তার জন্যে শিপ্রার এতোটুকু মায়া নেই কেন? তার মন যাতে খুশি হয় তাতে সে হাসিমুখে কেন সায় দেয় না? সে কেন তার দুঃখ বোঝে না? কেন শুনতে পায়না তার আত্মার দীর্ঘশ্বাস? কেন সে এতো ছোট হ'য়ে থাকে, কালো হ'য়ে থাকে? এতো দিতে পারে, আর এটুকু দিতে পারেনা?

শিপ্রা প্রত্যক্ষ একটা প্রতিবাদের নিষ্ঠুরতায় দেয়ালের ধারে নিজেকে ছুঁড়ে ফেললে। বল্‌লে,—খবরদার আমাকে ছুঁয়ো না। আমি অশুচি, আমি খারাপ—আমার চেয়ে পৃথিবীর আর-সবাই সতী, আর-সবাই ভালো। আর-সবাই তোমার মতো চরিত্রে একেবারে ঝল্‌মল্ করছে।

শিপ্রা উচ্ছ্বসিত বেদনায় নিজেকে হঠাৎ ঢেলে দিলে। স্বামীর কাছ থেকে এমনি একটি সম্পূর্ণ নিমন্ত্রণ যে সে প্রত্যাশা করছিলো না তা নয়, বরং ঘরে সে আলো রেখেছিলো জ্বেলে যাতে তার এই প্রতীক্ষার স্বরটি সৌম্য স্পষ্ট শুনতে পায়। কিন্তু তার মুখে এখনো সেই বনানীর কথা, তাকে সে কিছুতেই মন থেকে মুছে ফেলতে পারছে না, প্রতিটি

মুহূর্তে বেজে চলেছে তারই নিশ্বাসের ওঠা-পড়া। যেন সৌম্য আর শিপ্রার মাঝে আর কোনো কথা নেই, নেই আর কোনো স্তব্ধতা। শিপ্রা কান্নায় ধুয়ে যেতে লাগলো।

সৌম্য উঠে দাঁড়ালো, উড়ে গেলো সেই ক'টি মুহূর্তের সোনালী সম্মোহন। কটু, বিষাক্ত গলায় বল্‌লে,—যতো খুশি কাঁদো না, কিছু তাতে কারুর এসে যায় না, কিন্তু বিছানায় উঠে এসো বলছি। ঠাণ্ডায় শুয়ে অসুখ করে' আমার পয়সা খরচ করার তোমার অধিকার নেই।

শিপ্রা দেয়ালের সঙ্গে মিশে আছে।

—যদি না যাও তো আমি জোর করে' তোমায় তুলে নিয়ে যাবো।

শিপ্রা উঠলো তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চেঁচিয়ে। বল্‌লে,—চ্যাঁচাবো, ভীষণ চ্যাঁচাবো কিন্তু। সমস্ত বাড়ি জাগিয়ে দেবো বলে' রাখছি। যা-তা বলবো সবাইর মুখের ওপর। সরে' যাও—অসহায়, অন্ধ শিপ্রা নির্বুদ্ধি বিমূঢ়তায় হঠাৎ একটা গালি পেড়ে বসলো।

সৌম্য গেলো সরে', থেমে, ছোট হ'য়ে। পিঞ্জরাবদ্ধ বন্য পশুর মতো নিষ্ফল আক্রোশে লাগলো পাইচারি করতে। একটাও কথা বললো না, আলো নিভিয়ে দিয়ে নিজেই শুতে গেলো মশারি ফেলে।

কিন্তু ঘুমের কল্পনা করাও অসম্ভব। ঘরের ভিতরটা চাপা একটা ভারের মতো যেন তাকে পিষে ফেলছে। তবু বহুক্ষণ চোখ বুজে প্রত্যাশা করতে লাগলো সেই ভারের বিমোচন, ক্ষমায় নমনীয় হ'য়ে শিপ্রার একটি সলজ্জ, বিস্তৃত বশ্যতা। প্রত্যাশায় ক্ষয় পেয়ে-পেয়ে ঘুমিয়েও পড়েছিলো হয়তো একটু, স্বপ্নের একটা ঢেউ লেগে সে-ঘুম গেলো ভেঙে, হাত বাড়িয়ে খুঁজতে গেলো সেই স্বপ্নকে—কিন্তু শয্যাময় প্রজ্জ্বলিত একটি অনুপস্থিতি। শিপ্রা তখনো শুয়ে আছে মাটিতে, আপন স্পর্ধিত নিঃসঙ্গতায়।

মশারি তুলে সৌম্য নিঃশব্দে পা ফেলে-ফেলে ছাদের উপর উঠে

গেলো। রাত তখন অনেক, ভিজা আকাশে কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ লাল হ'য়ে অস্ত যাচ্ছে। সমস্ত রাত্রি ছড়িয়ে পড়েছে সুতীব্র একটা নির্জনতার স্রোতো। সেই নির্জনতায় সৌম্য বুকে সাহস, পেলো, চিন্তায় পেলো তীক্ষ্ণ, দুর্নিবার সুস্পষ্টতা। নিজের আত্মার সঙ্গোপন গুহা থেকে ছাড়া পেয়ে লাফিয়ে পড়লো যেন সে পৃথিবীর বিপুলতায়। ধোঁয়ায় ও কুয়াশায় ফুলের প্রাণনা যেমন ক্লিষ্ট হ'য়ে থাকে, তেমনি সে আবৃত, সঙ্কুচিত হ'য়ে ছিলো তার নিশ্ছিদ্র প্রাত্যহিকতায়। আজ সে ছাড়া পেয়ে চলে' এসেছে যেন বিরাট এক আরম্ভের উন্মুক্তির মধ্যে।

সত্যি, ভালোবাসতে না পারলে সে বাঁচবে না, বাঁচবে না এই তৃষ্ণাহীন অভ্যাসের অন্ধকারে বসে' মৃত্যুময় মুহূর্ত গুনতে। তার চারধারে এসেছে নতুন হাওয়া, নতুন অন্ধকার, জীবনে নতুন সম্ভাবনা। সে থাকবে না আর থেমে, আপনার মাঝে কুঁকড়ে, গুটিয়ে, নিরুত্তর, নিস্পন্দ হ'য়ে। সে বাঁচবে, আত্মসম্পূর্ণ, আত্ম-সর্বস্ব হ'য়ে বাঁচা। অগ্নিশিখার মতো নির্ধূম, নিরাবরণ বাঁচা, বিকশি[illegible] [illegible]লব বিহ্বল উন্মোচনের মতো। পৃথিবীতে সব চেয়ে বড়ো তাগিদ এই বাঁচায়, আত্মায় নিহিত এই গহনতায়: অনন্তের অতল শান্তি বিশেষ একটি এক হওয়ায়, একক হওয়ায়। সৌম্য তেমনি এক হ'য়ে বাঁচবে তার এই অনুভবের একাকীত্বে। তার স্বসম্পূর্ণ স্ব-অর্থক বাঁচার কাছে তুচ্ছ, তুচ্ছ আর সব বিবেচনা, বলতে গেলে, তার বাঁচার বাইরে আর কোনো বিবেচনাই নেই। সে বাঁচবে, সমস্ত শরীরে পান করবে সে এই অগ্নিময় চেতনার ধারা, সে ভালোবাসবে, নিজের জীবনে লাভ করবে সে অপরূপ রূপান্তর। সুযোগ সে হারাবে না, নিজের মাঝে সঞ্চারিত করে' দেবার এই মদির সুখস্বাদ, নিজের মাঝে উদ্ভাবন করবার এই জলন্ত অন্ধকার। জলে' উঠেছে তার অন্ধকার, মধুর মূর্ছায় মুছে যাচ্ছে তার শরীরের সসীমতা। বনানী, বনানী, শব্দ দু'টো সৌম্যর দুই ঠোঁটের ফাঁকে ছোট

একটি পাখির মতো পাখা ঝাপ্‌টে উঠলো, মিলিয়ে গেলো অন্তর্লীন আকাশের ধূসরতায়। সমস্ত শরীরে সে বীতবর্ণ আকাশের মতো হাল্‌কা হ'য়ে গেলো, খুঁজে পেয়েছে সে তার ভাষা, তার মুক্তি; ঝরিয়ে দিয়েছে সে তার যতো পরিচয়ের ভার, সময়ের সঞ্চয়। সে নতুন ক'রে' জন্মালো তার নিজের শরীরে, মনের এই উলঙ্গ শৈশবে। কী সে চায় এতোদিনে স্পষ্ট তাকে আবিষ্কার করতে পেরে সৌম্য অরণ্যচারী নির্লিপ্ত পশুর মতো উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠলো। জীবনে সে কী অসীম মুক্তি এই এক-হওয়ায়, একান্ত ক'রে' এই একাকী হ'য়ে যাওয়ায়। সৌম্য তার কোনোদিকে ফিরে চাইবে না, সে স্পষ্ট কণ্ঠে এখন কথা বলতে পারছে, দেখতে পারছে অনাবৃত নিজেকে। আর তার ভয় নেই, লজ্জা নেই, নিজেকে মেলে ধরতে পারছে রাত্রির গভীর নিঃশব্দতার কাছে।

হ্যাঁ, বনানীকে সে ভালোবাসে, তাকে তার চাই, বনানীকে, যে একদিন অনায়াসে তার হ'তে পারতো, সমগ্র তার। সময় এখনো যায় নি ফুরিয়ে, সময় কোনোদিনই ফুরোয় না, আজো সে তার, একান্ত তার, একাকী তার। সে তার জীবনে নিয়ে এসেছে নতুন নির্জনতা, নতুন আয়তন, নতুন পারিপ্রেক্ষিত। নিয়ে এসেছে সমুদ্রময় নীল নিশ্চিহ্নতা, সময়হীন বিরাট বিস্তৃতি। কোনোদিন সৌম্য তার ইশারা পায়নি। তার যৌবনের অটল দুর্ভেদ্যতায়, তার অক্ষরের অন্ধকার অরণ্যে, ইশারা পায়নি প্রেমের এই দুরারোহ দূর ধূসরতার। সেই বাঁচা থেকে এতোদিন সে বঞ্চিত ছিলো, নির্বাসিত ছিল সে তার বইয়ের কয়েদে। পরের মত কুড়িয়ে সে বেড়েছে, পরের মুখ চেয়ে সে এতোদিন বহুজনের একজন হয়েছে মাত্র, আজ আর তার নিজেকে ঠেকিয়ে রাখা অসম্ভব, আজ সে একের মাঝে অগণন। কোথায় কী হচ্ছে তাতে তার কী, নিজে সে হ'য়ে উঠতে পারলেই যথেষ্ট। লক্ষ জীবন, লক্ষ মৃত্যুতে কিছু এসে যায় না, চাই তার এই বাঁচবার আনন্দ, এই আনন্দের সার্থকতা।

তার বাঁচবার, তার সম্পূর্ণ হ'বার প্রয়োজনের কাছে শিপ্রা কী, কতোটুকু;—কতোটুকু তার অস্তিত্ব, কতোটুকু তার দাম। তার মৃত্যুতেও কিছু এসে যায় না, যদি সে বাঁচে, যদি সে বাঁচে এই তার বাঁচবার প্রচুরতায়।

রাশীকৃত অন্ধকারের ভার থেকে ছাড়া পাবার জন্যে আকাশ আর্ত নিঃশব্দতায় চীৎকার ক'রে উঠেছে—কতোক্ষণে উঠবে সূর্য। কী আশ্চর্য, কতোক্ষণে উঠবে সূর্য, আবার সূর্য উঠবে। সূর্যের পিপাসায় সৌম্যর সমস্ত রক্ত লাল হ'য়ে উঠলো। আবার সূর্য উঠবে, সেই সূর্যে আবার একটি দিন, জীবনকে আবার একটি সম্ভাষণ। সেই সূর্যের আলোয় সৌম্য মেলে ধরবে তার প্রেম, তার নবীন অভ্যর্থনা।

পনেরো

শিপ্রা একেবারে বিছানা নিলে। শরীরে দিলো না আর উপেক্ষা করতে, পরমেশবাবু তার উপর কড়া পাহারা রাখলেন। তাঁর একটা কাজ মিলে গেলো, সেই তৎপরতাকে এড়িয়ে যাবার শিপ্রা আর কোনো পথ দেখলে না। দিনে-দিনে, শেষকালে, বাধ্য হ'য়েই তাকে মিশে যেতে হ'লো বিছানায়।

সৌম্য এ ক'দিন মাড়ায় নি এ ঘরের চৌকাঠ। দরকারো ছিলো না কিছু, বাবাই যথাবিধি সব ব্যবস্থা করছেন। চিকিৎসার কোনোই সে ত্রুটি রাখে নি, বিছিয়ে দিয়েছে আরামের রমণীয়তা। ছেলের জন্যে রেখে দিয়েছে একটা আয়া, সেবার জন্যে আনিয়েছে তার এক বিধবা কাকিমাকে। প্রায় বড়োলোকের ঘরের বউ, অসুখ করেছে, তার সামাজিক মর্যাদাটা সে বোঝে। পাড়াপড়শী আত্মীয়-স্বজন যারা সব একটা করবার মতো কাজ পেয়ে তাকে দেখতে আসে, তারা যেন সেই সঙ্গে দেখে যেতে পাবে সৌম্যর অটুট কর্তব্যবোধ, তার সাংসারিক স্বচ্ছলতা, সে তার নিখুঁত বন্দোবস্ত করে' রেখেছে। স্বয়ং শিপ্রারো কিছু অভিযোগ করবার থাকতে পারে না—রোগী হিসেবে। এবং, বলতে গেলে, এখন তো সে রোগীই। রোগী বলে' তার ঘরে প্রায় সব সময়েই একজন না-একজন লোক, সৌম্য সেখানে অবান্তর। সে ও-সব কিছু বোঝেও না, রোগীর খেজমৎ, কখন কী লাগবে ফর্দ দাও, দাম দিচ্ছি। বিছানাটা পর্যন্ত সে পাশের ছোট ঘরটায় সরিয়ে এনেছে —রোগীর নিশ্চিন্ততাকে সে আহত করতে চায় না। রাতের জন্যে একটা নার্স রেখে দেবে না হয়—যতো লাগে। সারা দিনে শিপ্রার সঙ্গে তার চোখাচোখি একটিবারো দেখা হয় না, টুকরো টুকরো খবর

বাবার মুখেই সে শুনতে পায়। শুধু শুতে যাবার আগে, ঘুমে হারিয়ে যাবার আগে, অজ্ঞানতে মন আবার তার অন্ধকারে ঠাণ্ডা হ'য়ে আসে, শিপ্রাকে আবার একটু কাছাকাছি পেতে ইচ্ছা করে। ঘর কখন ফাঁকা হয় তারই জন্যে খুঁজে ফেরে অবকাশ, কখন শিপ্রার শোয়ায় ঘুমিয়ে থাকে একটি কাতর প্রতীক্ষা, পা টিপে-টিপে সৌম্য তার ঘরে ঢোকে। আলোটা জ্বালায়, শিপ্রা একবার চেয়েও দেখে না। টেম্পারেচারের চার্টটা একটু নাড়াচাড়া করে, ওষুধের শিশি তুলে দেখে ক'দাগ খাওয়া হয়েছে। আবো সাহসে ভর করে' তার খস্‌খসে শুকনো ক'পালে বা একখানা হাত রাখে, সেখানে জাগে না কোনো প্রত্যাশা। হয়তো জিগ্‌গেস করে: এখন কেমন আছো? মেলে না কোনো প্রতিধ্বনি। ধীরে-ধীরে ঘর থেকে ফের চলে' যায় তার জ্বলন্ত অন্ধকারে।

আশ্চর্য, তবু সে শিপ্রাকে ভুলতে পারে না, মুছে ফেলতে পারে না হাত দিয়ে, মলিন মুমূর্ষু একটি আভার মতো লেগে থাকে। কেন, কেন তার জন্যে এই মায়া? এই পিছু-টান? কে সে সৌম্যর কাছে, সৌম্যর বৃহত্তর উন্মোচনের পৃষ্ঠায়? স্রোতের মুখে দুর্বল একটা কুটোর মতো কেন সে তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারছে না, কেবল ভাসিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। কে তার শিপ্রা? তার সামাজিক অবস্থার একটা মানদণ্ড, সেটাই তার আসল পরিচয় নয়, তার সাংসারিক সমৃদ্ধির একটা উদাহরণ, সেটাই নয় তার আসল ঐশ্বর্য। শিপ্রা তার হ'তে পারে হোক, সে শিপ্রার নয়। শিপ্রার অতিরিক্ত তার একটা বিশাল ব্যক্তিত্ব আছে, সে প্রকাশিত হ'বে সেই বিশালতায়।

শিপ্রা প্রথমে আশা একেবারে ছেড়ে দিয়েছিলো, ভেবেছিলো সে আর বাঁচবে না। তার আর রুচিও নেই বাঁচবার, এই তার স্বামীর সমৃদ্ধির শুধু একটা প্রাণহীন প্রতীক হ'য়ে। মৃত্যু ছাড়া তার আর

কোনো পরিণতিই সে দেখতে পাচ্ছিলো না, সেই যেন তার একটা কিছু করা, একটা বিশেষ কিছু হ'য়ে ওঠা। মরা ছাড়া আর যেন তার কোনো দাম নেই, দাবি নেই, মরাই যেন তার একমাত্র কৃতিত্ব। বাঁচবে না সে জানে, কিন্তু কবে যে মরবে তারো সে কোনো ইশারা খুঁজে পাচ্ছিলো না। আর, বেঁচে থাকতে-থাকতে লোকে সত্যি করে', সদর্থক ভাবে, মরতেই বা চায় কি করে'? চাওয়াটাই বিড়ম্বনা হ'য়ে ওঠে যখন চারদিক থেকে চিকিৎসার এতো আয়োজন শুরু হয় ও তার কাছে শিপ্রাকে করতে হয় নিঃসঙ্কোচ সমর্পণ। চিকিৎসার প্রতিটি টুকিটাকি পরমেশবাবুর হাতে, সেই হাত শিপ্রা সরিয়ে দিতে পারে না। আর, গোপন করে' লাভ কী, শিপ্রা সত্যিই চায় না মরতে, চাইতেই পারে না: তার মাঝে কাঁদছে আরো অনেক প্রত্যাশা, অনেক অমরত্ব। সেদিন খোকা আয়াব কোলে কিছুতেই শান্ত হচ্ছিলো না, রোগা দুর্বল হাত মেলে, আয়াকে অনেক সাধাসাধি করে' খোকাকে লুকিয়ে সে একটু কোলে নিলো। সত্যি, তাব মরতে আর ইচ্ছে করলো না। খোকার ফুলো-ফুলো ছোট্ট মুখটি বুকেব মধ্যে চেপে ধরে' অনেকক্ষণ চুপ করে' বসে' রইলো। যদি সে আবার ফিরে যেতে পারতো তার সেই স্বপ্নময় সোনার মুহূর্তগুলিতে, যখনো খোকা হয় নি, ঘুমিয়ে ছিলো তার শরীরের ঘন, পরিতৃপ্ত অন্ধকারে, যখনো তার দেহে নামে নি এই রোগের বর্ষা, যখনো সে নিজেতে নিজেই পূর্ণ ও অব্যাহত ছিলো তার নিষ্ঠুর একাকীত্বে। দস্যু খোকাই এসে তাকে লুট করে' নিলো, তবু তার এই রিক্ততার মাঝে দিয়ে গেলো তাকে অপর্যাপ্ত অকার্পণ্য। না, সে মরবে কেন, তার কিসের শূন্যতা? মরলেই তো সে হেরে গেলো, মুছে গেলো তার সমস্ত অধিকারের সম্পদ থেকে। মরে'ও যে সে সেই অপমান ভুলতে পারবে না। যা'র কোলে উঠে খোকা কচি-কচি লালচে মাড়ি দেখিয়ে হাসতে শুরু করেছে। কেন সে যাবে, কোন

হৃদয়ে সে নির্জন নিশ্চিহ্নতায় ? কেন সে ছাড়বে তার দাবি, তার অবশ্যম্ভাবিতা ? সে মা, কেন সে ফেলে যাবে সেই মহান দায়িত্ব, বিস্তৃততর জীবনে তার মহত্তর সম্ভাব্যতা ? এখনো সময় আছে, সে ছাড়বে না, ছাড়বে না সে সূচ্যগ্র অধিকার, নেমে দাঁড়াবে না সে এক তিল নিচে। সে মরতেই শুধু শেখে নি।

আয়ার কোলে ছেলেকে দিয়ে শিপ্রা বিশুবাবুকে ডেকে পাঠালো।

বালিশে ভর দিয়ে বসে' খাটো গলায় শিপ্রা বল্লে,—আপনাকে আমার একটা কাজ করে' দিতে হ'বে।

বিশুবাবুকে কোনোদিন শিপ্রা এর আগে মুখোমুখি কোনো হুকুম করে নি। তার মাতৃত্ব তাকে আজ একটা অপ্রতিহত শাসনের স্পর্ধা এনে দিয়েছে। কাঁচা-পাকা চুলে-গোঁফে গোলগাল বোকা-বোকা মানুষটি এই বিশুবাবু পরম আপ্যায়িত হ'বার ভঙ্গিতে একটু ঢলে' পড়ে' বল্লেন,—নিশ্চয়। বলুন।

শিপ্রার গলা আরো নেমে গেলো: করে'ই দিতে হ'বে আপনার সে-কাজ। কিছুতেই আমি না শুনবো না। যা আপনার লাগে, যা আপনি চান, তাই আমি দেবো।

এতো কী দুঃসাধ্য কাজ বিশুবাবু ভেবে পেলেন না। তাঁকে এতোই বা অনুরোধ করতে হ'বে কেন ? শিপ্রার, বলতে গেলে বাড়ির কর্ত্রীর, কোন কাজটা তিনি মুখের কথায় না করে' ফেলতে পারেন ?

—না, আপনি বলুন, একটা কাজ করে' দেবো তাতে অতো কেন সঙ্কোচ করছেন ? আমি তো আপনাদের চাকর।

বালিশের তলা থেকে দুমড়ানো একটা নোট বা'র করে' শিপ্রা বল্লে,—তবু নিন্ আপনি এই দশটা টাকা, কখন কী খরচ করতে হয় তার ঠিক নেই।

সর্বাঙ্গে ছি-ছি করে' উঠে বিশুবাবু বল্লেন,—সে কী কথা, বৌমা ?

টাকা—টাকা দিয়ে কী হ'বে? কী-একটা সামান্য কাজ করে' দিতে হ'বে, তাতে টাকা লাগবে কিসের? আমি কি এমনি নেমকহারাম হ'য়ে গেছি নাকি?

—বড়ো কঠিন কাজ যে।

—হোক না যতো কঠিন, সংসারে বিশু সরকার পারে না কী? বিশুবাবু শরীরে একটা বলদৃপ্ত ভঙ্গি আনলেন: বলুন।

শিপ্রা ফিস্‌ফিসিয়ে বল্‌লে,—কাজটা বলতে গেলে খুবই সোজা। আপনাকে রোজ সন্ধ্যেবেলা লুকিয়ে-লুকিয়ে দেখে এসে আমাকে বলতে হ'বে আপনার দাদাবাবু কোথায় যান, কা'র সঙ্গে। যেখানেই যান আপনাকেও যেতে হ'বে সেখানে—সব খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে, যতোদূর সম্ভব, জেনে আসতে হ'বে। পরে আমার কাছে এসে সব রিপোর্ট দেবেন। কী, পারবেন না?

বিশুবাবু চারদিকে যেন নিরবয়ব প্রেতচ্ছায়া দেখতে পাচ্ছেন তেমনি সাতঙ্ক বিবর্ণতায় বল্‌লেন,—এ কী মা, নোংরা কাজ।

—যে-রকমই কাজ হোক, পারবেন কিনা বলুন। শিপ্রা যেন জ্বলে' উঠলো।

—কিন্তু দাদাবাবু যদি জানতে পারেন?

—তিনি জানতে পারবেন কী করে'? তিনি যাতে বিন্দুবিসর্গও না জানতে পান তাই তো আপনাকে দেখতে হ'বে। কী, চুপ করে' রইলেন কেন?

বিশুবাবু হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন। পীড়িত মুখে বল্‌লেন,—এ কাজ কেন করতে বলছেন?

—কেনর ব্যাখ্যা জেনে আপনার কী হ'বে? শিপ্রা ধম্‌কে উঠলো: আপনি পারবেন কিনা বলুন? নিজে না পারেন অন্তত বিশ্বাসী আর কাউকে দিয়ে। এমন লোক পেলে ভালো হয়, যিনি আপনার

দাদাবাবুকে চেনেন, অথচ তাঁকে তিনি চেনেন না। যতো—যতো টাকা লাগে আমি দেবো। আপনার হাতে নেই এমন কোনো লোক?

বিশুবাবু হেঁট হ'য়ে মাথা চুলকোতে লাগলেন: টাকার কথা হচ্ছে না—

—যদি না পারেন—

গলার স্বরে বিশুবাবু চমকে উঠলো।

শিপ্রার মুখ অস্বাভাবিক তপ্ত হ'য়ে উঠছে, দুই গভীর গহ্বর থেকে বেরিয়ে আসছে যেন আগুনের দু'টো পিণ্ড: যদি না পারেন আমি বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করবো। ঠিক আত্মহত্যা করবো। আপনি আমার চেয়ে বয়সে অনেক বড়ো, আপনার পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করছি, শিপ্রা হঠাৎ শিথিল দ্রুততায় বিছানার ধারে সরে' এলো: ঠিক আত্মহত্যা করবো। আমাকে যদি বাঁচাতে চান, শিপ্রার চোখে জল দাঁড়িয়ে গেছে: আপনাকে করতেই হ'বে আমার এটুকু কাজ। আমি আপনার কাছে আর বেশি কিছু চাইছি না।

বিশুবাবুকে শিপ্রা বশীভূত করে' ফেললো।

শুতে যাবার আগে নিষ্প্রাণ অভ্যাসবশতোই সৌম্য এসে পড়েছিলো শিপ্রার ঘরে, তার শিয়রের কাছে, দিনব্যাপী পরিচর্যার তালিকা নিতে। ঘর মিঠে অন্ধকার, জলের উপর তারার ঝিকিমিকির মতো শিপ্রা শুয়ে আছে, তার অস্পষ্ট-করে'-দেখা শরীরের লঘিমাটি যেন অস্ফুটমান একটি ফুলের মতো বিষণ্ণ। শিপ্রা হয়তো এখন ঘুমিয়ে পড়েছে, ঝড়ের রাতে ছোট্ট একটি পাখির মতো ঘুমিয়ে—ঘরে আর তাই লোকজন নেই, ছড়িয়ে আছে একটি নিরাশ অবসন্নতা, নিরবয়ব একটা অনুভূতির মতো। আলো জ্বালাতে সৌম্যর ভয় করতে লাগলো। কতোদিন পরে ভালো লাগলো আজ্যার তার এই শরীরের নরম নিরাভতা, ক্লান্তির এই একটি গভীর আস্বাদ।' সৌম্যর ভারি ইচ্ছা করলো আবার সে চুপি-চুপি

শিপ্রার কাছে গিয়ে বসে, তার ঘুমের জলস্রোতের মধ্যে মিশিয়ে দেয় তার স্পর্শের একটি শীতলতা। অন্ধকারে তার সেই ঘুমে-মলিন, নির্বাপিত, নিঃশেষ-স্রস্ত মুখখানি দেখবার জন্যে কেঁদে উঠলো তার চোখ। চোখ বুজে ভাবতে গেলো সেই মুখ, সেই শিপ্রা—নেই, গেছে তা হারিয়ে চোখের অতল তমিস্রতায়। লেগে আছে দু' একটা ক্ষণিক, তরলিত ছায়া। তার স্মৃতি যেন সূর্যোদয়ের রৌদ্রজ্জ্বল ক'টি মুহূর্তের স্মৃতি, তার সেই মুখ যেন ছাই-রঙের দীর্ঘ ধূসর দিনের একটি রঙিন ভোরবেলা।

ফুলের উপর প্রজাপতির প্রসারিত, নিশ্চল প্রতীক্ষার মতো সৌম্যর দুই চোখ শিপ্রার মুখের উপর নেমে এলো। অন্ধকারে কে যেন উঠলো হেসে। কে যেন ব্যঙ্গতিক্ত, ধারালো গলায় একটা হাহাকার করে' উঠলো: বায়স্কোপ কেমন দেখলে?

প্রবল একটা ধাক্কা পেয়ে সৌম্য দূরে ছিট্‌কে দাঁড়ালো। কে হঠাৎ কথা কয়ে' উঠলো জানবার জন্যে ভয় পেয়ে সে আলো জ্বালালে।

শিপ্রা বাঁকা-চোরা ভেঙে-ভেঙে-পড়া স্খলিত, দুর্বল কতোগুলি রেখায় বিছানার উপর উঠে বসেছে। রুক্ষতায় ভীষণ একটা চেহারা, সারা গায়ে ক্ষুধার্ত শীর্ণতা। পিচ্ছিল, তির্যক কতোগুলি সরীসৃপের মতো তার গায়ের রেখাগুলি যেন কিল্‌বিল্ করে' উঠেছে। বিদ্রূপে গলিত দুই চোখে সে জিগ্‌গেস করলে: বায়স্কোপ কেমন জমলো সন্ধ্যেবেলা? আমরা তো আর দেখতে পেলুম না, গল্পটাই না-হয় একটু শুনলুম।

গলার কাছে সৌম্যর হৃৎ-পিণ্ড এসে ধুক্‌ধুক্ করতে লাগলো, হাত-পাগুলি আর তার নিজের বলে' মনে হ'লো না। ধরা-পড়া, স্তিমিত, শুকনো গলায় বল্‌লে,—বায়স্কোপ, বায়স্কোপ আবার গেলুম কখন?

—যাও নি? শিপ্রার দীর্ঘ, দ্রুত একটি দৃষ্টি বিষাক্ত তীক্ষ্ণতায় তাকে বিদ্ধ করলে।

—কক্‌খনো না। কে বললে তোমাকে?

—যাও নি? তুমি আমার গা ছুঁয়ে—শিপ্রা নিজেকে সংশোধন করে নিলো: ঈশ্বরের নামে শপথ করে' বলতে পারো, তুমি যাও নি?

—যাই নি তো যাই নি, সৌম্য স্পর্ধিত একটা ভঙ্গি আনবার চেষ্টা করলো: শপথ করতে যাবো কেন? তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পারো না? অসুখে ভুগে এ-সব তুমি কী দুঃস্বপ্ন দেখতে শুরু করেছ?

—ঠিক বুঝেছ, দুঃস্বপ্নই বটে। রোগা, পাঁশুটে দাঁতে শিপ্রা হেসে উঠলো: তোমাকে বিশ্বাস করবো না! তুমি যে আমার স্বামী, ইষ্টদেবতা। কিন্তু ট্যাক্সির নম্বরটাও যে আমি দেখে ফেলেছি।

—ট্যাক্সি, ট্যাক্সির নম্বর—কী বলছ তুমি যা-তা?

—গ্রে-রঙের একটা ট্যাক্সি, টি-১৭৪৯, সিডান-বডি—বেশ ঘেরা, ঢাকাঢুকি-দেয়া, চলে' গেলে তোমরা দু'জন সোজা, গ্লোব্‌এ। বনানীদির পরনে সাদা, পাড়-ছাড়া, হাল্‌কা একটা গরদের শাড়ি, তুমি তোমার আপিসের স্যুট পরে'। ছবির নামটাও আমি বলে' দিতে পারি একটু চিন্তা করলে। কী, শিপ্রা বিষময়, বিলোল একটা কটাক্ষ করলো: কী, বলো, মিলছে না হুবহু? তারপর ছবি ভেঙে গেলো, গেলে তোমরা মার্কেটে, বড়ো-বড়ো ডাঁটওলা সাদা কী বিলিতি ফুল কিনলে, হাসতে-হাসতে ওজন নিলে দু'জন, ফেরবার সময় ফিরলে বাস্‌এ, বাস্‌এর খোলা মাথায়। 'কক্‌খনো, কক্‌খনো যাই নি!' বলবার কী ঢঙ্‌! শিপ্রার জিভ লক্‌লক্‌ করে' উঠলো: তোমাকে বিশ্বাস করবো না! তোমাকে বিশ্বাস না করে' পারি?

সৌম্য ছটফট করে' উঠলো: তুমি—তুমি কী করে' জানলে? কে তোমাকে বললে এ-কথা?

—আমি যে গুনতে জানি, আমারো যে একজন ঈশ্বর আছেন। কী, তুমি বুকে হাত দিয়ে অস্বীকার করতে পারো? বলি নি ঠিক

মোটরের নম্বর? বলি নি ঠিক শাড়ির রঙ? কেনো নি তোমরা ফুল? যাও নি—যাও নি গ্লোব্‌এ?

—গেলে গেছি, সৌম্যর মুখের উপর কে যেন একটা হিংস্র বলিষ্ঠ থাবা মেরেছিলো, সেটা দুই হাতে ঠেলে ফেলে দিয়ে মূঢ়, অন্ধ উন্মত্ততায় বলে' উঠলো: গেলে গেছি, তাতে তোমার কী, কা'র কি এসে যায়?

—কারু কিছু এসে যায় না? প্রেতায়িত, নীরেখ একটা ছায়ার মতো শিপ্রা হেসে উঠলো: কারু কিছু এসে যায় না তো মিথ্যে কথা বলতে গেলে কেন? সোজা, সাদা সত্য কথা বলতে তোমার কী হয়েছিলো? মিথ্যাবাদী কোথাকার।

সৌম্যর সেই মুহূর্তে ইচ্ছে হ'লো ভারি একটা-কিছু জিনিস কুড়িয়ে নিয়ে শিপ্রার মুখের উপর ছুঁড়ে মারে, তার কুঞ্চিত, কুৎসিত মুখের উপর। মারাত্মক ইচ্ছে হ'লো দুই নির্দয়, নিশ্চেতন হাতে ধীরে-ধীরে তার গলাটা টিপে ধরে, রোগা, লম্বা, শুকনো সেই গলা। খাটের কাছে সে ভয়ঙ্কর স্তব্ধতায় এগিয়ে এলো, রেলিঙটা হাতের তেলোতে চেপে ধরে' কর্কশ গলায় বল্‌লে,—তোমাকে কে দিলে এত সব খবর? তুমি আমাকে স্পাইং করতে শুরু করেছ নাকি? পেছনে চর লাগিয়েছ নাকি? বলো, কী করে' তুমি জানলে? সৌম্য ধম্‌কে উঠলো: বলো বলছি, কে সে লোক?

—বলবো না। তুমি কী করতে পারো?

সৌম্য যে সেই মুহূর্তে কী করতে পারে তার সে কোনো কূলকিনারা পেলো না। কিছু না করাটাই সে পরম প্রতিশোধ বলে' মনে করলে। ফিরে গেলো, সরে এলো তার বন্য বিচ্ছিন্নতায়। বল্‌লে,—যাবো, একশোবার যাবো। আমার খুশি আমি গিয়েছিলুম, আমার খুশি আমি আবার যাবো। তুমিই বা কী করতে পারো?

—কেন, কেন তুমি যাবে? শিপ্রা তার মুখের উপর তীক্ষ্ণ একটা চীৎকার ছুঁড়ে মারলে।

—আমার খুশি। আমার খুশির ওপরে কারু কোনো হাত নেই। সৌম্য উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঘরের মধ্যে পাইচারি শুরু করলে: শেষকালে তুমি আমাব পেছনে চর লাগিয়েছ? কিন্তু তোমার চর কতোটুকু—কতোটুকু দেখতে পেয়েছে? ·মোটরেব রঙ, বিলিতি সাদা ফুল,—এই, এই পর্যন্ত। সৌম্য হঠাৎ চাপা গলায় কুটিল করে' হেসে উঠলো: যাবোই তো, আমার মন যেখানে যেতে চায, যেখানে গেলে আমাব ভালো লাগে।

—ভালো লাগে তো মরতে আবার ফিবে আসো কেন এখানে? শিপ্রা ভেঙে টুকরো-টুকরো হ'যে গেলো: সেখানে থাকলেই তো পাবো চিরকাল।

—ইচ্ছে হ'লে থাকবোই তো সেখানে। কে তোমার এখানে আসতে চায তোমাব এই রোদ হাওয়া-হীন এঁদো, রোগা ঘরে? সেখানেই তো থাকবো চিবকাল—চিরকাল। সৌম্য একমুহূর্তও আটকালো না: সম্ভব হ'লে তাকে আমি বিয়ে করবো, হ্যাঁ, তাকে—বনানীকে।

—বিয়ে করবে? কথাটা উচ্চাবণ কবার সঙ্গে-সঙ্গে শিপ্রা যেন উবে গেলো একেবারে।

—হ্যাঁ কববো, কেন করবো না? সৌম্য কথার একটা ঝড় তুলে দিয়েছে: যে-বিয়েতে আমি পূর্ণ হ'বো, সার্থক হ'বো, বিশাল হ'বো—তা থেকে আমি নিজেকে ভয় লজ্জায় আত্মার দীনতায কেন বঞ্চিত করতে যাবো? আমার কিসের বাধা, কিসের কী?

শিপ্রা নয়, যেন দেয়ালের কোণের খানিকটা মরা অন্ধকার কথা কইলে: কোনোই বাধা নেই?

—এক তিল নয়। সৌম্যর কথাগুলি যেন পাথরে-খোদা নিষ্ঠুর নির্বিকার কতোগুলি রেখা : সমস্ত আইন আমার পক্ষে, আমার পক্ষে আমার প্রেম, আমার মনুষ্যত্ব। প্রাণহীন একটা কর্তব্যের ভার বয়ে'-বয়ে' আমি আর আমাকে সঙ্কুচিত, খর্ব করে' রাখতে পারবো না, আমি যাবো—আমি যাবো আমার বিপুলতর সম্ভাবনার খোঁজে। তার কাছে তুমি কে, কতোটুকু ?

শিপ্রা আর ধরে' রাখতে পারলো না শরীরের এই শীর্ণতার ভার, উপুড় হ'য়ে লুটিয়ে পড়লো বিছানার উপর, রাশি-রাশি ব্যর্থতার মতো। সমস্ত ঘর তার ভয়ঙ্কর শূন্য কণ্ঠে যেন হাহাকার করে' উঠলো : সত্যি, সত্যি তোমার কোনোই বাধা নেই ?

—কিসের বাধা ? একদিন বিয়ে তো হ'তেই পারতো অনায়াসে, সেদিন আমি যদি বিয়ে করতুম। সে-বিয়ের লগ্ন আজো বয়ে' যায় নি। সেদিন আমি খুঁজে আনি নি পাত্রী, আমি জানতুম না আমার সার্থকতা। সেদিন আমাদের পরিবার বিয়ে করেছিলো, আমাদের সমাজ—আমি নয়।

—করো না, করো না বিয়ে, এক্ষুনি, এই মুহূর্তে। মুখ তুলে শিপ্রা বন্য পশুর মতো সজল দুই জ্বলন্ত চোখে তার উপর যেন ঝাঁপিয়ে পড়লো : এখানে তবে দাঁড়িয়ে আছো কেন ? যাও, বেরিয়ে যাও আমার ঘর থেকে।

—তার জন্যে তোমার মত নিতে হ'বে না। সৌম্য দরজার কাছে সরে' এলো : তোমার মুখ চেয়ে আমি এখানে বসে' নেই।

—আচ্ছা, দেখা যাবে।

—আচ্ছা। সৌম্য নিষ্ঠুর হেসে উঠলো।

দু'জনের মাঝে উত্তপ্ত, অনুচ্চারিত শত্রুতা।

ষোলো

সবুজ সন্ধ্যায় ভরে'-যাওয়া ঘন, শান্ত ঘরে বনানী তার দীর্ঘায়িত, তন্দ্রাবিজড়িত শরীরে পুঞ্জ-পুঞ্জ আলস্য নিয়ে বসে' ছিলো। দেয়ালে-মেঝের সন্ধ্যার নতুন ছাযা পড়েছে, ঈষৎ কম্পান্বিত, সঞ্চরমান, প্রেতায়িত কতোগুলি দীর্ঘশ্বাস। তারায় ফেটে পডবার জন্যে আকাশ অন্ধকারে যাচ্ছে ডুবে, দূরে কাঁপছে একটা গাছ, ধূসবতার দীর্ঘ একটা শিখা। সব অস্পষ্ট, অস্পৃশনীয়—আকাশ গেছে মুছে, পৃথিবী গেছে হাবিয়ে। শুধু বনানীই ধবা পড়ে' গেছে নিজের মধ্যে, শুধু তার মাঝেই প্রখর, জাগ্রত একটা স্পষ্টতার দাহ। এতো তীব্রতা যেন সে সহ্য কবতে পারছে না, সংজ্ঞাবদ্ধ, স্পষ্ট একটা সীমাব মধ্যে এই তার জ্বলন্ত উন্মোচন, এই তার নিবঙ্কুশ, নিবাববণ স্বাভাবিকতায় নেমে-আসা। সে চিরকাল বাস করে' এসেছে তার অর্ধসুপ্ত, প্রচ্ছন্ন অবচৈতন্যে, তার অনূর্মিল, নির্মল অশাবীবিকতায: আজ তার সমস্ত অস্তিত্বচেতনা অপ্রতিহত সূর্যোদয়ের মতো প্রত্যক্ষ বক্তে এসে দেখা দিযেছে, তার কল্পনার উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে বিশাল একটা শবীবেব বোঝা। সে চিরকাল বাস করে' এসেছে বিলীয়মান একটি গোধূলির ধূসবতায়, তার সেই মায়াময় অপরূপ মৃত্যুর উপর কে যেন ছড়িয়ে দিযেছে রাশি-রাশি রৌদ্রের সমুদ্র, উতরোল জাগরণের বন্যা। অসহ্য, অসহ্য এ জাগরণ। তার এই নিষ্ঠুর নির্জনতা দিয়ে ঘেরা কঠিন দুর্ভেদ্য দেয়াল হঠাৎ তাকে বাইরে ঠেলে দিয়েছে, দিয়েছে তার বিচরণের, বিস্ফারণের বিশাল একটা মুক্তি। অসহ্য, অসহ্য এ মুক্তি। অসহ্য এই রক্তে বেঁচে ওঠা, এই রৌদ্রে, এই নিরলঙ্কার স্পষ্টতায়। বনানী পুড়ে-পুড়ে যেন সা। হ'য়ে যেতে লাগলো। গভীর আত্মায় আর্তনাদ করে' উঠলো

এই শরীরের স্থৌল্যে, এই তার নিপীড়িত সীমাবদ্ধতায়। সে চায় নি, চায় নি এই আলো, এতো—এতো আলো, এতো উজ্জ্বল, উদগ্র অজস্রতা। বাঁচতে চায় নি সে এই ভয়ঙ্কর স্পষ্টতায় এতো নির্লজ্জ-উজ্জ্বল হ'য়ে। আনো মৃত্যু, মদির অন্ধকার, বনানী সহ্য করতে পারছে না এই বাঁচবার অতিচার—সে ঠিক, ঠিক মরে' যাবে, মরে' যাবে শুধু তার উদ্বেলিত মুহূর্তের ভারে।

তার আরণ্য নিঃসঙ্গতায়, তার আপন গূঢ় গহনে সে ছিলো শুধু একটা বীজবিন্দু, কোন দেবতা-সূর্য তাকে হঠাৎ উত্তপ্ত, উন্নিদ্র এক ফুলে বিকশিত, উন্মোচিত করে' তুলেছে, তার আর পালাবার নেই পথ। কে সে, কে সে সৌম্য? কী তার পরিচয়? বনানী তার কিছুই জানে না, জানবার সে অবকাশই পায় নি। সে, সৌম্য, শুধু অন্ধ, অন্ধকার একটা শক্তি, সূর্যের মতো অন্ধকার, অজ্ঞাত ফুলের কাছে সূর্যের মতো অন্ধকার, অজ্ঞাত। কী সে করতে পারতো সেই শক্তির সামনে নিজেকে উদ্ঘাটিত করে' না দিয়ে, নিজের মাঝে এমনি অনায়াসে হ'য়ে-না-উঠে? সূর্যের আলোতে বিদ্ধ, আসিক্ত হ'য়ে ফুলের না ফুটে-ওঠা ছাড়া আর কী উপায় আছে? ফুলের সমস্ত নগ্নতা সূর্যেরই শক্তিতে ধৃত, নিহিত, সংবেদিত। কী তার পথ ছিলো নিজেকে অস্বীকার করবার, লুকিয়ে রাখবার? কিন্তু ফুলের কই আর সেই আরণ্য বিলাস, কই সেই তার সুরভিত নিঃসঙ্গতা? বৃন্তচ্যুত হ'য়ে কোন দেবতার পূজায় উৎসর্গীকৃত হ'বার মৃত্যুতেই যেন তার পরিণতি!

বনানী সমস্ত শিরা-স্নায়ুতে বাণবিদ্ধ, রক্তাক্ত একটা পাখির মতো ছটফট করে' উঠলো। ঘর থেকে দৈত্যকায় অন্ধকারটাকে ছুঁড়ে ফেলে দেবার জন্যে সুইচ টেনে তাড়াতাড়ি জ্বালালো সে আলো। দীর্ঘ আয়নায় তার মুখের শুভ্রায়িত একটা ছায়া পড়লো—লজ্জায় সে নিজের

মুখের দিকেই তাকাতে পারছে না, নিজের কাছে ধরা পড়ে' যাওয়ার লজ্জা। সরে' দাঁড়ালো আয়নার উলঙ্গতার থেকে, তার অসুস্থ একটা ভয় করতে লাগলো পাছে সেই মুখে হিংস্র, ক্ষুধিত, ভয়ঙ্কর কিছু সে একটা পড়ে' ফেলে। তার সহ্যও হচ্ছে না আলো, আলোয় রূঢ়, নির্দিষ্ট এই বাস্তবতা, তার চারধারে পুঞ্জীভূত স্বাভাবিকতার এই অনুপাত। বনানী একটা আশ্রয়ের জন্যে তাড়াতাড়ি জানলায় এসে দাঁড়ালো। তার কিসের লজ্জা যতোক্ষণ আকাশে নীল তারা ফুটছে, যতোক্ষণ পৃথিবীতে একটিও আছে গাছ, উড়ছে একটিও পাখি। কিসের তার ভয় যখন অন্ধকারের এতো ঐশ্বর্য নিয়েও রাত্রি একা, জীবনের সমস্ত পূর্ণতা নিয়েও মানুষ মৃত্যুতে যখন নিঃসঙ্গ। তার লজ্জা নেই নেই কোনো ভয়, এই তার শরীরব্যাপী জাগরণের মূর্ছায়, এই তার বিনিদ্র, বিশাল একাকীত্বে। সে থাকবে একা তার এই রশ্মিবিদ্ধ প্রখর উন্মোচনে, তার উন্মেষের সকল সৌগন্ধ্য নিয়ে, তার জীবন্ত আরণ্য বৈফল্যে। বনানী বেশিক্ষণ যেন দাঁড়াতে পারলো না, আবার তার এই চেতনার স্পষ্টতায়। আবার এসে বসলো তার চেয়ারে পথটুকু পেরিয়ে আসবার সময় আবার তার ছায়া পড়লো আয়নায়।

বনানীর মরে' যেতে ইচ্ছে করলো, এই মুহূর্তে মরে' যেতে ইচ্ছে করলো, মরে' যাওয়া ছাড়া এই মুহূর্তে আর কিছু সে কল্পনা করতে পারলো না। মৃত্যু কী তা সে জানে না, মৃত্যু কী তাই যখন সে জানে না, তখন, মরলে কী হয় তা জানতে যাওয়াও তার বিড়ম্বনা, তবু বনানীর মনে হ'লো, মৃত্যু বুঝি এমনি একটা অনুভূতির অনতিপরবর্তী অবস্থা। না জানুক, তবু সে মরতে চায়, মন থেকে মুছে যেতে শরীর থেকে মুছে যেতে। মুছে যেতে মনোহীন, কায়াহীন, কাকুতিহীন অপার এক নীরন্ধ্রতায়। মৃত্যু—মৃত্যু তার জীবনের উন্নয়ন, তার চরম কূলহীনতায় ফুটে-ওঠা। যথেষ্ট হয়েছে জীবনের উচ্চারণ, এবার আসুক

নেমে বনানীর অনুভূতিহীন, গভীর অন্ধকার। মরতে তার কোনো দুঃখ নেই, কোনো অপমান নেই তার মুছে যেতে, জানার থেকে বড়ো যে সেই অজানা, জীবনের থেকে বড়ো যে সেই উজ্জীবন, বনানী তারই উদ্দেশে নিজেকে উৎসর্গ করবে। কোলের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে বনানী হঠাৎ মানুষের স্বরে কেঁদে উঠলো।

কেন সে আসেনা সেই স্থিরীকৃত মৃত্যুর মতো? যাকে ফেরানো যায়না, বসিয়ে রাখা যায়না, বুঝিয়ে বলা যায়না। সেই নিশ্চিত, প্রবল, মহান সর্বনাশের মতো? কেন তার সাহসে নেই, উজ্জ্বল নির্লজ্জতা নেই? কেন সে সেই মহান আগুন জ্বালেনা যা সমস্ত অসত্য ও অসারকে ভস্ম করে রচনা করবে প্রাণের কৃতার্থতা, প্রেমের দীপ্ত কীর্তি। কেন সে অভ্যাসকে বর্জন করতে পারেনা নবীনারম্ভের সম্ভাবনায়? তেজস্বী সত্যের শক্তিতে কেন সে চূর্ণ করে দিতে পারেনা মীমাংসার কৃত্রিমতাকে? যেখানে তার আহ্বান সেখানে তার আহুতি নেই কেন? যেখানে তার পূর্ণতা সেখানে সে কেন অকিঞ্চন?

ঠাকুমা যে কখন ঘরে ঢুকেছেন বনানীর তা খেয়াল নেই। নোয়ানো পিঠের উপর শুকনো অথচ কোমল একটি স্পর্শ পেয়ে সে চমকে উঠলো। ঠাকুমা,—ঠাকুমাকে চিনতে পেরে ভঙ্গিটা সে খরতর করবার চেষ্টা করলে না।

ঠাকুমা শুধোলেন: অমন মাথা গুঁজে বসে' আছিস কেন?

—কিছু ভালো লাগছে না, ঠাকুমা। বনানী মন্থর বিশ্রান্তিতে উঠে বসলো।

—কেন, কী হয়েছে? ঠাকুমা ব্যস্ত হয়ে তার কপালে-গলায় হাত দিলেন!

—আমি এ-চাকরি ছেড়ে দেবো। ঘরের শুদ্ধতার জলে বনানী শব্দের একটা ঢিল ছুঁড়লে।

—কেন ? এমন একটা কথা যেন ঠাকুমার অধিগম্যতার বাইরে : সে আবার কী কথা ?

—এমনি, এমনি ছেড়ে দেবো। বনানী উঠে পড়লো তার ক্লিশ্যমান শরীরের দীর্ঘতায়, টেব্‌লের উপর থেকে এটা-ওটা নাড়াচাড়া করতে-করতে বল্‌লে : চিরকাল আমাকে এই চাকরি করতে হ'বে, ঈশ্বরের সঙ্গে এমন কোনো চুক্তি করে' আসি নি, ঠাকুমা।

ঠাকুমা, তাঁর ছোট-ছোট জলজলে চোখে বনানীর দিকে চেয়ে রইলেন। বল্‌লেন, দ্বিতীয় শৈশবের সবিস্ময় সরলতায় বল্‌লেন,—কথা তো ঠিকই, মেয়ে হ'য়ে কে আবার চাকরি করতে যায়, নিজে সেধে কে নায় জোয়াল টানতে ? আমরা পরের ঘাড়ে মানুষ, চিরকাল আমাদের জন্যেই পুরুষ ফেলেছে ঘাম। ঠাকুমা প্রসন্ন সখীত্বের গোপনতায় বনানীর কাছে সরে' এলেন, একটু নুয়ে পড়ে' ফিস্‌ফিসিয়ে প্রশ্ন করলেন : বিয়ে করবি ঠিক করলি ? এতোদিনে কাউকে পছন্দ হ'লো ?

বনানী তার অন্তর্নিহিত নিঃশব্দতায় হেসে উঠলো, বল্‌লে,—নিজেকেই, নিজেকেই ঠাকুমা, পছন্দ হচ্ছে না। পৃথিবীতে আর সবই ঠিক আছে, যে যার নিজের জায়গায়, শুধু আমিই এখানে অনুপস্থিত। না, না, বনানী হঠাৎ মাতৃহীন আর্ত শিশুর মতো ছটফট করে' উঠলো : আমি এখান থেকে চলে' যাবো, চলে' যাবো এখান থেকে।

—কোথায় ? ঠাকুমা ভীত একটা শব্দ করলেন।

—দূরে, অনেক দূরে, কোথায় আমি ঠিক জানি না। বনানী আবার একটা চেয়ারে ভেঙে পড়লো, অস্থির হ'য়ে চুলের গোছাগুলি বুকের উপর আনলো টেনে, ছড়িয়ে দিতে লাগলো আগুনের হল্‌কার মতো। বল্‌লে,—খুব বড়ো একটা অজানা অন্ধকারে, যেখানে আকাশের ভার নেই এমন একটা মুক্তিতে, সে অনেক দূর, ঠাকুমা।

ঠাকুমা তেমনি জলজলে চোখে চেয়ে রইলেন: আর কোথাও চাকরি পেয়েছিস নাকি?

—চাকরি? আর চাকরি নয়। খোলা চুলে রাত্রির অরণ্যের মতো বনানী আবার মর্মরিত হ'য়ে উঠলো: নয় আর সভ্যতায় এই সঙ্কুচিত হ'য়ে থাকা, নিষ্ঠুর এই যান্ত্রিকতায় রুদ্ধশ্বাস। এটা শুধু মানুষের পৃথিবী নয়, ঠাকুমা, এখানে অণুতম কীট থেকে মহামহিম পশুরা করছে বিচরণ, এখানে জাগছে গাছ, ফেটে পড়ছে ফুল, সমুদ্রের নিচে সংগ্রাম করছে অসংখ্যেয় প্রাণ। আমি যাবো, তাদের কাছে যাবো, তাদেরই একজন হ'য়ে। জীবন আমাদের যাই হোক ঠাকুমা, মৃত্যুতে আমরা সবাই এক—সেই আমাদের পরম কিছু-না-হওয়ায়।

শিশু যেমন ভয় পেয়ে মা-কে আঁকড়ে ধরে, তেমনি সমর্পিত বিশ্বাসে ঠাকুমা বনানীর ডান হাতটা চেপে ধরলেন: কোথায়, কোথায় যাবি তুই?

ঠাকুমার ভয় দেখে বনানী ছোট মেয়ের মতো খিল্‌খিল্ করে' হেসে উঠলো, তাঁর মুখটা বুকের একপাশে জড়িয়ে ধরে' কুঁকড়েপড়া ছোট্ট মাথাটিতে হাত বুলুতে-বুলুতে বল্‌লে,—কোথায় আবার যাবো? ইচ্ছে করে' কোথায়—কতোদূর বা আমরা যেতে পারি? এই কয়েকদিনের জন্যে এখানে-ওখানে একটু ঘুরে আসতে যাবো, ঠাকুমা।

—চাকরি ছেড়ে দিবি?

—হ্যাঁ, চাকরি করে' আমার কী হ'বে? কী হ'বে এই নিজেকে এমনি রুটিনে বেঁধে রেখে, দিনের এই মলিন দিনানুগতিতে? না, চাকরি আমি আর করবো না, তুমি অতো ভয় পাচ্ছ কেন, আমি এমনি শুধু একটু ঘুরে বেড়াবো আমার নিজেকে ছেড়ে, আমার বিশালতর একটা নির্জনতার দেশে। আমি ঠিক করে' ফেলেছি, ঠাকুমা।

ঠাকুমা বিস্ময়ে একেবারে ছিঁড়ে পড়ছেন। এই দুর্দাম মেয়েটিকে

কিছুতেই তিনি মেপে উঠতে পারলেন না তাঁর জীবনভোর অভিজ্ঞতার তৌলে। সারাজীবন তাই সে করে' এসেছে যা আকস্মিকতায় অসাধারণ। নিজের ইচ্ছার অধিকারে যে চিরকালে এসেছে বেঁচে। তার এই ইচ্ছার প্রতাপে চিরকাল যে পরিপার্শ্বকে লঙ্ঘন করে' গেছে। তার কাছে ঠাকুমা একটি শিশু। তার কাছে তিনি আরো আশ্চর্য-রকম অসম্ভবনীয় কিছু আশা করেছিলেন। দুঃসম্পাদ্য কোনো ব্রত, দুর্দমনীয় কোনো প্রতিজ্ঞা। মন খারাপ করে' এ-দিক ও-দিক একটু তুচ্ছ ঘোরা-ফেরা করার মেয়ে সে নয়, তাকে যেন ও মানায় না। এ যেন তার পক্ষে বড়ো সোজা কাজ, এ নয় যেন তার বাঁচবা। একটা বিশেষণ। চাকরি সে যে-কোন মুহূর্তে ছেড়ে দিতে পারে, দিয়েওছে সে বহুবার ছেড়ে, কেননা চাকরিই আবার সেধে আসবে তার হাতের মুঠোয়। এ বনানী একটা এমন কী চোখ-ঝলসানো কাজ করছে? বড়ো সহজ, বড়ো বেশি সহজ বলে'ই ঠাকুরমার যেন কেমন ভয় করতে লাগলো। এতো সহজই যেন তার পক্ষে অস্বাভাবিক। কোনো একটা সঙ্কল্পে তীক্ষ্ণ বিদ্ধদৃষ্টি না হ'য়ে এমনি উচ্ছৃঙ্খল, উদ্বেল আলস্যে ছেড়ে দেযার এই তার শীতল তন্ময়তা দেখে ঠাকুমা যেন চোখের সামনে অন্ধকার দেখলেন। কিন্তু বনানীকে কেউ কোনোদিন প্রতিবাদ করতে শেখে নি। সে চিরকাল বিচ্ছিন্ন হ'য়ে আছে তার আত্মার ঔদ্ধত্যে। সে মরবে, তবুও তার এই জীবনের জনতাহীনতায়।

ঠাকুমা শুধু ভয়ে-ভয়ে জিগ্‌গেস করলেন: কবে ঠিক করলি?

—আজ, এই মুহূর্তে। ঠিক করতে আমার বেশি সময় লাগে না, ঠাকুমা।

—কেন, কিছু বলবি?

—কেন, তা আমি নিজেই কিছু স্পষ্ট জানি না। বনানী শুভ্র, প্রশান্ত গলায় বললে,—শুধু জানতেই আমার যতো সময় লাগে।

বনানী চিরকালই এমনই অন্ধকার, কিন্তু সেই অন্ধকারে যেন স্নেহ ছিল, এতো ভয় ছিলো না।

ঠাকুমা আবার জিগ্গেস করলেন : কেন যাবি জানতে পাই না ?

বনানী বল্লে,—যতোটুকু জানি, ততোটুকুই তো আমি বলবো। ভালো লাগে না, আমার ভালো লাগছে না এখানে। বনানী চুলগুলি হাতে করে' তুলে ধরে' গায়ের উপর ছড়িয়ে দিতে লাগলো।

— ভালো লাগে না কী বলছিস ? ঠাকুমা বিস্ময়ে একেবারে শুকিয়ে এলেন : এতো বড়ো শহর কলকাতা, নিজে গায়ে পড়ে' সেধে এখানে চাকরি করতে এলি কম মাইনেয়, দিব্যি সংসার পেতে বসেছিস, ছোটখাটো একটি ফুলের বাগান করে' ফেলেছিস পর্যন্ত, এর মধ্যেই আবার ভালো লাগলো না ?

দুই হাতের অঙ্গুলিতে কতোগুলি চুল নিয়ে তার মধ্যে বনানী মুখ ঢাকলো : শহর, আর শহর নয়, ঠাকুমা, এবার কোনো সমুদ্র, যার পারে নেই কোনো মানুষের বসতি, সমস্ত শহর আর সভ্যতা যেখানে বালি হ'য়ে মিশে গেছে,—আমার যেতে ইচ্ছে হচ্ছে সেই কোনো সমুদ্রের নির্জনতায়, বাঁচতে আমার আরেক কোনো ব্যক্তিত্বে, ব্যক্তিত্বহীনতায়। বুঝবে না, তুমি তা কিছু বুঝবে না, ঠাকুমা। বনানী উঠে পড়লো, খোলা চুলে, মূর্তিমতী নিশীথ-রাত্রির মতো : আমি নিজেই কিছু বুঝতে পাচ্ছি না, তোমাকে বোঝাবো কী করে' ? বনানী হঠাৎ ঠাকুমাকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরলো, কোলে তুলে নিতে চাইলো : এমনি একটু হাওয়া বদল করে' আসতে যাচ্ছি, দেখছো না আমার চেহারা— কেমন শুকিয়ে যাচ্ছি দিন-দিন ? বাগান, ফুল, এই সব মিথ্যে ফুলের গাছ দিয়ে আমি কী করবো ? ওরা এখানে নিজের থেকে হ'য়ে ওঠে নি, ঠাকুমা, আমি ওদের এখানে জোর করে' এনে পুঁতেছি।

ঠাকুমা অসহায়ের মতো বল্লেন,—তবে আমার কী হ'বে ?

—তোমাকেও সঙ্গে নিয়ে যাবো।

—আমাকে নিয়ে যাবি কোথায় ?

—অন্তত কাশী পর্যন্ত। হিন্দুবিধবার এক কাশী।

—কাশী! ঠাকুমা আহ্লাদে প্রায় ফেটে পড়লেন। তাঁকে কাশী রেখে বনানী যে তার পর কোথায় যাবে সে-কথা জিগ্‌গেস করবার কথা তাঁর আর মনেই রইলো না।

দরজার উপরে মৃদু দু'টো টোকা শোনা গেলো।

ঠাকুমাকে তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিয়ে চুলটা হাত-প্যাঁচ করে' বাঁধতে-বাঁধতে বনানী চাপা, দ্রুত গলায় বল্‌লে,—পালাও, শিগগির পালাও। কে যেন এসে পড়েছে। চুপ করে' শুয়ে পড়ো গে বিছানায়।

ঠাকুমা সরে' গেলেন।

কে এসেছে বনানী তা জানে। কিন্তু তার সামনে এতো উন্মুক্ততা নিয়ে সে যে কী করে, দাঁড়াবে, কিছুতেই তা সে ভেবে উঠতে পারলো না। তার চুল থেকে পায়ের নখে সমস্ত শরীর যেন আজ বড়ো বেশি কথা কইছে, পরনের শাড়িটাতে পর্যন্ত কথার সেই আভা, কথার সেই সৌগন্ধ্য। বনানী কী করে' মুছে ফেলবে তার শরীর। তার এই ব্যক্তিত্বের উচ্চারণ। যদি সে এই মুহূর্তে মরে' যেতে পারতো। যদি ভুলতে পারতো, সে এতো সুন্দর নয়, তার হঠাৎ এতো সৌন্দর্যে বিদারিত হ'য়ে যাবার অসহ্য চেতনা যদি সে পারতো ভুলতে। যদি সে হারিয়ে যেতে পারতো আকাশের সুদূর তারাহীনতায়, ঘরের প্রেতায়িত এই অনুপস্থিতিতে। বনানী চট করে' আয়নাতে একবার মুখটা দেখে নিলো, চেয়ারে পিছ্‌লে গেলো তার ভারহীন শ্লথতায়, ঢলে'-পড়া দিগন্তের আকাশের মতো, তাড়াতাড়ি টেব্‌ল্‌ থেকে টেনে নিলো একটা বই, যে-কোনো একটা পৃষ্ঠা খুলে বসলো কোলের উপর। দরজায় আবার বাজলো কা'র হাত, বনানীর বুকের মধ্যে যেন সেই

শব্দ—বনানী নির্বাপিত, অন্ধকার গলায় বল্‌লে,—আসুন, দরজাটা খোলাই আছে।

দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকলো সৌম্য—যেন এক দৈবত আবির্ভাব। বনানী যজ্ঞের আহিত অগ্নির মতো শিখায়িত হ'য়ে উঠলো। এক মুহূর্ত, ক্ষীণতম, আগ্নেয়তম একটি মুহূর্ত। তার পর রাশি-রাশি বিস্মৃতির ভস্ম ছড়িয়ে দিতে লাগলো সেই আগুনের উপর।

—এ কী, আপনার শরীর ভালো নেই নাকি? সৌম্যর স্বর যেন একটা বাতাসের মতো তাকে স্পর্শ করলে।

—ভালো আছে কি নেই ভেবে কিছু ঠিক করতে পারছি না। বনানী হাসি ও না-হাসির মাঝখানে নিচের ঠোঁট সূক্ষ্ম রেখায় প্রসারিত করলো: বসুন, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?

সৌম্য নিলো আরেকটা চেয়ার, একটু দূরে, জানলার কাছে, বনানীর ঠিক মুখোমুখি নয়।

কোনো কথা নেই।

বনানী তবু যেন ধরা পড়ে' গেছে তার এই দীর্ঘায়িত আলস্যে, তার এই দুর্লক্ষ্যচিহ্নতায়। ঘরময় বিচ্ছুরিত হ'য়ে উঠছে যে বিদ্যুত্বান স্তব্ধতা, সে যেন তারই একটা উন্মেষচ্ছটা। সমস্ত ঘরের ছড়ানো-ছিটোনেতে যেন তারই টুকরো-টুকরো কান্না, সাদা দেয়ালগুলোতে যেন তারই ঘুমের প্রেতচ্ছায়া। বনানী সদ্যধৃত শৃঙ্খলায়িত একটা পশুর মতো তার বিশাল-বিচরণীয় অরণ্যের পিপাসায় ছটফট করে' উঠলো। কী শান্তি, কী শাস্তি এই তার আত্ম-দৈত্যের হাত থেকে ছাড়া না পাওয়ায়, নিজের কাছে নিজের এই অপ্রতিরোধ্যতায়। বনানী খুঁজে বেড়াতে লাগলো সাধারণ একটি দিন, হাওয়ায় ভেসে-আসা ঝিরঝিরে ক'টি দিনের শিশিরকণা, শরীরহীন রাত্রির ক'টি ঘুম, আকাশ থেকে ঝরে' পড়া রাত্রির ক'টি পাপড়ি। খুঁজে বেড়াতে লাগলো সেই তার স্বাভাবিকতার সুর,



হায় তার স্বাভাবিকতা! আজ কিনা তাকে চেষ্টা করে' 'স্বাভাবিক' হ'তে হচ্ছে।

বনানী মন্থর নিবিড়তায় দুই চোখ তুলে সৌম্যর দিকে তাকালো। দীপ্তিতে-দৃঢ়তায় অঘাতনীয় সে কেমন যেন ক্লান্তিতে রয়েছে ঘুমিয়ে, বেশে-বাসে কেমন একটা নিশ্চেতন ঔদাস্য। যেন সে শিরার সমস্ত শিখায় চঞ্চল হ'য়ে তার ঘরে ঢুকেছিলো, কিন্তু বনানীর আবহাওয়ায় এসে সে-ও পড়েছে থেমে, অনুতপ্ত নৈর্ব্যক্তিকতায় গেছে হারিয়ে। যেন তারো মাঝে রোগা, বন্দী একটা ঘর করছে হাহাকার, তারো মাঝে।

কথা, কিন্তু কী কথা কে বলবে? যতোক্ষণ তারা কথা কইছে না, ততোক্ষণ এ ঘরের বাইরে, অপরিচেয় নীল অন্ধকারে তারা ফুটছে প্রার্থনার ভাষার মতো, ফুটছে কোথায় ফুল মৃত্যুর মদির পরিপূর্ণতায়, কোথায় কোন বিস্তীর্যমান নিঃশব্দ আকাশের নিচে নীল হ'য়ে উঠেছে সমুদ্র। এখনো, যতোক্ষণ তারা ঘরের মধ্যে চুপ করে' বসে' আছে, এখনো সেই সমুদ্র উঠেছে স্তনিত হ'য়ে। তার নেই বিরতি, তার নেই বিবলতা, তাদের ঘুমের মধ্যেও তার ঢেউ, সেই ধূসরায়মান সমুদ্রের। যতোক্ষণ তারা নেই, তখনো স্বপ্নের মতো ফেটে পড়ছে তারা, মৃত্যুর মতো জাগছে ফুল, ঘন বিস্মৃতির মতো ছড়িয়ে পড়ছে সমুদ্র। শুধু তারাই নয়—তাদের দু'জনকে নিয়েই নয় পৃথিবী। তাদের দু'জনের পৃথিবীর বাইরেও আরো অনেক জায়গা আছে, অনেক আশাহীনতা, অনেক মৃত্যু।

না, এইভাবে আর চলতে পারে না। যখন সে তাকে টেনে নেবেনা তখন বনানীই এগিয়ে যাবে। ঢেউ যেমন তীরের দিকে এগিয়ে যায়। যদি জাগাতে পারে বন্যা, ভাসাতে পারে তটরেখা, করতে পারে দিক-পরিপ্লাবী। হ্যাঁ, সেই ঝাঁপিয়ে পড়বে অন্ধকারে—সেই প্রথম হাত বাড়াবে। দুই ব্যাকুল হাত। 'হারণু কাঁচলি ভারণু হার।' সেই

উন্মাদ বন্যতার স্রোতে ভেসে যাবে তুচ্ছ-তুচ্ছ-কর্তব্যের আবর্জনা, সমাজের কুটো-কাঁটা, ভদ্রতার ধুলো-মাটি। যত কিছু লজ্জা আর রুগ্নতা, দ্বিধা আর দৈন্য। শরীরের শঙ্খে বাজবে জীবনের জয়ধ্বনি ! সেই ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিমান হ'বে সৌম্য।

তারপর ?

তারপর কে জানে—

বনানী হঠাৎ কথা কয়ে' উঠলো, অন্ধকারের আত্মার মতো : জানেন, আমি শিগগিরই এখান থেকে চলে' যাবো।

—কোথায় যাবেন ? সৌম্য জানলার থেকে চোখ সরিয়ে আনলো।

—তা এখনো ঠিক করি নি।

—আমিও যাবো, আগুনের অন্তর্নিহিত নিগূঢ় অন্ধকারের মতো সৌম্য বলে' উঠলো : আমিও যাবো আপনার সঙ্গে।

—আপনি কোথায় যাবেন ? বনানী উঠলো হেসে।

—জানি না, জায়গা আমরা খুঁজে নেবো। সৌম্য দৃঢ়তায় হঠাৎ উচ্চারিত হ'য়ে উঠলো : অনেক, অনেক জায়গা পৃথিবীতে। এমন একটা জায়গা, যেখানে আমাদের আগে পৃথিবীর আর কেউ কোনোদিন যায় নি, যেখানে নেই এই জনতার কোলাহল, নেই এই একটা সমষ্টীকৃত মানবতা। পার থেকে বিশাল একটা সামুদ্রিক মুক্তিতে।

বনানী আচ্ছন্ন, ধূসর গলায় বল্লে,—আমাদের আত্মার নিভৃতি ছাড়া তেমন জায়গা আর কোথায় আছে ?

—আছে, আছে, আপনিও জানেন না, আমিও জানি না, তবু আছে, থাকা উচিত, ঈশ্বরের পৃথিবীতে থাকা উচিত। চলুন, চলতে-চলতে একদিন সে-জায়গা আমরা পেয়ে যাবো। সৌম্য চেয়ার ছেড়ে হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো। এইবার নিশ্চয় সে বনানীর হাত ধরবে, আকর্ষণ

করবে সামনের দিকে। বুকে এসে লীন হ'বে বনানী। ঈশ্বরের পৃথিবীতে পেয়ে যাবে তার জায়গা, তার নিজের জায়গা।

সৌম্য নড়লো না। সৌজন্যে স্নিগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

বনানী মৃদু ভীরু গলায়, বিচ্ছিন্ন একটি তারার মতো বল্লে,—আমার অন্য জায়গায় ভালো একটা চাকরি পাবার সম্ভাবনা হয়েছে মাত্র, সেইখানেই যাবার কথা আপনাকে বলছিলুম। বসুন, ভেতরে চা-র কথা বলে' দিয়ে আসি। বলে' বনানী তাড়াতাড়ি চলে' গেলো, নিবে গেলো। যেন এ-ঘর থেকে লণ্ঠনটা কে নিয়ে গেলো ও-ঘরে।

চা-টা বনানী নিজেই তৈরি করলে। কাটতে দিলো খানিকটা সময়। যাতে সে ফিরে গিয়ে অন্য কথা পাড়তে পাবে। অন্তত চায়ের রঙ ও স্বাদ নিয়ে একটু হালকা গবেষণা। দিন-কাল নিয়ে কথা। যা ঘটে' গেছে সেই সব নিশ্চিন্ত বিষয়। কিন্তু চা হাতে করে' ঘরে ঢুকেই তাকে বলতে হ'লো: আপনি কোথায় যাবেন আমার সঙ্গে?

সৌম্য হাত বাড়িয়ে পেয়ালাটা নিতে-নিতে বল্লে,—আপনিই বা কোথায় যাবেন? আপনাকে যেতে দিলে তো? শুনি, কোথায় আপনার চাকরি হয়েছে?

বনানী শব্দ করে' হেসে উঠলো: সেই জায়গাটার নামই তো এতোক্ষণ ধরে' ভাবছিলুম। দাঁড়ান, আমি আসছি আমারটা নিয়ে। দু'জনে পরামর্শ করে' একটা জায়গা বা'র করতে পারবো নিশ্চয়। যা আপনি বলেছেন, অনেক, অনেক জায়গা। বনানীর গলা সিল্কের একটা ফিতের মতো যেন হালকা হ'য়ে গেলো: চাকরি হোক বা না হোক, কিছু আসে যায় না, যাওয়া তো যাবে। কী বলেন, জীবিকা বড়ো, না জীবন বড়ো?

সৌম্য বল্লে,—কিন্তু যেতেই বা হ'বে কেন?

—যেতেই বা হ'বে কেন? বনানী আবার অদ্ভুত করে' হেসে উঠলো: যেতে হ'লে যে আপনার আবার এই চাকরিটা থাকে না। দাঁড়ান, চা-টা নিয়ে আসি।

বনানী প্রায় ভিতরে যাবার পর্দাটা ছুঁয়েছে, দরজার উপর দ্রুত ঠুক-ঠুক শোনা গেলো। সৌম্য কী-একটা কথা বলবার জন্যে উঠেছিলো উদ্দীপ্ত হ'য়ে, গেলো জুড়িয়ে। কথার আর শেষ হ'তে সময় পেলো না।

বনানী দরজাকে লক্ষ্য করে' বল্‌লে,—Come in.

তবু দরজার সঙ্কোচ গেলো না।

সৌম্য বিরক্ত হ'য়ে বল্‌লে,—দরজা খোলা আছে, ধাক্কা দিন।

দরজাটা প্রাণপণে দু' ফাঁক হ'য়ে গেলো।

—এ কী, আপনি এখানে কোত্থেকে? সৌম্য চেয়ারের হেলানো পিঠ থেকে ঋজুতায় ছিটকে পড়লো।

বিশুবাবু হাঁপ নেবার জন্যেও এক সেকেণ্ড থামলেন না, রুদ্ধশ্বাস ব্যাকুলতায় বলে' উঠলেন: শিগগির বাড়ি চলুন, বৌ-মার অবস্থা খুব খারাপ।

চেয়ারের চওড়া হাতলটা মুঠোর মধ্যে শক্ত করে' চেপে ধরে' সৌম্য জিগ্‌গেস করলো: কী করে' জানলেন আমি এখানে আছি?

বিশুবাবু সে-প্রশ্নের ধার দিয়েও গেলেন না। ব্যাকুলতায় ছিঁড়ে পড়ছেন এমনি সকাতরে তিনি বল্‌লেন,—হঠাৎ নাড়ী ছেড়ে গেছে, বাড়িতে একটাও এখন ডাক্তার নেই। শিগগির চলুন। বিশুবাবু প্রায় ডুকরে কেঁদে ওঠবার জোগাড়।

সৌম্য চেয়ারের পিঠে ফের ঢলে' পড়লো। বল্‌লে,—ডাক্তারের বাড়ি না গিয়ে সোজা এখানে চলে' এলেন কী বলে'?

—শুনলুম আপনিই নাকি ডাক্তারের কাছে গেছেন।

—যাই নি তাই বা জানলেন কী করে'? খোঁজ নিতে গিয়েছিলেন সেখানে?

—সময় ছিলো না, একদম সময় নেই আর। বিশুবাবু যন্ত্রণায় পাংশু হ'য়ে গেলেন: এখন ডাক্তারের চেয়ে আপনাকেই বেশি দরকার। আপনাকে একটিবার দেখবার জন্যে বৌমা চারদিকে চেয়ে আছেন।

—চারদিকে যখন স্পষ্ট চেয়ে আছেন, এবং যখন তা স্পষ্ট আমারই জন্যে, তখন কোনো ভয় নেই। সৌম্য ঝুঁকে পড়ে' চেয়ারের হাতলে রাখা চায়ের বাটিতে ছোট্ট একটি চুমুক দিয়ে বল্লে,—যান, আমি যাচ্ছি।

বিশুবাবু হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন।

—যান, দাঁড়িয়ে রইলেন কী হাঁ করে'? সৌম্য নৃশংস কণ্ঠে বল্লে, —আমি যে এখানে আছি এটা কারুর জানবার কথা নয়। আপনি যে কী করে' জানলেন পরে আমি এর জবাবদিহি নেবো। আমার এখন ডাক্তারের বাড়িতে থাকবার কথা, বাড়িশুদ্ধ সবাই তা জানে। ডাক্তারের বাড়ি থেকে এতো শিগগির ফেরবারো আমার কথা নয়। যান, এখানে বোকার মতো দাঁড়িয়ে থেকে আপনার কী হচ্ছে?

বিশুবাবু দরজাটা খোলা রেখেই চলে' যাচ্ছিলেন, সৌম্য উঠে দরজাটা দু'হাতে বন্ধ করে' দিলে। বন্ধ করে' দিলে সমস্ত পৃথিবী।

বিশুবাবু তখুনি ছুটলেন ডাক্তারের বাড়ি, তাঁর মনে হ'লো সৌম্য এখানে নেই, সৌম্য ডাক্তারের বাড়িতেই বসে' আছে।

পর্দার পাশে বনানী এক মুঠো ছাইয়ের মতো সাদা, হালকা হ'য়ে গেছে। যেন জোরে একটা বাতাস দিলে সে উড়ে যাবে। শরীরে নেই এক ফোঁটা প্রাণ, যেন পর্দারই একটা অংশ।

—ও কী, যান, আপনার চা-টা নিয়ে আসুন। জুড়িয়ে জল হ'য়ে গেলো যে।

সৌম্য পায়ে-পায়ে জুতোর গোড়ালি দুটো দুমড়াতে-দুমড়াতে ফের চেয়ারে এসে বসলো।

পর্দাটা উঠলো দুলে'। বনানী নিশ্চিন্ত, নীরব পদক্ষেপে সৌম্যর সামনে এসে দাঁড়ালো। বরফের মতো ঠাণ্ডা, জমানো চোখে বল্‌লে,—কী, এখনো বসে' আছেন নাকি?

চায়ে ঠোঁট ডুবিয়ে সৌম্য বল্‌লে,—হ্যাঁ, দাঁড়ান, চা-টা আগে শেষ করি। চুমুকটা টেনে সৌম্য সোজা হ'য়ে একটু হাসলো: আপনারটা ফেলেছেন বলে' আমি তো ফেলতে পারি না।

বনানী একটা চেয়ার ধরে' ফেলে শরীরে কাঠিন্য আনলে। বল্‌লে,—ডাক্তারের ওখানে যাবার নাম করে' এ-বাড়ি এসে বসে' আছেন?

—তা ছাড়া আবার কী। সৌম্য আপন মনে উন্মত্ত হেসে উঠলো: একজনে মরতে বসেছে বলে' আমিও তো আর মরতে পারি না। কা'র ডাক্তার—কোথায় ডাক্তারের বাড়ি। সৌম্য চায়ে আবার একটা দীর্ঘ চুমুক দিল।

বনানী তার তীব্র সচেতনতায় বহু কষ্টে একটা চীৎকার নির্গত করলে: না, আপনি যান।

—কোথায় যাবো? শুনলেন তো বিশুবাবুর মুখে। সেখানে গিয়ে আমি কী করবো? আমার কী কাজ?

—না, আপনি যান। অসহায় আর্ততায় বনানী আবার চেঁচিয়ে উঠলো: আপনাকে কিছুতেই আমি এখানে বসে' থাকতে দেবো না। সৌম্যর মূঢ়, আচ্ছন্ন দৃষ্টির উপর বনানীর উপস্থিতিটি বিশাল একটা ছায়ার মতো যেন ঝুলতে লাগলো: না, কক্খনো নয়। এটা আমার বাড়ি, এখনো এটা আমার বাড়ি, আপনাকে যেতেই হ'বে।

সৌম্য ধীরে-ধীরে উঠে দাঁড়ালো। প্রস্তরীভূত গলায় বল্‌লে,—কিন্তু সব এতোক্ষণে হয়তো শেষ হ'য়ে গেছে।

—হোক শেষ। শেষ হওয়াই তো আমি চাই। বনানী হাতের একটা নিষ্ঠুর ইশারা করলে : আপনি যান।

যন্ত্রচালিতের মতো সৌম্য দরজার বাইরে ছোট রোয়াকটুকুর উপর এসে দাঁড়ালো। বললে,—যাচ্ছি, কিন্তু ফিরে সেখানেই যে যাবো তার কী মানে আছে?

—তা আমি জানি না, তা আমি জানি না। বনানী সৌম্যর পিঠের উপর দরজাটা সজোরে বন্ধ করে' দিলে। হাত বাড়িয়ে তাড়াতাড়ি আলোটা দিলে নিভিয়ে এবং চতুর্দিকের সেই অন্ধকারে কোথায় যে সে যাবে কিছু পথ না পেয়ে সামনের চেয়ারের মধ্যে বসে' পড়লো।

আলো নেভানোটুকু পর্যন্ত সৌম্য দেখলো, দেখলো তাকে বিস্তীর্ণ একটা ইশারার মতো, আশার মতো। যন্ত্রের মতো চালিয়ে নিয়ে চললো তার শরীর, রাস্তা দিয়ে, কোথায় যে কখন বাড়ির দিকে বেঁকতে হ'বে শেষ পর্যন্ত কিছু খেয়াল করলো না। একটা ট্যাক্সি নিয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মতো এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়াতে লাগলো।

আসুক মৃত্যু, সমুদ্র থেকে হাওয়া, আসুক বনানীর ঘরের মতো পরিপূর্ণ অন্ধকারের মুক্তি।

সতেরো

এবার—সত্যি এবার আর কী করা যায়? হাতে এখনো অনেক সময়।

মাঝে তিনটে দিন কেটে গেছে, বনানী শিপ্রার আর কোনোই খবর পায় নি, সৌম্যও আর আসছে না। সেই থেকে কী যে সত্যি হ'লো, শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে যে সে দাঁড়ালো, বনানী কিছু বুঝতে পারলো না।

বনানী আজ আর স্কুলে যায় নি, যাবার আর দরকারো ছিলো না—সারা দিন কুলি লাগিয়ে জিনিস-পত্র বাঁধা-ছাঁদা করেছে। ট্রেন সেই রাত সাড়ে দশটারো পর। কাজকর্ম সব এরি মধ্যেই গেছে ফুরিয়ে এখন কেবল কতোগুলি ছেঁড়া-ছেঁড়া সময়ের কুয়াশা, অস্পষ্ট কতোগুলি চেতনার সুর।

বিকেলের আলো ম্রিয়মাণতায় গাঢ় হ'য়ে আসছে, আকাশকে দেখাচ্ছে স্নিগ্ধ একটি মার্জনার মতো। অন্ধকারের শীতল সম্ভাবনায় আকাশ থরথর করে' কাঁপছে—আদিম, আহিম সেই অন্ধকার—তারপর আবার, বনানী আবেগের তীব্রতায় দুই চোখ বন্ধ করলো—তারপর আবার উদার, উলঙ্গ সূর্যোদয়, সেই দৈবত আবির্ভাব। কালকের সেই অজায়মান সূর্যের জন্যে বনানীর সমস্ত অস্তিত্ব মৃত্তিকার মতো পিপাসু হ'য়ে উঠলো।

ঠাকুমা পিছনে এসে দাঁড়ালেন। খুশিতে তরলায়িত তাঁর শরীর: কাশী কখন পৌছুবে বল্‌লি?

—কাশী? বনানী চম্‌কে উঠলো: যাওয়া আমাদের একেবারে না-ও হ'তে পারে, ঠাকুমা।

—সে কী কথা ? বাঁধা-ছাঁদা ঠিকঠাক, চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে এলি, বাড়িভাড়া দিলি চুকিয়ে—এখন আবার যাবি নে কী বলছিস ?

বনানী খিলখিল করে' হেসে উঠলো : বাঁধা-ছাঁদা আবার খুলে ফেলতে কতোক্ষণ ? চাকরি সংসারে কেবল একটাই নেই, ঠাকুমা, বাড়িভাড়াটা না-হয় আবার চুকিয়ে দেয়া যাবে।

—না, তোকে নিয়ে আর পারি না। আমি বলে—ঠাকুমা প্রায় ছোট খুকির মতো ঠোঁট ফুলোলেন।

বাৎসল্যের অজস্রতায় বনানী তাঁকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলো। তাঁর ছোট-ছোট পাকা চুলে হাত বুলুতে-বুলুতে বল্লে,—তোমার কাশী যাওয়া কেউ ঠেকাতে পারবে না, আমাকে এখানে থাকতে হ'লেও তোমাকে কাশী পাঠানো আমি ঠিক করে' ফেলেছি। তোমার মতো আমারো তো একটা তীর্থ থাকতে পারে, ঠাকুমা।

ঠাকুমা সজল চোখ তুলে বল্লেন,—সে কবে ?

বনানী শিথিল হ'যে এলো : একটু দাঁড়াও, ঠাকুমা। আমি একটু ঘুরে আসি।

বনানী সামান্যতম একটু সাজগোজ করবারো চেষ্টা করলো না, শরীরের সেই এলোমেলো উড়ো হাওয়ায় ঘর থেকে গেলো বেরিয়ে।

কখন কী ঘটে' যেতে পারে, তার উপরে বনানীর কোনো শাসন নেই। হয়তো তাকে সেদিন তেমন করে' তাড়িয়ে দেবার জন্যেই সৌম্য আর আসছে না, এই সন্ধ্যার অভিমানে মন ভার করে' আছে, নইলে হয়তো, হয়তো তার পথ পড়ে' আছে খোলা, চারধারে তার এখন এই সমাপ্তহীন অন্ধকারের মুক্তি। বনানী তাড়াতাড়ি পা চালাতে লাগলো। কতোটুকু বা দূর, পায়ে-পায়ে পথ যাচ্ছে কেমন বেড়ে। সত্যি, কতোটুকুই বা দূর, পায়ে-পায়েই পথ সে একসময় শেষ করে

ফেলবে। কে জানে কী ঘটে' যেতে পারে এক মুহূর্তে, সেই পথের অবারিত বিরতিতে।

ঠাণ্ডা, ঘুমন্ত বাড়ি। মৃত্যু দিয়ে মাখানো, প্রতীক্ষায় নিমজ্জিত। সমস্ত বাড়ির উপর বিশাল একটা ছায়া যেন পাখা মেলে আছে, মৃত্যুর ছায়া, বনানীর প্রত্যাসন্ন আবির্ভাবের ছায়া। বনানী যেন সর্বাঙ্গে মৃত্যুর মৌনময় মমতা নিয়ে এসেছে।

নিচে বনানী কাউকে কোথাও দেখতে পেলো না। সিঁড়ি ভেঙে-ভেঙে অন্ধকার ঠেলে-ঠেলে উপরে উঠতে লাগলো। মৃত্যুর মতো অজানা, অপরূপ অন্ধকার। তার ঘ্রাণে ও ছোঁয়ায় বনানীর সমস্ত চেতনায় যেন মধুর মুহ্যমানতার একটা নেশা ধরে' গেছে। এই অন্ধকারের ঊর্ধ্বে, উত্তপ্ত উত্তরে, অপশোক সূর্য আছে দাঁড়িয়ে।

উপরটাও আশ্চর্য রকম ফাঁকা। যেন একটা ভূতে-পাওয়া ছাড়া বাড়ি! বনানীর ভয় করতে লাগলো—আনন্দেরই মতো অসহ্য সে ভয়। হাতের কাছেই শিপ্রার ঘর, দরজাটা বন্ধ, তার সেই নিরুত্তর ইঙ্গিত বনানীকে সহসা দিগন্তলীন দূর সমুদ্ররেখার মতো অস্পষ্ট ডাক দিয়ে উঠলো। যেন উত্তরঙ্গ জলের একটা বাঁধ, বাঁধনটা খুলে দিলেই রাশি-রাশি অন্ধকার জলে সে তার সমস্ত সৃষ্টি নিয়ে ভেসে যাবে, ভেসে যাবে সে কোন বিরল, বিশাল নির্জনতায়।

দুই হাতে আক্রমণের বন্যতা এনে বনানী দরজায় ধাক্কা দিলে। দরজাটা ভিতর থেকে ভেজানো ছিলো মাত্র, খুলে গেলো। গায়ে এসে লাগলো মৃত্যুময় স্তব্ধতার স্পর্শ। নরম, নীল অন্ধকার। বাতাসে শিকারীর গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে কিনা এমনি তীক্ষ্ণাগ্র চেতনায় বনানী চৌকাঠ পেরিয়ে আস্তে-আস্তে ঘরে ঢুকলো। সব অন্ধকার, নিভৃত, নিরাপদ, নিশ্চিন্ত একটি গুহার আশ্রয়। নিবিড় একটি উষ্ণতা।

ঘরের মধ্যে থেকে অন্ধকার হঠাৎ কথা কয়ে' উঠলো: কে?

বনানী তখুনি হয়তো পালিয়ে যেতো, কিন্তু স্বরটা সে মনের মধ্যে শুনলো কি না, ঠিক ঠাহর করতে পারলো না। জানলাগুলো হাওয়ায় হা-হা করছে, হয়তো তারই একটা জিজ্ঞাসা। বনানী এগিয়ে গেলো খাটের দিকে।

দিব্যি বিছানা পাতা, তাতে শিপ্রা—শিপ্রা শুয়ে।

—কে ?

বনানী না বলে' পারলো না : আমি।

—কে, বনানী-দি ? শান্ত জলের উপর অশরীরী ছায়ার মতো শিপ্রা কেঁপে উঠলো : এসো, এসো, তোমার কথাই ভাবছিলুম। ভাবছিলুম তোমাকে একটা খবর পাঠাই। কতোদিন তুমি আসো নি।

বনানী তার কপালের উপর হাত রাখলো। বল্‌লে,—এখন কেমন আছ ?

—ভালো নয়, আর ভালো লাগে না এমনি ভুগতে। মৃত্যুর একেকটা ঢেউ আসে, ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারে না পার থেকে, শুধু ভিজিয়ে দিয়ে চলে' যায়। রোগ একটা অপমান, শরীর পারছে না আর এ অপমান বইতে। ঝরা পাতার স্তূপে শিথিল একমুঠো বাতাসের মতো শিপ্রা চঞ্চল হ'য়ে উঠলো : খোকাকে নিয়ে আয়াটা গেলো কোথায় ? ঘর-দোর যে ভীষণ অন্ধকার। আলোটা জ্বালাও, বনানী-দি। ঐ যে, আমার মাথার কাছেই সুইচ।

বনানী আলো জ্বালালো। রূঢ়, অনাবৃত বাস্তবতায় সমস্ত ঘর যেন নিমেষে শূন্য হ'য়ে গেলো।

বনানী আলোয় এসে দাঁড়ালো শিপ্রার খাটের কাছে।

—তুমি কী সুন্দর, বনানী-দি ! মুগ্ধতায় পরিব্যাপ্ত দুই চোখে শিপ্রা হেসে উঠলো।

—সুন্দর ?

—হ্যাঁ, ভীষণ সুন্দর! বনানীর অবশ একখানি হাত শিপ্রা তার বিশীর্ণ, গ্রন্থিল ক'টি আঙুলের মধ্যে তুলে নিলো: যেন মধ্যরাত্রির অন্ধকারে ফোটা সাদা একটা ফুল। কী তীব্র তোমার শুভ্রতা। ভাদ্রের নদীর মতো তুমি জীবনে উঠেছ ভরে', চৈত্রের আকাশের মতো ধারালো নীলিমায়। আমিও সুন্দর হ'বো, আমিও একদিন সুন্দর হ'বো, বনানী-দি।

তার মুখে এতো কথা কেউ কোনোদিন শোনে নি। বনানী অবাক হ'য়ে গেলো। তার আঙুলের উপর স্নেহে একটু চাপ দিয়ে বল্‌লে,—ভালো হ'য়ে উঠলেই আবার শরীরে তোমার সেই পুরোনো পূর্ণতা ফিরে আসবে।

—না, আমি সুন্দর হ'বো মৃত্যুতে, প্রশান্ত একটি মৃত্যুতে। আমার মধ্যে আর এককণা পবিত্রতা নেই, নেই বাঁচবার এতোটুকু দীপ্তি। মরলেই বরং কিছু একটা আমি হ'বো। কবে' যেতে পারবো কিছু জীবনে। ও কী, তুমি দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বোসো, বোসো, আমার পাশে এসে বোসো। ভয় নেই, রোগটা আমার ছোঁয়াচে নয়। ওঁর ফিরে আসতে এখনো দেরি আছে।

বনানীকে বসতে হ'লো। বল্‌লে,—কেন, আমি কি তোমার কাছে আসতে পারি না নাকি?

—আমার কাছে এসেছ? শুনে খুব খুশি হলুম—আমার কাছে কেউ আবার আসে! কেউ আসে না। হাতে তার একগাছিও গয়না নেই, হাড়ময় গরম একখানি হাত বনানীর কোলের উপর মেলে দিয়ে শিপ্রা বল্‌লে,—তোমার সঙ্গে আমার কতো কথা আছে। শিপ্রার বুকটা দুলতে লাগলো: কতো কথা। তোমাদের বিয়ে কবে হচ্ছে, বনানী-দি?

—বিয়ে? বনানী যেন দু'খণ্ড হ'য়ে গেলো: আমি আবার কবে বিয়ে করতে গেলুম!

—কয়া তো উচিত। আমার জন্যে তোমরা অপেক্ষা কোরো না। আমি মরি-বাঁচি, তোমাদের মাঝে আমি কেউ নই, আমি বেসুর, অবান্তর। হারাতে দিয়ো না এই সোনার মুহূর্তগুলো। শিপ্রা চোখ বুজে গভীর অন্ধকারে জীবনের সঙ্গে তার শেষ সম্পর্কটুকু যেন প্রাণপণে ছিন্ন করতে চাইলো: আমি অনেক ভেবে দেখেছি, বনানী-দি, সত্যি আমি কেউ নই, তোমাদের জীবনের পরিপূর্ণতার কাছে আমি কতোটুকু। সমস্ত সৌরমণ্ডলের তুলনায় এই পৃথিবীর চেয়েও তুচ্ছ।

—তুমি এ-সব কী বলছ, শিপ্রা?

—জীবনে চাই মহৎ নিষ্ঠুরতা, শিপ্রার মধ্যে থেকে মৃত্যু যেন কথা বলতে লাগলো: বাঁচবার জন্যে আমাদের অনেক কিছু বর্জন করতে হয়। আমরা মীমাংসা করে' বাঁচি না, বাঁচি নিষ্ঠুর হ'য়ে। আমি অনেক ভেবে দেখেছি, বনানী-দি, আমার আর কোনো ক্ষোভ নেই, অতৃপ্তি নেই, আমি মিছিমিছি আগে মারামারি করতে গিয়েছিলুম—ভেবে দেখলুম সংসারে আমার সুখটাই বড়ো নয়, তার চেয়ে আরো অনেক বড়ো সুখ আছে, আরো অনেক পূর্ণতা, তা আমি কল্পনাও করতে পারি না। আমার জন্যে তো মৃত্যুই আছে, তাও আমি কল্পনা করতে পারতুম নাকি? শিপ্রা কাকুতিতে শীর্ণতরো হ'য়ে এলো: মিছিমিছি তোমরা আর দেরি কোরো না।

কঠিন না হ'য়ে বনানীর উপায় ছিলো না, সেটা তার সভ্যতার অস্ত্র তার আত্মরক্ষার অধিকার।

—তোমার স্বামীর নামে শুধু-শুধু এই অপবাদ দিচ্ছ কেন? কেন নিজেকে অশান্ত করে' তুলছ?

—অপবাদ! তুমি এ বলছ কী, বনানী-দি? শিপ্রা উঠে বসতে চেষ্টা করলো, পারলো না, বালিশের উপর পিঠ পড়লো ভেঙে। বিছানার সঙ্গে মিশে গিয়ে বললে,—গভীর, গভীর সত্য কথা। আমি জানি,

আমি জানি, আমাকে তিনি না বললেও আমি বুঝতে পেতুম। সত্যি আমি কে, আমাকে তিনি এমনি পেয়ে গেছেন মাত্র, কিন্তু তোমাকে করেছেন নির্বাচন, করেছেন সৃষ্টি। আমি জানি, আমি জানি, বনানী-দি। নির্বাচনটা সেদিনো অনায়াসে হ'তে পারতো, কিন্তু মাঝখানে ছিলো আমার ভাগ্য। শিপ্রা হেসে উঠলো: আমি আবার একটা বাধা হ'তে গিয়েছিলুম!

বনানী তার মুঠো থেকে হাত সরিয়ে নিলো। বল্‌লে,—তুমি জানতে পারো, তাতে আমার কী! তুমি জানলেই তো আর হ'বে না।

—কেন তুমি কিছুই জানো না নাকি? তোমাকে এতো বুদ্ধিমতী বলে' এতোদিন পূজো করে' এসেছি, আর এই সামান্য কথাটা তুমি বুঝতে পারলে না? শিপ্রা আবার হেসে উঠলো: আমি যে তোমাকেও জানি, বনানী-দি। আমার কাছে তুমি কোনোদিন কিছু লুকোও নি, আজো পারবে বলে' মনে কোরো না।

—কী, কী জানো তুমি? বনানী খাট থেকে নেমে পড়্‌লো।

—নিজে মেয়ে হ'য়ে বুঝতে পারি না এই মেয়ের মন? কখন, কিসে তারা আগুনের মতো সুন্দর হ'য়ে ওঠে, মধ্যরাত্রে ফোটা সাদা ফুলের মতো সুন্দর? শিপ্রার মধ্যে থেকে মৃত্যু উঠলো হেসে: আমিও যে একদিন তেমনি করে' সুন্দর হয়েছিলুম আমার সেই বিয়ের রাতে। আমি যে তা জানি, বনানী দি।

কর্কশতায় বনানীকে ভারি করুণ শোনালো: আমাকে আজ তুমি এমনি অপমান করবে নাকি?

—অপমান, তোমাকে অপমান! তোমার এই স্বাস্থ্য, এই রূপ, এই পবিত্রতা—তাকে আমি অপমান করবো? অসুস্থ শিশু যেমন তার রোগ বোঝাতে পারে না, কেবল ছলছল করে' চেয়ে থাকে, তেমনি অগাধ চোখে শিপ্রা চেয়ে রইলো: এতে কোনো অপমান নেই, কোনো

লজ্জা নেই। আমি অনেক ভেবে দেখেছি, বনানী-দি, নেই এক তিল নিন্দার অবকাশ। ভীষণ সোজা, যা কিছু সত্য তাই অত্যন্ত সহজ। আর যা সহজ নয়, তাই জানবে ভয়ানক মিথ্যে, ভয়ানক মিথ্যে। শিপ্রা আবার সেই অশরীরী হেসে উঠলো: আমি আবার জোর দেখিয়ে বাধা হ'তে গিয়েছিলুম—মিথ্যের কী জোর? কুৎসিত, পাপী, নির্লজ্জ মিথ্যে।

বনানী কী বলবে কিছু ভেবে পেলো না, চলে' যাবার জন্যে শরীরে একটা চঞ্চলতা আনলে।

—ও কী, তুমি চলে' যাচ্ছ নাকি? যেয়ো না, যেয়ো না, তোমার সঙ্গে আরো অনেক কথা আছে যে। কেনই বা তুমি যাবে, কিসের ভয়ে? শিপ্রার চোখ-মুখ, সমস্ত শরীর জলে' উঠলো: কাউকে তুমি কোনোদিন ভয় করো নি, লোকনিন্দা তুমি দু' পায়ে মাড়িয়ে গেছ, যা তোমার চাই তা-ই নিয়েছ জোর করে' কেড়ে—তুমি ছাড়বে কেন তোমার সত্য, তোমার বাঁচবার অধিকার? আমার মতো তুমিই বা কেন হেরে যাবে? শিপ্রা আবার উঠে বসতে চাইলো বিছানার উপর, আবার গেলো ভেঙে টুকরো-টুকরো হ'য়ে: কথা কও, কথা কও বনানী-দি, চুপ করে' গেলে কেন?

বনানী খাটের কাছে সরে' এলো, নিচু হ'য়ে মমতায় আর্দ্র, অন্ধকার মুখের ছায়া তার মুখের উপর ছড়িয়ে দিলো। বল্লে,—তুমি ভালো হ'য়ে ওঠো, শুধু তুমি ভালো হ'য়ে ওঠো, শিপ্রা।

—ভালো আমি সত্যিই হচ্ছি না। একবার ডুবছি আর ভেসে উঠছি। চিরন্তন তলিয়ে যেতে পারছি না। শিপ্রা আবার অস্থির হ'য়ে উঠলো: তুমি চলে' যেয়ো না, বনানী-দি। উনি এক্ষুনি এসে পড়বেন। আপিস থেকে ফিরতে তাঁর আজকাল এমনিই দেরি হয়। এখানে ভালো না লাগে, পাশের ঘরে গিয়ে একটু বোসো। আলোটা কাউকে জেলে দিতে বলো। আমি আর পারছি না।

বনানী সামনের পাথরের বাটি থেকে আঙুলে করে' খানিকটা জল নিয়ে শিপ্রার উত্তপ্ত কপালের উপর বুলিয়ে দিতে লাগলো। বললে,—তুমি এখন একটু ঘুমোও, আমি বসছি।

—আ, সত্যি আমার এখন ঘুমিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে। শিপ্রা শুকনো, দীর্ঘ পালকগুলি বিছিয়ে দিয়ে আস্তে-আস্তে চোখ বুজলো: আমি দেহে-মনে ভীষণ রোগা হ'য়ে গেছি, ভীষণ আধখুটে। না, আর কথা বলবো না। কথা বলার আর কী দরকার? তুমি বসে' আছ দেখলে উনি কতো যে খুশি হ'বেন, বনানী-দি। আমাকে জাগিয়ো না, উনি এলেও আমাকে জাগিয়ো না, আমি তখনো ঘুমিয়ে থাকবো। খানিক পরে নার্স হয়তো এসে পড়বে, আমাকে তার হাতে সঁপে দিয়ে তোমরা কোথাও বেড়িয়ে এসো, কেমন?

—আচ্ছা, তুমি এখন লক্ষ্মী মেয়ের মতো ঘুমোও। বনানী বললে।

বাটিতে দিলো খানিকটা শুভ্রতা। শিপ্রা সত্যি ঘুমিয়ে পড়েছে কিনা আস্তে-আস্তে তার পরীক্ষা করলো। আস্তে-আস্তে আঙুল ক'টি নিলো তুলে, সান্নিধ্য আনলো শ্লথ করে'। পা টিপে-টিপে উঠে গেলো সুইচ-বোর্ডের কাছে—টুক করে' সমস্ত ঘর অন্ধকার করে' দিলে।

নরম, নীল অন্ধকার।

বনানী পা টিপে-টিপে আবার, আরেকবার, একা ঘরে শিপ্রার বিছানার কাছে ঝুঁকে দাঁড়ালো। শুনতে চেষ্টা করলো তার নিশ্বাস। গা ছুঁয়ে লোভ হ'লো দেখতে। ইচ্ছে হ'লো সেই প্রথম চীৎকার করে' ওঠে।

ভীত, তাড়িত একটা পশুর মতো বনানী তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলো।

আপিসের কাপড়-চোপড় ছেড়ে সৌম্য তার বসবার ঘরের অন্ধকারে শূন্যোপস্থিতিতে মিশে যাচ্ছিলো তার পরিপার্শ্বের সঙ্গে, শুনতে পেলো

পাশের ঘরে শিপ্রা ঘুম ভেঙে হঠাৎ ভয়ানক চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে। কা'কে যেন ডাকছে, কা'কে যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে।

সৌম্য সন্ত্রস্ত, সচকিত হ'য়ে ঘরে ঢুকলো। ডাক শুনে আয়া আগেই গিয়েছে আলো ক'রে।

সৌম্য ঘরে ঢুকতেই তার চোখের উপর বুভুক্ষু, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে' শিপ্রা চেঁচিয়ে উঠলো: বনানী-দি কোথায় গেলো?

বিরক্ত, ঝাঁজালো গলায় সৌম্য বল্‌লে,—কে?

—বনানী-দি। এতোক্ষণ এইখানে, আমার পাশেই যে বসে' ছিলো। দেখ, তোমার বসবার ঘরে কিনা, যাও দেখে এসো। দাঁড়িয়ে রইলে কেন? যাও।

—তুমি কী বলছ যা-তা? সৌম্য তার পাশে বসে' পড়লো, আয়াকে চলে' যাবার সময় দিয়ে টেনে নিলো তাকে বুকের মধ্যে। বল্‌লে,—কী না কী একটা স্বপ্ন দেখছিলে।

—স্বপ্ন নয়, সত্যি সে এসেছিলো, তার শাড়ির কী রঙ, আজো তা আমি স্পষ্ট বলতে পারবো, শাড়ির প্রতিটি ভাঁজ পর্যন্ত। তুমি যেখানে বসেছ না, সেইখানেই সে বসেছিলো। ওঠো, ওঠো, খুঁজে দেখ কোথায় গেলো। শিপ্রা সৌম্যর বাহুর মধ্যে ছটফট করে' উঠলো: তোমার ঘরেই তো যাবার কথা, নিশ্চয় সেখানে, আমাকে তুমি বলছ না, কিন্তু আমাকে লুকিয়ে আর কী হ'বে? সে তো নিজেই আমার কাছে সব স্বীকার করে' গেছে। যাও, এখানে বসে' আছো কী, ও-ঘরে যাও। তোমাদের না এখন বেড়াতে যাবার কথা?

সৌম্য বল্‌লে,—জ্বরটা তোমার বিকেলের দিকে আজ বেড়ে গেছে দেখছি।

—বাড়ুক গে জ্বর। তুমি ডেকে আনো বনানী-দিকে।

—কোথায় কে? সৌম্য ধমকে উঠলো।

—কেন, বনানী-দি ও-ঘরে নেই ?

—তুমি কি পাগল হ'য়ে গেলে নাকি ? আমি বলে' এতোক্ষণ অন্ধকারে চুপ করে' বসে' ছিলুম ও-ঘরে।

—আলো জেলে একবার তুমি খুঁজে এসো, অন্ধকারে তুমি তাকে এতোক্ষণ দেখতে পাও নি। হয়তো কোথায় ঘুমিয়ে পড়েছে। যাও। ওঠো।

—তুমি কি আমাকে এমনি করে' মেরে ফেলবে নাকি, শিপ্রা ?

—না গো না, মেরে ফেলবো না, আমি সে-শিপ্রা আর নেই। শিপ্রা নিজেকে অতল দুর্বলতায় ছেড়ে দিলো : সত্যি তুমি তাকে কোথাও দেখতে পেলে না ?

—বা রে, কা'কে দেখতে পাবো ?

—বনানী-দি আজ এসেছিলো যে। আমি তাকে সাধা মানবো ? আশ্চর্য, আমি ছাড়া আর কেউ যে তাকে দেখে নি। আমি তার কী করবো বলো ? তুমি যে আমাকে আর বিশ্বাস করো না—আমি এতো অপবিত্র হ'য়ে গেছি।

—এসেছিলো তো এসেছিলো, আবার চলে' গেছে। তুমি এখন ঘুমোও।

—চলে' গেছে ? শিপ্রা দীর্ঘ একটা নিশ্বাস ছাড়লো : কিন্তু চলে' যাবার জন্যে তো সে আজ আসেনি।

—তবে আবার কী জন্যে আসবে ?

—এসেছিলো তার দাবি জানাতে, জানাতে তার সত্তা, [illegible] বাঁচবার অধিকার। সে কী সুন্দর, আগুনের মতো সুন্দর তার শরীর, যজ্ঞের আগুনের মতো সুন্দর। তুমি যদি একবার তাকে দেখতে। সৌম্যর স্পর্শের মাঝে শিপ্রা ভোরের আগেকার অন্ধকারের মতো থরথর করে' উঠলো : বনানী-দিকে এতো সুন্দর আমি কোনোদিন

দেখিনি। মধ্যরাত্রে ফোটা সাদা মস্ত একটা ফুলের মতো। স্পর্শ নেই, গন্ধ নেই, তবু চমৎকার, মস্ত একটা ফুল।

তার ম্লান, করুণ মুখের দিকে চেয়ে সৌম্য বল্‌লে,—তুমি তাকে তক্ষুনি চলে' যেতে বললে না কেন?

—পাগল! চলে' যেতে বলবো কী? শিপ্রা ভয়ে যেন একবার চোখ বুজলো: সে-শক্তি, সত্যের সেই শক্তির সামনে আমি দাঁড়াই কোথায়? আমি মুছে গেলুম, নিবে গেলুম, তাকে জায়গা ছেড়ে দিলুম অনন্ত। বললুম: বোসো গিয়ে ও-ঘরে, উনি এখুনিই আপিস থেকে এসে পড়বেন।

সৌম্য হেসে উঠলো: বসে' আছেন উনি!

—সত্যি, কোথায় গেলো বলো তো? শিপ্রা অসন্দিগ্ধ, সবল দু'টি চোখ সৌম্যের মুখের উপর তুলে ধরলো: বনানী-দি আমার কাছে কিচ্ছু লুকোয় নি, তুমিও কিছু গোপন কোরো না। সমস্ত আকাশের আবরণ দিয়েও সূর্যকে আড়াল করা যায় না। মিছিমিছি কী হ'বে গোপন করে'? যা সত্য, তাকে ভয় কিসের? শিপ্রা একটা ঢোক গিলবার চেষ্টা করলো: সত্যি, বনানী-দির সঙ্গে তোমার দেখা হয় নি আজ?

—না। কী তুমি ফের পাগলামি শুরু করলে বলো দিকি?

—এর চেয়ে আমি কোনোদিন কখনো সুস্থ বোধ করি নি। শিপ্রা আস্তে-আস্তে বালিশে ঢলে' পড়লো: হয়তো এমনি কোথায় একটু গেছে, কিংবা বাড়িতে। তুমি যাও, শিপ্রা সৌম্যের গায়ে মৃদু-মৃদু ঠেলা দিতে লাগলো: তাকে নিয়ে এসো। অন্ধকার ঘরে বসে' বেচারী আর কতোক্ষণ অপেক্ষা করতে পারে?

সৌম্য আবার হেসে উঠলো: আমার তো আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই।

—নেইই তো। শিপ্রা আবার তাকে মৃদু, কাতর একটি ধাক্কা দিলো: এই তো তোমার আসল কাজ—প্রত্যেকের—জীবনে সুখী হওয়া। যাতে মানুষ সত্যি সুখী হয়, পরিপূর্ণ হয়, পেরে তা না-করাটা ভীষণ পাপ—আত্মহত্যার মতো। সত্যের কাছে লজ্জা কী? না, তুমি যাও। আমার একার তুচ্ছ সুখের তুলনায় তোমাদের দু' জনের সুখ কতো বেশি। তা ছাড়া, জানো না, আমিও এতে সুখী হ'বো যে। আমাকে এতোটুকু তুমি সুখী করতে পারো না?

সৌম্য সবাদে বিমর্ষ হ'য়ে উঠলো, চেয়ে রইলো জানলার বাইরে পুঞ্জিত অন্ধকারের দিকে।

--না, না, তুমি যাও, আমি মরছি মরি, তুমিও আর নিজেকে মেরো না।

তাকে দুই বলিষ্ঠ হাতে সৌম্য আবার কুড়িয়ে নিলো: তুমি চুপ করবে কিনা বলো, নইলে আমি বিষ খাবো, ঠিক বিষ খাবো বলে' রাখছি।

শিপ্রার মুখে সূক্ষ্ম একটা হাসি উঠলো ফুটে: বিষ খাবার কোনো দরকার নেই। আমি পর্যন্ত খেলুম না। যদি না-ও মরি, ভাগ্যের কৌশলে যদি বেঁচেও উঠি ফের, তবুও আমার কোনো ভাবনা নেই। খোকাকে শুধু আমায় দিয়ো—খোকাকে, শিপ্রা আবার তৃপ্তিতে পড়লো ঢলে': আমি আর কিছু চাই না। তুমি যাও, পরের মন-গড়া সুখের দিকে চেয়ে নিজেকে এতো বড়ো একটা উপলব্ধি থেকে বঞ্চিত কোরো না।

ক্লেদাক্ততায় সৌম্যর নিশ্বাস আটকে আসছে, এমন সময় চঞ্চল বাতাসের মতো ঘরের মধ্যে নার্সের আবির্ভাব হ'লো। শিপ্রাকে বালিশে ভালো করে' শুইয়ে দিয়ে সৌম্য উঠে পড়লো তাড়াতাড়ি: নার্স এসেছে।

তারপর নার্সের সঙ্গে চিকিৎসা-শাস্ত্র সম্বন্ধে দুয়েকটা সে শুকনো আলাপ করলে। প্রাঞ্জল, সহজ গলায় কথা বলতে পেয়ে সে যেন একটা গভীর আরাম পাচ্ছে।

রাত তখনো খুব বেশি হয় নি, আধো-জাগা আধো-ঘুমের মধ্যে থেকে সৌম্য ধড়মড় করে' হঠাৎ উঠে বসলো। অসহ্য, মর্মান্তিক অসহ্য সে একটা দুঃস্বপ্ন দেখছিলো বুঝি। সৌম্য তার একা বিছানায় আর মশারি খাটিয়ে শুতো না, খাট থেকে এক লাফে নেমে পড়ে' তাড়াতাড়ি সে আলো জ্বালালে। স্বপ্ন দেখছিলো, তারো যেন ভীষণ একটা কী দুরূহ, দুরারোগ্য অসুখ করেছে, ঘর-বাড়ি আকাশ-হাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে সে-ও হ'য়ে গিয়েছে রোগা, বিশীর্ণ, তার চামড়া পড়েছে কুঁকড়ে, কুৎসিৎ, জায়গায়-জায়গায় হাড় উঠেছে ঠেলে শক্ত হ'য়ে, চোখ দু'টো ড্যালা পাকিয়ে বাইরে আসছে ছুটে। নামহীন, নিরবয়ব, নিষ্ঠুর একটা ভীতি। দেয়ালের গায়ে সামনেই ছিলো একটা দাড়ি আয়না নিজের মুখ দেখতে পর্যন্ত সৌম্যর সাহস হ'লো না। পাছে আর নিজেকে সে আর দেখতে না পায়। রোগা, রোগা হ'য়ে গেছে সমস্ত ঘর, ঘরের সমস্ত আবহাওয়া। অন্ধকারে পর্যন্ত সে দীপ্তি নেই, সেই ঘনতা। এ যেন, ভেজা, বিশ্রী কতোগুলি কালিমা। দেয়ালগুলোও রোগা হ'য়ে গেছে, ছ্যাঁতা ধরেছে সমস্ত গায়, ছুঁতে ভয় করে। টেবিল, চেয়ার, ঘরের সমস্ত আসবাব, কেমন যেন কতোগুলি শ্রীহীন বস্তুপুঞ্জ, মরা, শুকনো কতোগুলি কাঠের প্রেতমূর্তি। সৌম্য ভীত, ভূতগ্রস্ত অশরীরী একটা ছায়ার মতো ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। যেখানে হাত রাখছে, তা-ই উঠছে গুঁড়িয়ে, প্রতিবাদ করে'। নিশ্বাসে পাচ্ছে অসুখের ঝাঁজ, বুকের উপর চাপা একটা গুমোটের ভার। আলোটা পর্যন্ত বিবর্ণ, মৃতের ঘোলাটে, ভারি চোখের মতো। ঘরময় কিলবিল করছে যতো সব রোগা কলুষিত কথা, ক্লেদাক্ত, অপরিচ্ছন্ন। অবধারিত

একটা মৃত্যুর প্রতীক্ষার মতো অসুস্থ, কুৎসিত একটা স্তব্ধতা। পায়ের ভারে মেঝেটা অবধি ক্লিষ্ট হ'য়ে উঠেছে। রোগা, রোগা, দিনানুদিন শীর্ণায়মানতার শ্রান্তি। সৌম্যও যেন ক্ষয় পেতে পেতে, রুগ্ন হ'তে হ'তে অসুস্থতার একটা বিজ্ঞাপন হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। তারো শরীর যাচ্ছে দড়ির মতো পাকিয়ে, তারো মনে নেই আর সেই দক্ষিণ থেকে হাওয়া। শ্বাসরোধী একটা নিশ্ছিদ্র অন্ধকূপ। জলের তলাকার অন্ধকার।

এই অন্ধকার দেয়াল সে দুই হাতে ঠেলে ফেলে দেবে, তার আত্মার জন্যে, তার মনুষ্যত্বের জন্যে।

বনানী আজ এসেছিলো। শিপ্রার অনেকানেক ঠাট্টার মধ্যে এটা না-ও হ'তে পারে।

সৌম্য পা টিপে-টিপে চোরের মতো নিচে নামলো। সদরটা বাইরে থেকে ভেজিয়ে দিয়ে নেমে গেলো রাস্তায়। মধ্যরাত্রে সেটা আর তখন কলকাতার রাস্তা নয়, জনহীন স্বপ্নের পথ।

গ্রীষ্মের নীল মধ্যরাত্রি। নিশি-পাওয়ার মতো সৌম্য যেন স্বপ্নে হেঁটে চলেছে। এই মধ্যরাত্রে কোথায় একটা সাদা ফুল ফুটেছে, কোন অপরিচের অন্ধকারে, সাদা মস্ত একটা ফুল—তাতে স্পর্শ নেই, গন্ধ নেই—চিরন্তন একটা ফুল-হ'য়ে-ফুটে-থাকা।

সেই রাস্তের অন্ধকার তাকে ডাকছে—সেই অপরিচেয় অন্ধকার।

আর সৌম্য ভুল করবে না। সেই সাদা ফুলকে সে লাল করবে। কামনায়, বিপ্লবে, প্রাণচ্ছটার প্রাচুর্যে। সে আর ফিরবে না অভ্যাস আর স্বীকৃতির কাছে, মায়া আর স্নেহচ্ছায়ার দুয়ারে। সে জানে কোথায় জ্বলছে তার শোকহীন শুকতারা! তার প্রত্যুষের প্রতিজ্ঞা!

বাড়ির সামনেকার ছোট রোয়াকটুকুতে পথাশ্রয়ী কয়েকটা লোক শুয়ে ছিল। রাস্তার গ্যাসের আলো ততোদূর এসে পৌঁছয় নি। অন্ধকারে সৌম্য কা'র বুঝি-বা পা মাড়িয়ে দিলে।

লোকটা ঘুমের মধ্যে শব্দ করে' উঠলো !

—এরা কোথায় ? যারা এ-বাড়িতে ছিলো ? সৌম্য আর্তকণ্ঠে জিগ্গেস করলে।

ঘুম-ভাঙো-ভাঙো অবস্থায় লোকটা বললে,—তারা কেউ নেই।

—নেই কী ?

—দেখছেন না, জানলা-দরজা সব বন্ধ, দরজায় তালা লাগানো।

—কবে গেছে এখান থেকে ?

—তা কে জানে ? লোকটা ঘুমের আরামে পাশ ফিরলো : অনেক দিন হ'লো। কাল সকালে আসবেন খোঁজ নিতে।

সৌম্য তাড়াতাড়ি বাড়ির দিকে পা চালালো। সর্বনাশ, সে এ করেছে কী ? এতো রাত্রে বাড়ির সদরটা যে সে খুলে রেখে এসেছে।